প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা

Oriental Political Thought

অধ্যাপক একেএম শহীদুল্লাহ
এম রফিকুল ইসলাম
মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

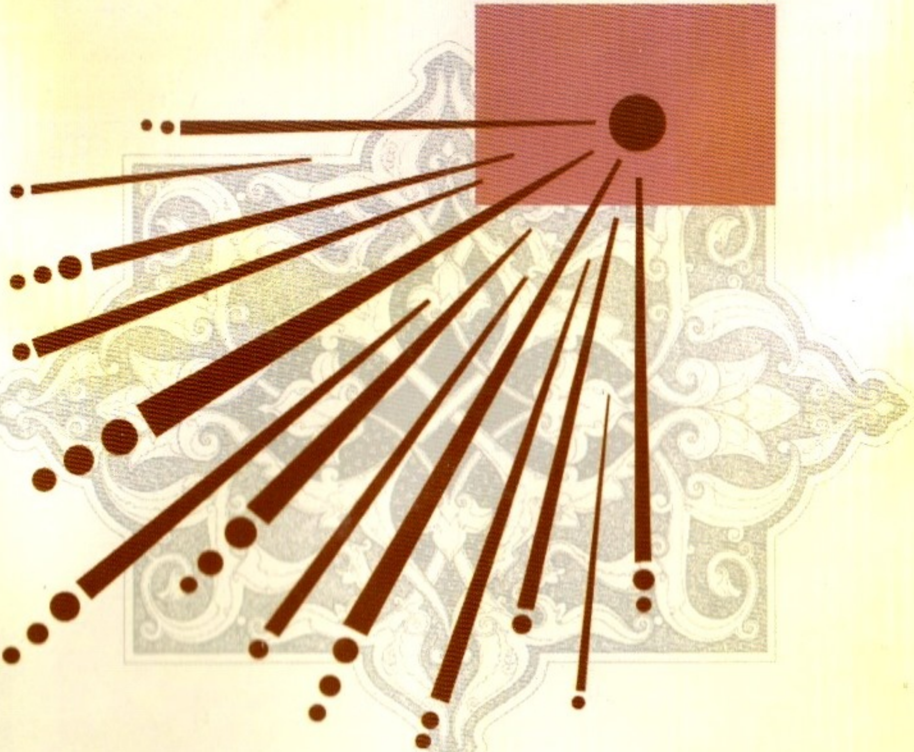

ওরাকল পাবলিকেশন্স-ঢাকা

প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা

Oriental Political Thought

with best complements of
Bangladesh Institute of Islamic Thought

Executive Director
Bangladesh Institute of Islamic Thought

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স তৃতীয় বর্ষের কোর্স (1935 : Oriental Political Thought), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নং 208 এবং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর সর্বশেষ সিলেবাস অনুযায়ী রচিত।

প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা

[1935 : Oriental Political Thought]

এ কে এম শহীদুল্লাহ
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম রফিকুল ইসলাম
বিএসএস (অনার্স) এমএসএস (ফার্স্ট ক্লাস, ঢাবি)
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
প্রাক্তন প্রভাষক, শেখ বোরহানুদ্দীন
পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ
বিএসএস (অনার্স) এমএসএস (ঢাবি)
এমএস(প্রি-পিএইচডি), ঢাকা
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ,
নর্দান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

ওরাকল পাবলিকেশন্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার (৩য় তলা) ঢাকা
ফোন - ৭১৭৩৬১৯

www.pathagar.com

প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা

প্রকাশক
ওরাকল পাবলিকেশন্স
৩৮, ২/ক বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা, ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১৭৩৬১৯

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০০৮

মুদ্রণে
এসএম প্রিন্টার্স

মূল্য
একশত আটান্ন টাকা মাত্র

ISBN 984 8443 05 3

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার পাশাপাশি প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের যৌক্তিকতা

সভ্যতা মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনার ফসল। সভ্যতার ক্রম বিকাশের পশ্চাতে নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণময় চিন্তাধারা। তাই রাষ্ট্রও মানুষের কল্যাণময় চিন্তাধারার ফসল। বিশ্ব স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবে মানুষ আদিকাল থেকেই সংঘবদ্ধভাবে কোন না কোন সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে আসছে। রাষ্ট্র হল এসব সংগঠনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক, রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্র পূর্বাবস্থায় মানুষ বিচ্ছিন্ন তথা লাগামহীনভাবে পশুবৎ জীবন যাপন করত। মানুষের মাঝে জ্ঞানালোকের বিস্তৃতি আর সুন্দর সুশৃঙ্খল জীবনের হাতছানি মানুষকে রাষ্ট্র নামক সর্ববৃহৎ মানবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে জ্ঞানাকাশে যে কল্যাণময়, যুক্তিবাদী, প্রজ্ঞাদীপ্ত চিন্তাধারা প্রবাহমান তাই রাষ্ট্রচিন্তা। অন্যকথায়, ব্যাপক পরিসরে এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় রাষ্ট্র কখন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্র যে অবিকল অবস্থায় নেই, নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে; এ সম্পর্কে চিন্তকদের বৈচিত্র্যময় তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের স্রোতধারায় ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্র আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং বিবর্তনের এ ধারা হয়ত অব্যাহত থাকবে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের এই যে ক্রমবিবর্তন এর পশ্চাতে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারা এবং ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত। সুন্দর-সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধশীল জীবন বিধান গড়ে তোলার প্রয়াসে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় জীবন ধারাকে আরো উন্নতরূপে রূপায়নের নিমিত্তে যুগে যুগে মনীষী ও চিন্তকগণ যে প্রজ্ঞাদীপ্ত ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করেছেন তাই রাষ্ট্রচিন্তা।

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে সত্য প্রস্ফুটিত হয় তা হল রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তি পাশ্চাত্যে বিশেষত প্রাচীন গ্রিস ও রোমে। কেননা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র, সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি ধারণা প্রাচীন গ্রিসে জন্ম লাভ করে। গ্রিসের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ যুক্তি সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করার পরে কতগুলি মূল সূত্র প্রস্তুত করেন এবং পরবর্তীকালে এগুলির পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি ও সমালোচনার অবতারণা হলেও একেবারে বর্জিত হয়নি। এজন্য যথার্থ চর্চা ও বাস্তবিক প্রয়োগ এবং অনুসরণ অনুকরণ অনুশীলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার সুদৃঢ় প্রভাব কালোত্তীর্ণ হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রচিন্তার যুগ বিভাগে দেয়া যায় যে, প্রাচীনকালের রাষ্ট্রচিন্তায় গ্রীসের পণ্ডিত সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের চিন্তাধারার একচেটিয়া প্রভাব, মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবহেতু ব্যবহারিক রাজনীতির অনুপস্থিতি আবার আধুনিক যুগে ইউরোপীয় দার্শনিকদের যে পদচারণা উহার মূলসুর গ্রিসীয়। এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রদর্শনের পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ মধ্যযুগকে "ইতিহাসের অন্ধকার যুগ" বলে অভিহিত করেন। তাদের যুক্তি, এ যুগে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রক্ষিত হয়নি। কিন্তু এ যুক্তি

www.pathagar.com

মোটেই যৌক্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দুটি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি হল ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা (Western Political Thought) অপরটি অ-ইউরোপীয় তথা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা (Oriental Political Thought)। ইউরোপীয় দেশসমূহে এবং উহার প্রধানকেন্দ্র ছিল প্রাচীন গ্রিস; যার প্রধান চিন্তক ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ। এই প্রাচীন গ্রিসকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাই পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা হিসেবে পরিচিত এবং যার প্রভাব প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ পেরিয়ে অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সুবিস্তৃত আছে।

বিপরীতে রাষ্ট্রচিন্তার অ-ইউরোপীয় ধারা তথা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা বলতে প্রাচীনকালের মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, পারস্য, চৈনিক ও ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তকদের চিন্তাধারাকে বুঝানো হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ মনে করেন, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা প্রাচীন কালের গ্রিসীয় চিন্তাধারার ন্যায় আধুনিককালের চিন্তাধারার উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বিধায় তা রাষ্ট্রচিন্তকদের দ্বারা সমাদৃত হয়নি। তবে পাশ্চাত্যের চিন্তকমহল একটি সত্যকে অকপটে স্বীকার করেন, সেটি হল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বের সভ্যতাসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেও এই সভ্যতা তার শিল্প-সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত, সংস্কৃতি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য প্রাচ্যের সভ্যতার নিকট ঋণী -এ কারণে যে বহু ধারণা , দর্শন, তথ্য, উপাত্ত, নির্দেশনা ইত্যাদি প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট হতে গ্রহণ করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সভ্যতা তেমন অবদান রাখতে পারেনি বলে আজও তা অনালোচিত বা অসমাদৃতই রয়ে গেছে বলে তাঁরা মনে করেন। প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা এবং প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের এরূপ অভিমত ঠিক নয়। কেননা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ন্যায় প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্রচিন্তাও সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং রাষ্ট্রীক জীবনকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবিদার। বিশেষত প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তকদের অবদানকে কোন দৃষ্টিতেই গুরুত্বহীন বলা যায় না। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে ইহা ধ্রুবসত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যে, "মধ্যযুগ অরাজনৈতিক ও অনৈতিকহাসিক ছিল" পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের এ অভিমত মোটেই সঠিক নয়। কারণ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনের উন্নতির ক্ষেত্র পাশ্চাত্য হলেও প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও তা। প্রাচ্যের মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের অবদান মূল্যায়ন করলে ইহা সহজেই বলা যায় যে, এ মধ্যযুগে মুসলিম দার্শনিকদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি তাই এটিকে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। গবেষণার ফলে এ যুগে বিশেষকরে প্রাচ্যের চিন্তকদের যে অপরিমেয় স্বর্ণোজ্জ্বল জ্ঞান-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, মুসলিম পণ্ডিতগণই প্রথম গ্রিক সাহিত্য ও দর্শনকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে তার সাথে নিজেদের সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর মননশীলতার সুসমন্বয় ঘটিয়ে এমন এক অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের সৃষ্টি করেন যা যে কোন যুগের চিন্তাবিদদের ঈর্ষার উদ্রেক না করে পারে না। অধ্যাপক পিকে হিট্টির মতে, "ইসলামের সাথে

www.pathagar.com

গ্রিক দর্শনের সমন্বয় সাধনের যে সূত্রপাত আল্‌-কিন্দী করেছিলেন, আল ফারাবী যা বিকশিত করার চেষ্টা করেছিলেন, ইবনে সিনা ওস্তাদের মত তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।" বস্তুত মুসলিম চিন্তকগণ গ্রিক সাহিত্য ও দর্শনের সাথে নিজেদের প্রখর মেধা ও বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় সাধন করে ইসলাম তথা কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন তার ফলে মুসলমানরা সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, ভূবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বসহ জ্ঞান ও সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। শুধু মুসলমান মাত্রই নয় এ থেকে বিশ্বের অন্যান্য জাতিও নানাভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার দিকপাল প্লেটো, এরিস্টটলের ন্যায় মধ্যযুগের প্রাচ্যের মুসলিম দার্শনিক আল ফারাবী, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন প্রমুখের চিন্তাধারা কম গুরুত্বের দাবিদার নয়। কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের পঠন-পাঠনকে একপেসে করে রাখার ফলে এবং বিভিন্ন যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে কেবল গ্রিসীয় চিন্তাধারার প্রভাব সক্রিয় থাকায় মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারা আলোচনার ঝড় তুলতে পারেনি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচ্যের মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারা আধুনিক যুগের কোন কোন দার্শনিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তার পরিমণ্ডলে মুসলিম চিন্তানায়কদের যে একচেটিয়া প্রভাব বিদ্যমান ছিল তা কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। তাই পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের পূর্বোক্ত মন্তব্য মোটেই ঠিক নয় বরং তা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। এ প্রসংগে H.K. Sherwani-'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, ইতিহাসের এই যুগ অন্ধকার ত ছিলই না বরং অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই তাকে ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়।"

রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত এরিস্টটলের চিন্তাধারা থেকে এবং ইহার ভিত্তি হিসেবে 'The Republic', 'The Politics' প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থ যেমন গুরুত্বের দাবিদার তেমনি প্রাচ্যের মুসলিম চিন্তাবিদের মধ্যে আল ফারাবীর "আল মদিনাতুল ফাজিলাহ" (আদর্শ রাষ্ট্র), ইবনে সিনার "আকসাম উল উলুম" (বিজ্ঞানের প্রকারভেদ গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতির বিশদ বর্ণনা) ইবনে খালদুনের 'আল মোকাদ্দেমা' ও History of the time and fall of the anafs and Barkers. ইবনে রুশদ এর "কিতাবুল ইবার" রাষ্ট্রচিন্তার জগতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ ছাড়াও যে সকল মুসলিম চিন্তকের সারবান কল্যাণময় চিন্তা-চেতনা মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের অনেক চিন্তককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁরা হলেন ইসহাক আল কিন্দী, আল মাওয়ার্দী, ইমাম আল গাজ্জালী, নাসিরুদ্দিন তুসী এবং ভারতবর্ষের কৌটিল্য, আবুল ফজল ও ড. আল্লমা ইকবাল প্রমুখ।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তির প্রাধান্য, দর্শনের প্রবল প্রভাব এবং ধর্মের প্রতি নিস্পৃহা, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব কিন্তু এ যুগে প্রাচ্যের মুসলিম দার্শনিকগণ ধর্মও দর্শনের সমন্বয় সাধন করে ইসলামিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত করেছে – যা সকল জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যেখানে মানব জীবনের ইহ জাগতিক গণ্ডি পারলৌকিক

www.pathagar.com

জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্ষণস্থায়ী ইহলোকের রাজনৈতিক জীবন অনন্ত পারলৌকিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই অনন্ত জীবনের সুখ ও কল্যাণ ভোগ করতে সর্বাগ্রে ইহলৌকিক জীবনকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে যার দিক নির্দেশনা ইসলামভিত্তিক মুসলিম মনীষীদের রচনাবলীতে রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে বিজ্ঞতার সাথে বলা যায়, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার পাশাপাশি প্রাচ্যের মুসলিম চিন্তাবিদের রাষ্ট্র চিন্তার পঠন-পাঠনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

উপর্যুক্ত গুরুত্ব বিবেচনায় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও অনুশীলন ক্ষেত্রকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে **'প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা'** কোর্সটি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, অদ্যাবধি সিলেবাসভিত্তিক মানসম্মত বই প্রকাশ পায়নি। সম্মানিত শিক্ষক মহল এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস। বইটি লেখার ক্ষেত্রে একদিকে বহু দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা লেখকের দুর্লভ বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে; কোরআন, হাদীস, ইসলামী আইনশাস্ত্র, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে সরাসরি সহযোগিতা ও সুপরামর্শ নেয়া হয়েছে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব শামীম আক্তার। তিনি বইটি লেখার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক জনাব ইদ্রিস আলী এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রভাষক ওমর ফারুক, লেখক ও সাংবাদিক বন্ধুবর এফ শাহজাহান প্রমুখ নানা তত্ত্ব ও তথ্যগত সহযোগিতা দিয়ে আমাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিশেষকরে বইটি যথাসময়ে প্রকাশের ব্যাপারে ওরাকল পাবলিকেশন্সের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মহিবুর রহমান যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। পরিশেষে যাদের উদ্দেশ্যে এই দুরুহ কাজটি সম্পন্ন হল তাদের উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। প্রথম প্রকাশে বইটির কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পাঠক মহলের যে কোন যৌক্তিক পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য।

অধ্যাপক একেএম শহীদুল্লাহ
এম রফিকুল ইসলাম
মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

www.pathagar.com

(পূর্বের সিলেবাস)

National University
Syllabus (Honours 2nd year)
Department of political Science

MPOL 202 : Oriental Political Thought
(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

The Islamic and Arab Political Thought :

[ইসলামী এবং আরব রাষ্ট্রচিন্তা]

The meaning of Islam : The conceptual foundation of Islamic political thought: Fundamental concepts of Islam: Social Justice, Human Rights, Faith, Freedom, Brotherhood, Equality, Nationalism, Secularism, Peace, Security, war, etc. Islamic state vis-a-vis western Democratic State, Islamic Economic system vis-a-vis Capitalist, Socialist and Communistic Economic System.

[ইসলামের অর্থ: ইসলাম রাষ্ট্রচিন্তার ধারণাগত ভিত্তি, ইসলামের মৌলিক ধারণাসমূহ; সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, বিশ্বাস (তাওহীদ) স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শান্তি, নিরাপত্তা, যুদ্ধ ইত্যাদি। ইসলামী রাষ্ট্র বনাম পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।]

Some Representatives Muslim Political Thinkers :

[কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ]

AL-Farabi, Ibn-Sina, AL-Gazzali, Ibn-E-Khaldun, Ibn Rushd, Nizamul Mulk Tusi,

[আল ফারাবী, ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ, নিজামুল মুলক তুসী]

India and China :

[ভারত এবং চীন]

Atish Dipankar, Kautilya, Abul Fazal, Gandhi, Iqbal, MN Roy.

[অতীশ দীপংকর, কৌটিল্য, আবুল ফজল, গান্ধী, ইকবাল, এম এন রায়]

Chinese Political Thought : Confucianism, Taoism

[চীন দেশীয় রাষ্ট্রচিন্তা : কনফুসিয়াসবাদ, তাওবাদ]

www.pathagar.com

University of Dhaka

SYLLABUS

Department of Political Science

Hons. 2nd year course No.208

Oriental Political Thought

Course outline

The Arab and Muslim world : The meaning of Islam, conceptual foundation of Islamic political Theory, Fundamental concepts of Islam: Faith, Freedom, brotherhood, equality, peace, security, war etc.

Fundamenlats of Ismam : Social, political and economic systems, Islam: development, modernity, The challenges from and to Islam, state: basis and purpose, historical development, status of woman in Islamic state, Islamic state vis-a-vis western democratic state; Islamic economic system basis and characteristics, Islamic economy vis-a-vis capitatistic, socalistics and communistic economic system; Isl;am: nationalism, secularism, dynamism and fundamentalism; the resurgence of Islam: some representative Muslim political thinkers: AL-Farabi, Ibna Sin, AL-Gazzali, Ibn Khaldun, Nizamul Mulktusi.

India : Ancient, medieval and modern socio-political institutions: Akbar the great-Din-E Elahi Abul Fazal-Ain-E-Akbari, Kautilya-the-Arthashastra.

www.pathagar.com

National University
Syllabus (Honours 3rd year)
Department of political Science

Subject Code 1935 : Oriental Political Thought
(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

A. Introduction to Oriental Political Thought :
[প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার ভূমিকা]

B. Major Thinkers : AL-Farabi, AL-Gazzali, Ibn-Khaldun, Kautilya, Abul Fazal, Gandhi, Iqbal, MN Roy, Confucianism.

[আল ফারাবী, আল গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, কৌটিল্য, আবুল ফজল, গান্ধী, ইকবাল, এম এন রায়, কনফুসিয়াসবাদ।]

Or,

Subject Code 1936 : Islamic Political Thought
[ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা]

The meaning of Islam : The conceptual foundation of Islamic political thought: Fundamental concepts of Islam: Social Justice, Human Rights, Faith, Freedom, Brotherhood, Equality, Nationalism, Secularism, Peace, Security, war, Comparison betwean Islamic state and western Democratic State, Islamic Economic system vis-a-vis Capitalist, Socialist and Communistic Economic System.

[ইসলামের অর্থ: ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার ধারণাগত ভিত্তি, ইসলামের মৌলিক ধারণাসমূহ; সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, বিশ্বাস (তাওহীদ) স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শান্তি, নিরাপত্তা, যুদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্র বনাম পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।]

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা : এর অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি**	**১৭-২২**
	Oriental Political Thought : Its Meaning, Nature and Scope	
	প্রাক-কথা	১৭
	প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা কি?	১৭
	প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি, পরিধি বা বিষয়বস্তু	১৮
	প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা/উপযোগিতা বা গুরুত্ব	২০
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ইসলাম : অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও মৌলভিত্তি**	**২৩-৪০**
	Islam : Meaning, Features and Fundamental Basis	
	প্রাক-কথা	২৩
	ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা	২৪
	ইসলামের বৈশিষ্ট্য	২৫
	ইসলামের মৌল ভিত্তি ও উপাদান-ঈমান, সালাত, রোযা, যাকাত, হজ্জ	২৯
	'ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'-ব্যাখ্যা	৩৪
	ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ধারণা	৩৮
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	৪০
তৃতীয় অধ্যায়	**ইসলামের মৌল ধারণা**	**৪১-১২৬**
	Basic Concepts of Islam	
	প্রাক-কথা	৪১
	তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস	৪১
	সার্বভৌমত্ব	৫১
	স্বাধীনতা	৫৪
	সাম্য	৬৭
	ভ্রাতৃত্ব	৭৩
	সমাজ	৭৭
	সামাজিক ন্যায়বিচার	৮১
	জাতীয়তাবাদ/উম্মাহ	৮৭
	ধর্মনিরপেক্ষবাদ	১০২
	মৌলবাদ	১১১

www.pathagar.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সন্ত্রাসবাদ	১১৪
	শান্তি, নিরাপত্তা ও যুদ্ধ	১১৯
চতুর্থ অধ্যায়	**মানবাধিকার ও ইসলাম**	**১২৭-১৪৪**
	Human Rights and Islam	
	প্রাক-কথা	১২৭
	অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা	১২৭
	মৌলিক অধিকারের ধারণা	১২৮
	মানবাধিকারের ধারণা	১২৯
	মানবাধিকার ধারণার ভিত্তি ও বিকাশ	১২৯
	ইসলামে মানবাধিকার	১৩১
	ইসলামে মানবাধিকার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ	১৩৭
	মদীনার সনদ	১৩৮
	বিদায় হজ্জের ভাষণ	১৪২
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	১৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	**ইসলামী আইন : উৎস ও বৈশিষ্ট্য**	**১৪৫-১৬০**
	Islamic Law : Sources and Features	
	প্রাক-কথা	১৪৫
	আইনের প্রচলিত ধারণা	১৪৫
	আইনের অর্থ ও সংজ্ঞা	১৪৬
	আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	১৪৭
	আইনের উৎস	১৪৭
	ইসলামী আইনের উৎস	১৪৯
	ইসলামী আইনের (শরীয়া) বৈশিষ্ট্যাবলি	১৫৭
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	১৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়	**ইসলামী অর্থনীতিক ব্যবস্থা**	**১৬১-১৭৮**
	Islamic Economic System	
	প্রাক-কথা	১৬১
	ইসলামী অর্থনীতির অর্থ ও সংজ্ঞা	১৬১
	ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি	১৬৩
	ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য	১৬৯
	ইসলামী অর্থনীতির সাথে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনা	১৭৫
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	১৮০

www.pathagar.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়	**ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা**	**১৮১-২২৪**
	Islamic State	
	প্রাক-কথা	১৮১
	রাজনীতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত	১৮২
	রাজনীতি ও নৈতিকতা	১৮২
	রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী	১৮৩
	রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা	১৮৪
	ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ও সংজ্ঞা	১৮৫
	ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী	১৮৬
	ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৮৭
	ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান	১৮৭
	ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য	১৯০
	ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি	১৯২
	মজলিসে শূরা	১৯৩
	রাষ্ট্র পরিচালনা	১৯৬
	ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা	১৯৭
	ইসলামিক রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র	১৯৯
	ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য	২০১
	মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য	২০৩
	ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য	২০৮
	অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২১৬
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২২৪
অষ্টম অধ্যায়	**ইসলামী রাষ্ট্রে প্রশাসন ব্যবস্থা**	**২২৫-২৩৮**
	Administration in Islamic State	
	প্রাক-কথা	২২৫
	তৎকালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি	২২৬
	মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি	২২৭
	মহানবী (স) কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক ভিত্তি	২২৮
	রাসূল (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা	২২৮
	মহানবী (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৩৩
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২৩৮

www.pathagar.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
নবম অধ্যায়	**খিলাফত**	**২৩৯-২৫২**
	Khilafat	
	প্রাক-কথা	২৩৯
	খিলাফত-অর্থ ও ব্যাখ্যা	২৩৯
	খিলাফতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৪১
	খিলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য	২৪৬
	খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি	২৫০
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২৫২
দশম অধ্যায়	**ইসলামে নেতৃত্ব**	**২৫৩-২৫৮**
	Leadership In Islam	
	প্রাক-কথা	২৫৩
	নেতৃত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা	২৫৫
	নেতৃত্বের ইসলামী ধারণা	২৫৫
	নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম চিন্তকদের ধারণা	২৫৬
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২৫৮
একাদশ অধ্যায়	**ইসলামে নারীর মর্যাদা, দায়িত্ব ও অবস্থান**	**২৫৯-২৬৪**
	The Status, Position and Duties of Woman in Islam	
	প্রাক-কথা	২৫৯
	নারীর মর্যাদা-আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত	২৬০
	অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত	২৬০
	সামাজিক প্রেক্ষিত	২৬০
	রাজনৈতিক প্রেক্ষিত	২৬১
	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত	২৬১
	মাতা হিসেবে পরিবারে নারীর স্থান	২৬১
	স্ত্রী হিসেবে পরিবারে নারীর স্থান	২৬২
	মেয়ে হিসেবে পরিবারে নারীর স্থান	২৬২
	বোন হিসেবে নারীর অবস্থান	২৬২
	মূল্যায়ন	২৬৩
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	২৬৪
দ্বাদশ অধ্যায়	**কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ**	**২৬৫-৩০২**
	Some Representatives Muslim Political Thinkers	
	প্রাক-কথা	২৬৫

www.pathagar.com

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আল-ফারাবী	২৬৫
	ইবনে সিনা	২৭২
	ইমাম আল গাজ্জালী	২৭৬
	ইবনে খালদুন	২৮০
	ইবনে রুশদ	২৯২
	নিজাম-উল মুল্ক তুসী	২৯৪
	আল মাওয়ার্দী	২৯৮
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	৩০১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	**ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ** **Indian Political Thinkers**	**৩০৩-৩৫৮**
	প্রাক-কথা	৩০৩
	অতীশ দীপংকর	৩০৩
	কৌটিল্য	৩০৬
	আল্লামা আবুল ফজল	৩১৭
	মহাত্মা গান্ধী	৩২১
	ড. আল্লামা ইকবাল	৩৩৩
	এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়)	৩৪৩
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	৩৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	**চীনা রাষ্ট্রচিন্তা** **China Political Thought**	**৩৫৯-৩৬৮**
	প্রাক-কথা	৩৫৯
	কনফুসিয়াস (Confucious)	৩৫৯
	তাঁর জন্ম, পারিপার্শ্বিকতা ও কর্মজীবন	৩৫৯
	কনফুসিয়ানিজম	৩৬০
	কনফুসিয়ানিজমের উৎপত্তি	৩৬০
	কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা/কনফুসীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য	৩৬১
	তাওইজম বা তাওবাদ	৩৬৫
	তাওবাদের বৈশিষ্ট্য	৩৬৬
	তাও ধর্মের মূলনীতি	৩৬৬
	নির্বাচিত প্রশ্নাবলি	৩৬৮
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নসমূহ		**৩৬৯-৩৭৩**
গ্রন্থপঞ্জী		**৩৭৪**

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা : এর অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি
Oriental Political Thought : Its Meaning, Nature and Scope

❒ প্রাক-কথা, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা কি? প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি, পরিধি বা বিষয়বস্তু, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা/উপযোগিতা বা গুরুত্ব

প্রাক-কথা
Introduction

সভ্যতা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনার ফসল। সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের কল্যাণময় চিন্তার অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণময় চিন্তারই এক অনিবার্য ফলশ্রুতি। মানুষ যুগে যুগে মানবসৃষ্ট যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করছে তন্মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় সদা প্রবাহমান। আর এই প্রবাহমানতার কারণেই রাষ্ট্রকে নিয়ে বিভিন্ন যুগের চিন্তকমহলের চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সুতরাং রাষ্ট্রকে নিয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিন্তক বা পণ্ডিতমহলের যে বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা তাই ইতিহাসে রাষ্ট্রচিন্তা নামে পরিচিত। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি হল ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা বা Western Political Thought (পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা) নামে পরিচিতি। অপরটি অ-ইউরোপীয় বা Oriental Political Thought (প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা) নামে পরিচিত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কিত ধারণা নিম্নের আলোচনা থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা কি?
What is Oriental Political Thought?

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অ-ইউরোপীয় ধারা তথা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা বলতে প্রাচীনকালের মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, পারসিক, চৈনিক ও ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তকদের চিন্তাধারাকে বুঝানো হয়। বস্তুত পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় দেশসমূহের চিন্তাবিদদের বিপরীতে প্রাচ্যের মিসর, পারস্য, চীন ও ভারতের চিন্তাবিদদের যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রবাহমান তাই প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্রচিন্তা নামে

www.pathagar.com

খ্যাত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তকদের পদচারণাই মুখ্য। তবে ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা দুটি ভিন্ন ধারা হলেও উভয় রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়বস্তুগত অভিন্নতা যে নেই তা বলা যায় না। উভয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎস ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই প্রবল। তবে একথা স্বীকার্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান যেমন প্রাচ্যের সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তেমনি প্রাচ্য সভ্যতা ও রাষ্ট্রচিন্তায় পাশ্চাত্যের প্রভাব বিদ্যমান। এ দুয়ের আলোচনার মধ্যে বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনি আছে বিষয়বস্তুগত অভিন্নতা ও গভীরতা। সারকথা, প্রাচ্যের যে সকল মনীষী ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে রাষ্ট্রীক কাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে গিয়ে ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেন তাই প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা হিসেবে পরিচিত। তবে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় আরব, আফ্রিকা, পারস্য, চীন ও ভারতের চিন্তকদের চিন্তাধারাও অন্তর্ভুক্ত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে সকলেরই কম বেশি অবদান রয়েছে তবে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি ও সুদূরপ্রসারী।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি, পরিধি বা বিষয়বস্তু
Scope and subjects matter of oriental political thought

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার পরিধি বা বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। কেননা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের চিন্তাধারার যে বিস্তৃতি তাই প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার পরিধি। তবে কোন আলোচনার দ্বারাই প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার পরিধির সীমারেখা টানা দুষ্কর। নিম্নে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হল।

প্রথমত, ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা সুবিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করে। অর্থাৎ ইসলাম কি, ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের Scholarদের অভিমত, ইসলামের ভিত্তি ও উৎসসমূহ, ইসলাম কিভাবে একটি পরিপূর্ণ ও প্রগতিশীল জীবনব্যবস্থা নির্দেশ করে, ইসলাম কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের নিশ্চয়তা তথা নিরাপত্তা বিধান করে ইত্যাকার বিষয় প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার মৌল ধারণা যেমন – সামাজিক সুবিচার, মৌলিক মানবাধিকার, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, উম্মাহ তথা জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ইসলামে সার্বভৌমত্বের অর্থ ও এর অবস্থান, খেলাফত, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সারবান আলোচনা ও বিশ্লেষণ এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত, ইসলামী আইন বা শরীয়াহ্ সম্পর্কে আলোকপাত করে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা ইসলামী আইন বা শরীয়াহ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করে। ইসলামী আইন কি, ইসলামী আইনের উৎস বা বৈশিষ্ট্য কি কি, ইসলামী আইন প্রণয়নের পদ্ধতি কি, এই আইন কিভাবে কার্যকর হবে, আইন অমান্যকারীর শাস্তির প্রকৃতি, ইসলামী আইনের বাস্তবতা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চতুর্থত, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি? ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ও গঠন প্রণালী, ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা, ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা তথা মজলিসে শুরার গঠন, ক্ষমতা ও কাজ, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের যোগ্যতা ও গুণাবলী, নির্বাচন পদ্ধতি, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় প্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনা ক্ষেত্র।

পঞ্চমত, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় ও বিষয়বস্তু, এর বৈশিষ্ট্য, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্পদ উৎপাদন, ভোক্তা, বন্টন, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস, আয়-ব্যয়ের নির্দিষ্ট খাতে যথাযথ বরাদ্দ, যাকাত, উশর, জিযিয়া, খারাজ, গণিমত, ফাই, সাদকাহ, লেন-দেন বা ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সুদ-মুনাফা এবং পাশ্চাত্যের প্রচলিত পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার তুলনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনায় মুখর।

ষষ্ঠত, আদর্শ সমাজের দিক নির্দেশনা দান। ন্যায়বিচার কি, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচারের সুফল, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের উপায়, সেই সাথে সমাজকে যাবতীয় অনাচার-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া, লটারী, ধূমপান, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ দূর করে আদর্শ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সঠিক দিক-নিদের্শনা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

সপ্তমত, যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, সেই সাথে বিশ্বকে অন্যায়-অসঙ্গত যুদ্ধ থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা; বিশ্বকে বিশ্ব মানবের জন্য সুখী সমৃদ্ধশীল, শান্তিময় আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশনা।

অষ্টমত, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনাক্ষেত্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়ও পরিব্যাপ্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার, সৃষ্টির সেবা তথা খেদমতে খালক, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ইত্যাদি।

সারকথা, আত্ম-পরিচিতি ও আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে পারলৌকিক মুক্তি তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় আন্তর্জাতিক সর্ব বিষয় প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বা সুস্পষ্ট বিধান নেই। তেমনি ব্যক্তিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীক জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের দৃষ্টি পড়েনি। অর্থাৎ প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি, পরিধি বা আলোচ্য বিষয় সীমাহীন।

www.pathagar.com

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও গুরুত্ব
Necessity, Utility and Importance of the study of oriental political thought

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তার পাশাপাশি প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে কম নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণে আল্লাহ্ প্রদত্ত কোরআনের আলোকে এবং রাসূল (স) নির্দেশিত পন্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার পাঠ গ্রহণ একান্তই প্রয়োজন। নিম্নে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

প্রথমত, ইসলাম একটি ধর্ম, একটি জীবন দর্শন — এ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হলে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়ন একান্তই প্রয়োজন। অর্থাৎ ইসলাম কি, ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের Scholarদের অভিমত, ইসলামের ভিত্তি ও উৎসসমূহ, ইসলাম কিভাবে একটি পরিপূর্ণ ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা নির্দেশ করে, ইসলাম কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা তথা নিরাপত্তা বিধান করে ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার মৌল ধারণা যেমন–সামাজিক সুবিচার, মৌলিক মানবাধিকার, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, উম্মাহ তথা জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, মৌলবাদ, ইসলামে সার্বভৌমত্বের অর্থ ও এর অবস্থান, খিলাফত, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা পাঠ করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ইসলামী আইন বা শরীয়াহ সম্পর্কে ধারণা লাভ। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা ইসলামী আইন বা শরীয়াহ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করে। ইসলামী আইন কি ইসলামী আইনের উৎস বা বৈশিষ্ট্য কি কি, ইসলামী আইন প্রণয়নের পদ্ধতি কি, এই আইন কিভাবে কার্যকর হবে, আইন অমান্যকারীর শাস্তির প্রকৃতি, ইসলামী আইনের বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি? ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ও গঠন প্রণালী, ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা, ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা তথা মজলিসে শুরার গঠন ক্ষমতা ও কাজ, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের যোগ্যতা ও গুণাবলী, তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় প্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রচিন্তা আলোকপাত করে।

পঞ্চমত, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য এটি পাঠ করা প্রয়োজন। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় ও বিষয়বস্তু, এর বৈশিষ্ট্য, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্পদ উৎপাদন, ভোক্তা, বণ্টন, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস, আয়-ব্যয়ের নির্দিষ্ট খাতে যথাযথ বরাদ্দ, যাকাত, উশর, জিযিয়া, খারাজ, গণিমত, ফাই, সাদকাহ, লেন-দেন বা ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সুদ-মুনাফা এবং পাশ্চাত্যের প্রচলিত পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার তুলনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনায় মুখর।

ষষ্ঠত, আদর্শ সমাজের দিক নির্দেশনা দান। ন্যায়বিচার ধারণা, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচারের সুফল, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের উপায়, সেই সাথে সমাজকে যাবতীয় অনাচার-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া, লটারী, ধূমপান, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ দূর করে আদর্শ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সঠিক দিক-নিদের্শনা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

সপ্তমত, যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি-তা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, সেই সাথে বিশ্বকে অন্যায়-অসঙ্গত যুদ্ধ থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা; বিশ্বকে বিশ্বমানবের জন্য সুখী সমৃদ্ধশীল, শান্তিময় আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশনা।

অষ্টমত, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার পরিধি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়ও পরিব্যাপ্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার, সৃষ্টির সেবা তথা খেদমতে খালক, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এটি পাঠ করা প্রয়োজন।

নবমত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষে -মুসলমান মনীষীদের অপরিসীম অবদান রয়েছে যা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় মুসলিম দার্শনিকদের বহুমুখী অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

পরিশেষে, উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন মানুষ যেমন পরিপূর্ণতা অর্জন করার সুযোগ লাভ করে তেমনি সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগে ব্রতী হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই শেষকথা নয়, বরং ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষের সাথে সাথে পারিবারিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জাতীয় আন্তর্জাতিক তথা ইহজাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান লাভের জন্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা বলতে কি বুঝায়? প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

[What is meant by Oriental Political thought? Explain the importance of the study of oriental political thought.]

২. প্রাচ্যের রাষ্ট্রদর্শন কি? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

[What is oriental political thought? Discuss its importance.]

৩. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা কি? এর প্রকৃতি, পরিধি আলোচনা কর।

[What is oriental political thought? Discuss its nature and scopes.]

৪. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা বলতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

[What is meant by oriental political thought? Discuss its features.]

৫. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

[Discuss the importance and necessity of the study of oriental political thought.]

৬. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। এগুলো সমকালীন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে কিভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?

[Discuss the features of oriental political thought. How the difference from the contemporary western political thoguht?

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম : অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও মৌলভিত্তি
Islam : Meaning, Features and Fundamental Basis

❑ প্রাক-কথা, ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা, ইসলামের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের মৌল ভিত্তি/ উপাদান - ঈমান, সালাত, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব, 'ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' – ব্যাখ্যা, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ধারণা

প্রাক-কথা
Introduction

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ সর্বোত্তম, আদর্শ ও শান্তিময় জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সকল ধর্ম, আদর্শ ও মতের উপর শ্রেষ্ঠ। এটি মহোত্তম ও কল্যাণময় জীবন দর্শন। ইসলামে রয়েছে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সুস্পষ্ট ও সঠিক নির্ভুল দিক নির্দেশনা। রয়েছে উদার মানবতাবাদী, ন্যায়ানুগ পরমতসহিষ্ণু বিশ্বজনীন আদর্শ, জাগতিক শান্তির পাশাপাশি পারলৌকিক মুক্তির দিক নির্দেশনা। বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে পথ ভ্রস্ট মানব জাতির সঠিক পথের দিশারীরূপে যে অসংখ্য নবী-রাসূলকে সুস্পষ্ট কিতাব তথা জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান (Guide Book) হল ইসলাম। আল্লাহর ঘোষণা – "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য আমার পছন্দনীয় দ্বীন করলাম।" (মায়েদাহ-৩)

তবে ইসলাম সম্পর্কে আরো স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্বারোপের চেষ্টা করা হয়েছে এবং ইসলামকে বিশ্ব মানবের মুক্তির একমাত্র বিধান হিসেবে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অকাট্য যুক্তি (দলিল) প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামকে কেবল নিছক একটি ধর্ম বলার কোনই অবকাশ নেই। কারণ এতে রয়েছে মানব জীবনের জাগতিক ও পরলৌকিক শান্তির দিক নির্দেশনা।

www.pathagar.com

ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Islam

'ইসলাম' আরবি শব্দটিকে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থগুলো হল –

এটি আরবি মূল 'সিলম' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, বশ্যতা স্বীকার করা। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা এক অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, তার আদেশ নির্দেশের প্রতি অনুগত হওয়া। 'সিলম' শব্দের অপর অর্থ শান্তি। (Islam means submission, surrender and obedience. As a religion, Islam stands for complete submission and obedience to Allah, Another meaning of Islam is 'peace' and this signifies that one can achieve real peace of body and mind only through submission and obedience to Allah. – Human Rights in Islam by Dr. Shaikh Shaukat Hussain P–1)

ইসলাম এমন একটি ধর্ম ও জীবনাদর্শ, যার মাধ্যমে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, ফলে মানব জীবনে অনাবিল শান্তি বর্ষিত হয়। অর্থাৎ সর্বজনীন শান্তি ও চিরকল্যাণময় ধর্ম ইসলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি অনুগত হয়েছে, সে মুসলিম হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত, নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান। যুগে যুগে এ ধরাধামে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলেই ইসলামের প্রচারণা চালিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম শুধু যে মুহাম্মদ (স) প্রচারিত ধর্ম তা নয়, বরং বিশ্বের প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত ধর্ম। ইসলাম সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম এবং সকল নবী-রাসূলই মুসলমানদের নবী-রাসূল। ইসলামের এই সর্বব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

"তিনি তোমাদের জন্য সেই ধর্মই নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহ কে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে। এজন্য যে তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করিও না।" (শূরা–১৩)। "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, এয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি, মুসা, ঈসা ও অপরাপর নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্য করি।" (বাক্বারা–১৩৬)। "রাসূল বিশ্বাস করেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রভুর নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরা সবাই বিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাকুলকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলদেরকে। আমরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।" (বাক্বারা–২৮৫)

www.pathagar.com

ধর্ম হিসেবে ইসলাম বলতে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ও অনুগত হওয়াকে বুঝায়। আর শান্তির ধর্ম বলতে বুঝায় মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও অনুগত হওয়ার মাধ্যমে দেহ ও মনের প্রশান্তি অর্জনে সক্ষম হয়।

সুতরাং ইসলামের উপরিউক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ইসলাম শুধু শেষ নবী প্রচারিত ধর্ম বা জীবনাদর্শ নয়, বরং প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত এক ও অভিন্ন ধর্ম। তাই ইসলামকে অন্ধ ও অযৌক্তিকভাবে, 'মোহামেডানিজম' বলে আখ্যা দেয়া সঙ্গত নয়। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত তথা একমাত্র পছন্দনীয় জীবন বিধান। পাশ্চত্যের কিছু ইসলাম বিরোধী চিন্তাবিদ একসময় ইসলামকে মোহামেডানিজম বলে অপপ্রচারে প্রয়াস পেয়েছিলো এবং তা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে ইসলাম একটি মানব রচিত ধর্ম যা পরিবর্তনশীল।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Islam

ইসলামের কয়েকটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায় যে ইসলাম অন্যান্য জীবনাদর্শ থেকে ভিন্ন, অনন্য এবং মানবের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। তবে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে ইসলামের অন্তর্নিহিত কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল।

প্রথমত, পূর্ণতা। ইসলাম মানব সমাজের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জাগতিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক সকল (বর্তমান ও ভবিষ্যতের) সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানপূর্বক জীবন ব্যবস্থা পূর্ণ মহিমায় ভাস্বর করে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা। অর্থাৎ ইসলাম মানুষের আদর্শ জীবন নিশ্চিতকরণে জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয়, স্থায়িত্ব। ইসলামী জীবন বিধান অন্যান্য জীবন বিধান থেকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। মানব রচিত বিধান পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো অপরিবর্তনীয় এবং সর্বত্র ও সর্বযুগে সমানভাবে উপযোগী।

ইসলামের অন্যান্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর। ইসলামের পূর্বশর্ত হল আল্লাহর সকল সৃষ্টির মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তঃকরণে বিশ্বাসের মাধ্যমে তদানুযায়ী কার্যে পরিণত করা। একত্ববাদের অর্থ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রভূত্ব বিদ্যমান। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সকল প্রাণীর রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, নিয়ন্ত্রক। আল্লাহর উপর এবং তার সকল সৃষ্টি ও নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস এবং রিসালাত ও মৃত্যর পর দ্বিতীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, আখেরাত ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে ঈমান ও আমল তথা বিশ্বাস ও অনুশীলনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে একজন মানুষ ইসলামের অপরাপর মৌল নীতি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব ইত্যাদি পালনের মধ্যে প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান হিসেবে নিজেকে মূর্ত করে তোলে। রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ নিজের রব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মদ (স)কে রাসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে সেই প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়েছে।" (মুসলিম, মেশকাত)

২. বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক : আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার বস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য কর্ম করতে বলেছেন। যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীর মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও যাবতীয় কুসংস্কার, গোমরাহীর অন্ধকূপ থেকে সরল-সঠিক ও কল্যাণময় পথের দিশা দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হল কর্মের উপর গুরুত্বারোপ; শুধু নামায, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাকার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বলা হয়েছে নামায শেষে তোমরা কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়। নিজের এবং নিজের পরিবারের, অতঃপর আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশি সর্বোপরি মানবের প্রতিও ইসলামে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। বৈরাগ্য জীবন ইসলামে নেই। ইসলাম কর্মময় জীবনে বিশ্বাসী। বিশ্বাসহীন কর্ম আল্লাহ গ্রহণ করেন না। কারণ ইসলাম যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত।

অতঃপর আপন স্রষ্টাকে, স্রষ্টার সৃষ্টিরাজিকে উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। মূর্খতা বা অজ্ঞতাকে ইসলাম স্থান দেয় না। আল-কোরআনের সর্বপ্রথম বাণীই হল 'পড়' তথা জ্ঞানার্জন কর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (স) বলেন, "বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ।" আল কোরআনের ঘোষণা "অজ্ঞলোক আর জ্ঞানীলোক সমমর্যাদাপূর্ণ নয়।" ইসলামের শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয় বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধিৎসা ইসলামের প্রাণশক্তি। বিজ্ঞান না জানলে কোরআনকে বুঝা যাবে না। আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকার জন্যও জ্ঞার্নাজন অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে ভয় করে" (ফাতির-২৮)। মহাবরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ গ্রন্থ আল কোরআন স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাই সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার ব্যাপারে আল কোরআন মানবকুলকে বারংবার তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, যারা অন্তর, চক্ষু, কর্ণ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে না তারা চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় সে আল্লাহর পথেই বের হয়। সেই সাথে ইসলামে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল নির্দেশিত ইবাদত বন্দেগী (নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব) করা একজন মুমিন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কর্ম বা বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক (Material, intellectual and Spiritual) এ তিনের সমন্বয়েই (Balanced) ইসলামের পরিপূর্ণতা এসেছে। কারণ ইসলাম মানুষের জীবনের ভাব ও বস্তুকে পৃথক সত্তা হিসেবে দেখে না। কর্মবিমুখতা ইসলামে নেই। বরং কর্মের মাধ্যমেই জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। স্রষ্টার সান্নিধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধি আসে তাই ইসলাম পার্থিব, নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্দেশ দেয়; কিন্তু এর মধ্যে ভারসাম্যের অভাব হলে কোন কিছুতেই পরিপূর্ণতা আসবে না। ফরাসি বিজ্ঞানী ড. ডি ব্রগবি যথার্থই বলেছেন, "ভারসাম্যহীনতার ফলে উগ্রবস্তুবাদী সভ্যতা আজ ধ্বংসের

www.pathagar.com

মুখোমুখি, যদি আধ্যাত্মিক জীবনধারার উন্নতি সাধন করে কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য আনা না যায় তবে এ সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।" (খুরশিদ আহ্‌মদ-ইসলামের আহ্‌বান পৃষ্ঠা-২১)

৩. ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য : ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। আত্মাকে পরিশুদ্ধির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ভারসাম্য আনয়ন ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামে ব্যক্তির সকল অধিকার স্বীকৃত। ইসলাম ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রের বেদিমূলে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন ইসলাম অনুমোদন করে না। সেই সাথে ইসলাম সামষ্টিক তথা সামাজিক জীবনের উপরও গুরুত্বারোপ করেছে। প্রতিটি মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের ভাল-মন্দ ফল ভোগ করবে। আবার সমষ্টিগতভাবে ভাল কিছুর চেষ্টা না করলে আল্লাহ তাতে সাড়া দেন না। আল্লাহর ঘোষণা "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন জাতির বিপদ চান তখন তা প্রতিরোধ হওয়ার মত নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কেউ সাহায্যকারী নেই" (রাদ-১১)। ইসলাম মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সামাজ ও রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করে, সামাজিক কাজে সম্মিলিত অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়। জামাতে নামায আদায়, যাকাত প্রদান, প্রয়োজনে জিহাদে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রকে শত্রুমুক্ত করা, আত্মীয়-প্রতিবেশী, গরিব, নিঃস্বদের হক আদায় করা ইত্যাদি সামাজিক কার্যাবলির নিদর্শন যা সমাজের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

৪. স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা : বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন 'Norms and values' এর ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন দু-ই লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কোন সমাজে বিভিন্ন মতবাদ ও রীতিনীতির স্থায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে, আবার কোন সমাজ ও সংস্কৃতিতে এগুলোর পরিবর্তনশীলতার প্রতি জোর দিয়ে থাকে। এতে সমাজে অচলাবস্থা বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেখানে স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা উভয় নীতির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। মানব জীবনের স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা দুই আছে। আছে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন, তেমনি প্রকৃতির গাছ-পালা ফলমূলের বর্ধন-পরিবর্তন। মানব জীবনের সমস্যা বহুমুখী, দেশভেদে সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হেতু এর সমাধানের উপায় উপকরণ বা কৌশলও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তুলেছে ধরেছে। কোরআন ও সুন্নাহ ইসলামের শাশ্বত বিধান। আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ এসেছে মূলনীতি হিসেবে যুগ ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে। তবে এর বাস্তবায়নের স্বাধীনতা ব্যক্তিকে দিয়েছেন। ইসলামী মৌলনীতি কোরআন সুন্নাহর পরেই রয়েছে ইজমা, কিয়াস এবং ইজতিহাদ। সুতরাং মৌলিক নীতিগুলো চিরস্থায়ী কিন্তু যুগের ব্যবধানে বৈচিত্র্যময় চাহিদার আলোকে বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন হতে পারে। তাই ইসলাম গতিশীল এবং আধুনিক জীবন ব্যবস্থা।

৫. জীবনের নিরাপত্তা বিধান : ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দিক নির্দেশনা দেয়। কারণ জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষ অবাধে সুবিধামত নিরাপদ জীবনযাপন করবে।

www.pathagar.com

জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কার্যকলাপের প্রতি ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন—বিনা কারণে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, "কোন মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যার অধিকার রাখে না, আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যৌক্তিক কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কর না (বনী ইসরাইল-৩৩)। "কোন নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে অভিযুক্ত ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করলে, সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন সমগ্র মানুষকে রক্ষা করল।" (মায়েদাহ-৩২)

৬. সম্পদের নিরাপত্তা : ইসলাম মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সকল প্রকার সম্পদের ন্যায়সঙ্গত মালিকানা ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ নিষিদ্ধ। তেমনি চুরি করা, ইয়াতিমের সম্পদ হরণ করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসী বান্দাগণ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ কর না।"

৭. রাজনৈতিক জীবন : মানুষ একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। ইসলাম কেবল মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক জীবনের দিক নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলামে রাজনৈতিক জীবনেরও বিধান রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহর সৃষ্টি; তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী, অপরিসীম ক্ষমতাধর, সর্ববিষয়ে প্রাজ্ঞ। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুমই চলবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, "শাসন চলবে কেবল আল্লাহর" (আনআম-৫৭)। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক স্বয়ং আল্লাহ, তিনি পালনকর্তা, বিধান দাতা। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ কর না" (আরাফ-৩)। অন্যত্র বলেন, "আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচারকার্য করে না তারা কাফের" (মায়েদাহ-৪৪)। অনেক ইসলাম বিদ্বেষী মনে করেন ইসলামে রাজনীতি নেই, বরং ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত ইসলামে যে উদার রাষ্ট্রনীতি রয়েছে তা অন্য কোন ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর এই সার্বভৌমত্বের রূপায়নের দায়িত্ব আল্লাহর প্রতিনিধি তথা মানুষের উপর। মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণমাত্রায় সকলের জন্য সমান, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের অনুশাসন, মৌল মানবাধিকার বিদ্যমান থাকবে, থাকবে অমুসলিম ও জিম্মিদের অধিকার। খলিফা বা শাসক হবেন ঐশীজ্ঞানে ভাস্বর, সৎগুণের অধিকারী বলিষ্ঠ ও দক্ষ নেতা, যার মধ্যে থাকবে খোদাভীতি, যিনি জনগণের কাছে এবং শেষ বিচার দিবসে আপন প্রভুর কাছে জবাবদিহি থাকবেন। সুতরাং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে যা অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত।

৮. আন্তর্জাতিক জীবন : ইসলাম সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এটি সকল সৃষ্টির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যক্তিক জীবন থেকে শুরু করে জাতীয়-আন্তর্জাতিক জীবনের সঠিক ও সফল দিক নির্দেশনা ইসলামে বিশদভাবে বিধৃত আছে। ইসলামে আন্তর্জাতিক জীবন হল ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অপরাপর রাষ্ট্রের বা মুসলমানদের সাথে অন্যান্য জাতির

www.pathagar.com

সম্পর্কের ধারা। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রেখে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, সম্পাদিত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যান্য জাতির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সহযোগিতায় আন্তরিকতা প্রদর্শন, অন্যায়ভাবে জবর-দখল নীতি (আগ্রাসন) বর্জন, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তিদূত প্রেরণ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক।

৯. আইন ও বিচার ব্যবস্থা : রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ, জীবনকে সুশৃঙ্খলকরণ, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা রয়েছে। ইসলামী আইনের প্রধান ও প্রাথমিক উৎস দুটি। যথা – পবিত্র ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন এবং তদীয় রাসূল (স) এর সুন্নাহ (হাদীস)। অতঃপর মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রচলিত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অনাচার অবিচার শোষণ, বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস অক্টোপাসের মত বিস্তার লাভ করে তা দূর করার জন্য বিশেষত সুষ্ঠু, সুন্দর জীবন নিশ্চিত করার জন্য কোরআনিক বিচার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

১০. ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা : আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর উভয়কে স্ব-স্ব আসনে সমাসীন করেছেন। বিশেষত ইসলাম নারীকে যে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে অন্য কোন পদ্ধতি তা করতে পারেনি। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। মাতা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা, দাসী হিসেবে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় সমানাধিকার, বিচারকার্যে সাক্ষ্য দান, শিক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতি মোট কথা নারীর অধিকার ও মর্যাদা কোন অংশেই পুরুষের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে একটু বেশি। (যেমন – সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে)। প্রাক্-ইসলামী যুগে যেখানে কন্যা শিশুকে জীবন প্রোথিত করা হত, অকারণে নারীদের নির্যাতনপূর্বক কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখা হত সেখানে ইসলাম নারীর এই অবমাননাকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে স্ব-মর্যাদায় অসীন করেছে। আর এ সুবাদেই আজ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের মত শীর্ষপদে নারী নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ করছি। The status of woman in Islam is something unique, something novel, something that has no similarity in any other system (Islam in Focus-p-185)

ইসলামের মৌল ভিত্তি ও উপাদান
Fundamental Basis of Islam

ইসলাম সকল যুগের সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত সর্বজনীন ধর্ম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র রব আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম ও জীবন বিধান ইসলাম, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইসলাম সকল ধর্মমতের উপর বিজয়ী আদর্শ যার প্রমাণ আল-কোরআনে বিধৃত রয়েছে। এই ইসলামের মৌল ভিত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) বলেন "ইসলাম পাঁচটি মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ

www.pathagar.com

ব্যতীত আর কোন ইলাহ (প্রভু) নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লার রাসূল; নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব পালন করা এবং রমযানের রোযা রাখা।" (বুখারী-মুসলিম)। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যার প্রকাণ্ড ইমারত নির্মিত হয়েছে পাঁচটি মৌল স্তম্ভের উপর। মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম মানবের জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণসাধনে বদ্ধ পরিকর। তাই ইসলামের পাঁচটি মৌলিক নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালনের মাধ্যমে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য শ্রেয়।

১. ঈমান বা বিশ্বাস (Faith) : বিশ্ব মানবের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম।' এর প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে ঈমান। ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। এক ও অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ, ঐশী গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতাকুল, আখেরাত তথা শেষ বিচার দিবসের (কিয়ামতের দিন) প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাসের নামই ঈমান। আল্লাহ বলেন, "রাসূল বিশ্বাস রাখেন সে সব বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। মুমিনগণও, তারা সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি এবং রাসূলগণের প্রতি" (বাক্বারা-২৮৫)।

অনুরূপভাবে সূরা বাক্বারার-১৭৭ নং আয়াতেও ঐ একই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের ফকীহমহল ঈমান বা বিশ্বাসের পাঁচটি মূলনীতির উল্লেখ করেছেন।

(ক) ঈমানের প্রথম মূলনীতি যা ইসলামের মূলমন্ত্র হিসেবে গণ্য তা হল কালিমা শাহাদাতের প্রথমাংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা প্রভু নাই। প্রকৃত মুসলমান আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্বে যিনি সর্বজ্ঞ, শাশ্বত, মহাপরাক্রমশীল, ক্ষমা ও দয়ার আধার; সর্বত্র বিরাজমান, প্রাজ্ঞ, অবিনশ্বর, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, রিযিকদাতা এবং সার্বভৌম কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক।

(খ) কালিমার শেষাংশ (রিসালত) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তথা মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে একজন মুসলমানকে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে হযরত মুহাম্মদ (স) প্রেরিত নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। তারপরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। সেই সাথে পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত যত নবী রাসূল সত্য দ্বীন ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, প্রচার করেছেন তাদের সকলের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

(গ) কালামুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল (স) এর প্রতি বিশ্বাস। এ পর্যায়ে প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ প্রেরিত সকল কিতাব ও প্রত্যাদেশের প্রতি বিশ্বাস করে। কারণ যুগে যুগে পৃথিবীতে স্থান, কাল, জাতি নির্বিশেষে পথভ্রষ্ট মানুষ আলোর পথে তথা আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ কিতাবসহ অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু রাসূল (স) এর উপর সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কোরআন পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যদিয়ে কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। তাই রাসূল (স) হলেন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল কোরআন হল সর্বশ্রেষ্ট, আর ইসলাম হল সকল

www.pathagar.com

নবী রাসূলের প্রচারিত ধর্ম, যা রাসূল (স) এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুমিন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

(ঘ) ঈমানের চতুর্থ মূলনীতি খোদায়ী-দূত তথা ফেরেশতাকুলের প্রতি বিশ্বাস করা। ফেরেশতারা নিরেট আধ্যাত্মিক ও দীপ্তিমান সত্তা। তাদেরকে পানাহার, নিদ্রা, দৈহিক বাসনা স্পর্শ করে না। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে রত। আল্লাহ বাণী – "তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে বিজলী ও ফেরেশতাগণ সবাই" (রা'দ-১৩)। "নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ফেরেশতাকুল আল্লাহকে সেজদা করে। তারা অহংকার করে না। তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং যা আদেশ করা হয় তা পালন করে" (নাহল-৪৯-৫০)। এতএব ঐশী বার্তাবাহক রূহুল আমিন তথা জিব্রাইল (আ) সহ আল্লাহর হুকুম তামিলে রত অসংখ্য ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম দিক।

(ঙ) ঈমানের পঞ্চম মূলনীতি হল পরকালের প্রতি বিশ্বাস। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং মৃত প্রাণগুলো বিচারের জন্য পুনরুত্থিত হবে। শেষ বিচার বা হাশর সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা – "যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। যখন সে তার বোঝা উদগীরণ করে দেবে এবং মানুষ বলবে এর কি হল? সে দিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ আপনার প্রভু তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রকাশ পাবে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা প্রত্যক্ষ করবে। আর অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা প্রত্যক্ষ করবে" (যিলযাল, ১-৮)। "অতঃপর যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুৎকার দেয়া হবে, এবং পৃথিবী ও পবর্তমালা উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় (কেয়ামত)" (হাক্কাহ, ১৩-১৬)। আল্লাহর ঘোষণানুযায়ী এ পৃথিবীর সবকিছুই শিঙ্গার ফুৎকারে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু অবশিষ্ট থাকবে মহিমান্বিত এবং মহানুভব এক আল্লাহর সত্তা। সুতরাং পারলৌকিক জীবন ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপনের ফলে একজন মুমিন মুসলমান সৎপথে পরিচালিত এবং অসৎপথ থেকে দূরে থাকার দীক্ষা লাভ করে, সকল কার্যে মনোবল সঞ্চার হয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং সকল আপদ-বিপদে অসীম ধৈর্যের প্রেরণা পায়; আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর আনুগত্য (শিরক, কুফর, নিফাক) থেকে বিরত থাকে, সর্বোপরি নিজেকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় রাখার সাথে সাথে অন্যদেরকেও এই অনন্য পথের দিকে আহ্বান করে।

২. সালাত বা নামায : ইসলামের দ্বিতীয় বুনিয়াদ বা মৌল স্তম্ভ হল নামায। ঈমানের বাস্তব প্রায়োগিক দিকের একটি সালাত। সালাত অর্থ প্রার্থনা। আর এই প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য প্রকাশ পায়, আল্লাহ সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নিমিত্তে একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করার পাশাপাশি অপরাপর আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো পালন করা একজন মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নামাযের মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, দেহ-মনের প্রশান্তি আসে। রাসূল (স) বলেন, নামায হল দ্বীনের স্তম্ভ। পবিত্র কোরআনে বারংবার নামাযের নির্দেশ এসেছে। নামাযকে দু'আ, যিকর, তাসবীহ, ইবাদত প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। নামাযের মাধ্যমেই বান্দা তার আপন প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করে। শুধু মানুষ নয় জগতের সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা বা তসবীহ পাঠ করে থাকে। আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)কে উদ্দেশ্য করে বলছেন – "তুমি কি দেখ না আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষতলা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে" (হজ্জ-১৮)। "সপ্তম আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না" (বনি ইসরাঈল-৪৪)। সুতরাং রাসূল (স) নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহমন, পোশাক পবিত্র করে নামাযের সকল আরকান আহকাম আদায়পূর্বক কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য (জামাতের সাথে) নামায কায়েম করা প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহর নির্দেশিত ফরজ ইবাদত। সালাত মুমিন বান্দার জন্য মি'রাজ স্বরূপ। এটা জান্নাতের চাবিকাঠি। রাসূল (স) এরশাদ করেন, "নামায ধর্মের ভিত্তি। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে ধর্মকে কায়েম করে, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে ধর্মকে পরিত্যাগ করে।" নামায মানুষকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণে এই নামাযের অনেক উপকারিতা রয়েছে বলে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

৩. রোযা : রোযা মুসলমানদের উপর একটি ফরজ ইবাদত। রোযার বিধান প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মতের উপর এসেছে। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর উম্মতের উপর রোযার বিধানকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। এজন্য যে আশা করা যায় তোমরা খোদাভীতি অর্জন করবে" (বাক্বারা-১৮৩)। রোযা আরবি শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ দহন, বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা। মানব জীবনে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র মাহে রমযানের এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা মুসলমানের জন্য এক বিরল সৌভাগ্যের বিষয়। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন রোযাদার বান্দা নিজেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সকল প্রকার আহার, যৌন মিলন, অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রেখে নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়। এ এক অনুপম আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য। রোযা মানুষকে ধৈর্য ও সহনশীলতার দীক্ষা দেয়, অনাহার ক্লিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ করে তোলে। সর্বোপরি, দেহ ও আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিশুদ্ধ করে। সেই সাথে রমযান মাসকে মহিমান্বিত তথা বিশেষ ফজিলতপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ এ মাসেই পবিত্র গ্রন্থ আল্লাহর কালাম কোরআন নাযিল হয়েছে মানুষের হেদায়েত তথা সঠিক দিক-নির্দেশনা স্বরূপ। আবার এ মাসেই রয়েছে একটি অতি মহিমান্বিত রাত, যে রাতের ইবাদত হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। সুতরাং মুসলমানের জীবনে রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

৪. যাকাত : ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হল যাকাত। যাকাত হল ইসলামের অর্থনৈতিক ইবাদত। যাকাতের শাব্দিক অর্থ-পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ সম্পদের যাকাত আদায় করলে তা পবিত্র হয়, আর পরিমাণে বৃদ্ধিও পায়। যাকাত মুসলমানের জন্য একটি ফরজ ইবাদত। যাকাত কোন দান-খয়রাত কিংবা ট্যাক্স এর পর্যায়ভুক্ত নয়, এটা আল্লাহর নির্দেশিত এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ। সমাজ

www.pathagar.com

জীবনে যাকাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে একদিকে ধনীদের সম্পদ পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সমাজের অভাবী ও দরিদ্র লোকদের স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। নামাযের পরেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ এসেছে। আল্লাহর কতিপয় ঘোষণা – "নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। "তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে সকল সৎ কাজ নিজেদের কল্যাণার্থে করবে, তার সবটুকুর প্রতিফলই আল্লাহর কাছে পাবে" (বাক্বারা-৪৩, ১১০)। "তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাদান করলে তারা নামায কায়েম করবে যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দিবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণতি আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত" (হজ্জ-৪১)। রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে অথচ এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত হবে যার মাথায় কালো দাগ থাকবে। এ সাপ ঐ ব্যক্তির গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তার গলায় ঝুলে দু'গালে কামড়াবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" সুতরাং সম্পদ যেন শুধু ধনীদের হাতে পুঞ্জিভূত না হয় এবং সমাজ যাতে আর্থিকভাবে ভেঙ্গে না পড়ে এজন্য ধনীদের সম্পদে সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং যাকাতকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

৫. হজ্জ্ব : ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং শ্রেষ্ঠ বিধান হজ্জ্ব। হজ্জ্ব একাধারে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। আর্থিক ও দৈহিক দিক দিয়ে সক্ষম এমন প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অন্তত জীবনে একবার পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ্বব্রত পালন করা ফরজ। হজ্জ্ব এমন একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত যার সাথে আর্থিক ও শারীরিক শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই সকলের উপর হজ্জ্বব্রত পালন বাধ্যতামূলক নয়। আল্লাহ বলেন, "মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হল যে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি-সামর্থ রাখে সে যেন হজ্জ্ব করে, আর যে এ নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না" (ইমরান-৯৭)। "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যখন হজ্জ্ব ও ওমরার নিয়ত করবে তখন তা পূর্ণ করবে" (বাক্বারা-১৯৫)। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরজ করেছেন। অতএব হজ্জ্ব কর" (মুনতাকী)। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে মুসলমানদের জীবনে হজ্জ্বের গুরুত্ব অত্যধিক। হজ্জ্ব উপলক্ষে পবিত্র মক্কায় যে লাখ লাখ মুসলমানের সমাবেশ ঘটে তাতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত দৃশ্যমান হয়। হজ্জ্ব মুসলমানদের সর্ববৃহৎ বিশ্ব সম্মেলন। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে হজ্জ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। এরূপ অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃশ্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বা আদর্শের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ।

উপরের সারবান যুক্তিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় ইসলাম যে পাঁচটি যৌক্তিক মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এর কোন একটিকে অস্বীকার করলে ইসলামকেই অস্বীকার করা হয়। প্রকৃত মুসলমান সেই যার মধ্যে এই সকল মৌল ভিত্তির

www.pathagar.com

সুসমন্বয় ঘটেছে। আর এরূপ মুসলমানদের দ্বারা কেবল বিশ্বকে সকল মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ আবাস হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল কোরআন ও রাসূল (স) এর সুন্নাহের আলোকে সকল কার্য পরিচালিত হবে।

ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা
Islam is not a Mere Religion, it is a Complet code of Life

"ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না" (ইমরান-১৯/৮৫)। (Islam is not simply an abstract ideal conceived just for nominal adoration or a stagnant idol to be frequented by admirers every now and then) "Islam is a code of life, a living force manifest in every aspect of human life" – Hammad Abdel Latif, Islam in Focus, P-105

সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ অবধি বিশ্বমানবতা অনেক মতবাদ, জীবন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, একনায়কতন্ত্রবাদ আর অর্থনীতিতে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ বা ধনিকতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ। রাজনীতিক মতবাদগুলো রাজনীতিকে মুখ্য এবং অর্থনীতিকে গৌণ প্রতিপন্ন করে আর অর্থনৈতিক মতবাদগুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানব জীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ কোন মতবাদই রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে নি। ইসলামই বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন প্রকার অপূর্ণতা নেই। ইসলাম ধর্ম হল মহান আল্লাহর ঐশী বাণীর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন। আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য আমার পছন্দনীয় দ্বীন করলাম" (আল মায়েদাহ-৩)। সুতরাং ইসলাম শুধু ধর্মই নয় এটা একাধারে একটি ধর্ম, একটি জীবনাদর্শ একটি সর্বোত্তম গতিশীল ও যুক্তিগ্রাহ্য কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। Gibb এর ভাষায়, "Islam is indeed, theology. It is a complete civilisation --------- No religion contained greater promise of development, no faith was purer or more in conformity with the progressive demands of humanity than Islam". (Gibb – Whither Islam)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা : ইসলাম মহান স্রষ্টা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কর্তৃক বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্য নাযিলকৃত একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম মানুষকে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিরাজির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেয় যে, মানুষ সবকিছুর সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। ইসলাম মানবীয় ইচ্ছা ও ঐশী ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মানব জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তোলে। কারণ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া, অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। ইসলামের অপর অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার ব্যক্তিক, সামাজিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য আহবান জানায়। যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের পিছনে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য নিহিত তা হল পথভ্রষ্ট মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহবান করা। আল্লাহ বলেন, "ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।" ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হলে আল্লাহ কখনো তা গ্রহণ করবেন না" (আল ইমরান-১৯, ৮৫)। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শুধু কতগুলো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলামের নীতি ও আদর্শ সীমাবদ্ধ নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের উদারনীতি ও আদর্শের ছোঁয়া লক্ষণীয়। ইসলাম মানব জাতিকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও শান্তির মাধ্যমে পারলৌকিক অনন্ত শান্তির দিকে আহবান করে। ইসলামের তিনটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা – পূর্ণতা, বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণে এ ব্যবস্থা সক্ষম। এরপর রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা। অর্থাৎ এটি এমন আদর্শ যা জাতীয় জীবনে উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রয়েছে স্থায়িত্ব, মানব রচিত সকল বিধান অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। আর ইসলামী বিধান (আইনসমূহ) স্থায়ী, সর্বত্র ও সর্বসময়ে উপযোগী।

১. ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম : মানব জীবনের প্রাথমিক স্তর তার ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত জীবন থেকেই পরবর্তীতে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনের উৎপত্তি। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিক জীবনের নানাদিক নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করে। পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পোশাক, সৌন্দর্য, আহার-বিহার, চিত্তবিনোদন ইত্যাকার বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এছাড়া সততা, নৈতিকতা, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাকার বিষয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পরিবারের, রাষ্ট্রের কিরূপ সম্পর্ক হবে, ব্যক্তি কি কি স্বাধীনতা উপভোগ করবে ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইসলামে পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে।

২. পারিবারিক জীবন ও ইসলাম : সমাজের ক্ষুদ্রতম ও আদিম সংগঠন হল পরিবার। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা, অবাধ যৌনাচার তথা যেনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, অকারণে বহুবিবাহ ইত্যাদি আচরণ ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তাই স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক জীবনের জন্য বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা- মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর প্রতি কিরূপ্র সম্পর্ক, কি দায়িত্ব-কর্তব্য, পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য, ছোটদের প্রতি বড়দের, বড়দের প্রতি ছোটদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের সঠিক নিদের্শনা রয়েছে। পরিবারের সবার সাথে সদ্ব্যবহার করা একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া সকলকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা পরিবার প্রধানের অপরিহার্য দায়িত্ব। বস্তুত কোরআন-সুন্নাহর অমোঘ বিধানের আলোকে মানুষের পারিবারিক জীবন পরিচালিত হবে। ইসলামের এই সুন্দর পারিবারিক কাঠামোর প্রতি মুগ্ধ হয়ে অনেক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে।

৩. ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন : ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক সামগ্রিক অখণ্ড সত্তা, এর প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সাথে অচ্ছেদ্য। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না, ইসলামে রয়েছে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান। আল কোরআনে

www.pathagar.com

বারংবার ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে ঘোষণা এসেছে। আল্লাহর নামে কর্ম শুরু করা, তাঁরই প্রশংসা করা, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, সকল সংকটে সুখে-দুঃখে তাঁরই উপর নির্ভরশীল হওয়া। একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত পালন করা। ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বান্দার চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি সাধনই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য।

৪. সামাজিক জীবন : মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব, এটা শাশ্বত সত্য। তাই প্রকৃত মুসলমানের সামাজিক জীবন কোরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই সামাজিক জীবনের লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। ইসলামী সমাজে কোন ধরনের শোষণ-বৈষম্যের সুযোগ নেই। সমাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য প্রয়োজন সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সুবিচার, ভাল কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা প্রদান। এসব বিষয়ে ইসলামে অত্যন্ত সুন্দর দিকনির্দেশনা রয়েছে। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, বংশভেদ ইত্যাদি পার্থক্য ইসলামে অর্থহীন। কবির ভাষায় "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।" সুতরাং ইসলাম মানুষের কাছে এক অতি উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক জীবন তুলে ধরেছে-যা অন্য কোন জীবন পদ্ধতিতে নেই।

৫. অর্থনৈতিক জীবন : ইসলামের অর্থনৈতিক জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের সংস্থানের জন্য শ্রম বা পেশা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হয়। আল্লাহ প্রত্যেক বান্দাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু পেশা গ্রহণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপে ইসলামের বিধান রয়েছে; রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতি মূলত কোরআন-সুন্নাহ নির্ভর। Legal income and expenditure is legal way এটাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অধিকতর কল্যাণকর। কারণ ইসলামে সম্পদের মালিকানা আল্লাহর, মানুষ এর ব্যবহারকারী মাত্র। আল্লাহর দেয়া সম্পদকে ন্যায়পন্থায় ব্যয় করা মুসলমানের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর" (হাদীদ-৭)। তবে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ, অপব্যয়, মওজুদদারী, সুদ, দাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রাণস্বরূপ। নিয়মিত যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মালের পবিত্রতা অর্জনপূর্বক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে ভূমিকা পালনও একজন মুসলমানের ঐশী দায়িত্ব।

৬. রাজনৈতিক জীবন : মানুষ একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। ইসলাম কেবল মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক জীবনের দিক নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলামে রাজনৈতিক জীবনেরও বিধান রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহর সৃষ্টি; তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী, অপরিসীম ক্ষমতাধর, সর্ববিষয়ে প্রাজ্ঞ। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুমই চলবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, "শাসন চলবে কেবল আল্লাহর" (আনআম-৫৭)। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক স্বয়ং আল্লাহ, তিনি পালনকর্তা, বিধান দাতা। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা

www.pathagar.com

অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ কর না" (আরাফ-৩)। অন্যত্র বলেন, "আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচারকার্য করে না তারা কাফের" (মায়েদাহ-৪৪)। অনেক ইসলাম বিদ্বেষী মনে করেন ইসলামে রাজনীতি নেই, বরং ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত ইসলামে যে উদার রাষ্ট্রনীতি রয়েছে তা অন্য কোন ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর এই সার্বভৌমত্বের রূপায়নের দায়িত্ব আল্লাহর প্রতিনিধি তথা মানুষের উপর। মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণমাত্রায় সকলের জন্য সমান স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের অনুশাসন, মৌল মানবাধিকার বিদ্যমান থাকবে, থাকবে অমুসলিম ও জিম্মিদের অধিকার। খলিফা বা শাসক হবেন ঐশীজ্ঞানে ভাস্বর, সৎগুণের অধিকারী বলিষ্ঠ ও দক্ষ নেতা, যার মধ্যে থাকবে খোদাভীতি, যিনি জনগণের কাছে এবং শেষ বিচার দিবসে আপন প্রভুর কাছে জবাবদিহি থাকবেন। সুতরাং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে যা অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত।

শেষকথা : পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটা একটি পূর্ণাঙ্গ, প্রগতিশীল, শান্তিময় ও যুক্তিগ্রাহ্য জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের মৌলবিশ্বাস তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক নীতিসহ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ ইসলামের পরতে পরতে বিধৃত আছে। ইসলাম মানুষের জাগতিক জীবনকে সুন্দর-সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সাথে সাথে অনন্তকালীন পারলৌকিক জীবনের মুক্তির দিক নির্দেশনাও দিয়েছে। সুতরাং এমন অনুপম, কল্যাণময় জীবন বিধান এক ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয়টি নেই। আর ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে আল্লাহর বাণী "হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ এজন্য প্রেরণ করেছেন যে তিনি এটাকে অন্য সকল মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা মুশরিকদের কাছে অপছন্দনীয়"- (তওবা-৩৩)। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায় "Islam is not a mere creed, It is a life to be lived in the present a religion of right doing, right thinking, and right speaking, founded of divine love, universal charity and the equality of man in the sight of the lord" (The Spirit of Islam-p-178)

বাস্তবতা এই যে মানবরচিত মনগড়া মতবাদের স্রোতে ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া যেভাবে গা ভাসিয়ে চলছে - ইসলামের অবস্থান তার বিপরীতে। ইসলামে পুঁজিবাদ, সাম্যবাদের সমন্বয় ঘটেছে; উদার সামাজিক নীতিমালার সমাবেশ ঘটেছে, নিরবচ্ছিন্ন মানবতার সেবার প্রচেষ্টা রয়েছে, রয়েছে আন্তঃবর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থানের চমৎকার ঐতিহ্য। বিভিন্ন বর্ণ ও ঐতিহ্যের মধ্যে মীমাংসার অযোগ্য সমস্যাগুলোর পূর্ণ মীমাংসা করার ক্ষমতা ইসলামে রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত দুই বৃহৎ সমাজের মাঝে বিরোধিতার পরিবর্তে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের মধ্যস্থতা হবে অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং বিজ্ঞতার সাথে বলা যায় Neither east nor west Islam is the best.

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ধারণা
The concepts toward Islam of the western non-muslim intellectuals

ইসলামের অর্থ, প্রকৃতি, উপাদান বা মৌলভিত্তি নির্বিশেষে সামগ্রিক বিবেচনায় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্ প্রেরিত সকল নবী-রাসূল (স) স্ব-স্ব জাতির (গোত্রের) কাছে প্রচার করেছেন। কিন্তু এটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ আল কোরআনের মাধ্যমে। ইসলাম এসেছে পৌত্তলিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দিকভ্রান্ত সমাজের মানুষের হেদায়েতে তথা সরল সঠিক পথের দিশা দিতে যে পথে আছে মানুষের সঠিক পথে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সুযোগ এবং আল্লাহর নির্দেশিত বিধানাবলির আলোকে ব্যক্তিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশান্তি। আল কোরআনে ইসলামকে পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও আল্লাহর মনোনীত তথা পছন্দনীয় একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, ইসলামের উৎকর্ষের যুগে এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ব মানবের মধ্যে দুটি ধারণা বিদ্যমান। একটি ইতিবাচক (Positive sense) অপরটি নেতিবাচক (Nagetive sense)। রাসূল (স) যখন আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে আরব সমাজের পথভ্রান্ত মানুষকে এক আল্লাহর আনুগত্য করার আহবান জানালেন তখন বাধা আসল নানা স্তর থেকে। রাসূল তাঁর বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার ইত্যাদি ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনকেও ইসলামের জন্য তলোয়ার ধরতে হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে সাত শ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় দেড়শ কোটি মুসলমান। দু শতাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা সাতান্ন, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল একঅর্থে সেই অবস্থা এখনও বিরাজ করছে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা ধ্রুব সত্য যে ইসলাম সম্পর্কে একজন মুসলমান যতটুকু জানেন তার চেয়ে অধিক জানেন একজন অমুসলমান কিংবা সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিম। আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম নিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানরাই বেশি পরিমাণে গবেষণা করছে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার-বুঝার জন্য। কিন্তু খোদ মুসলমানদের মধ্যেই একশ্রেণীর লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছে। ইসলামকে বিকৃত করে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করছে। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের চেয়ে কত উন্নত ধারণা পোষণ করেন সে সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হল।

জর্জ বানার্ড শ' "The Genuine Islam" গ্রন্থে বলেন, "মোহাম্মদ (স) এর ধর্ম সম্পর্কে আমি সর্বদাই অতি উন্নত ধারণা পোষণ করি। কারণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এক অত্যাশ্চর্য জীবনীশক্তি। আমার ধারণা এটাই একমাত্র ধর্ম যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং যার রয়েছে সর্বময়ী যুগোপযোগী আবেদন। আমি তাঁর সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি-আশ্চর্য এক মানুষ এবং আমার মতে খ্রিস্টবিরোধী না হয়েও তাঁকে মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মত একজন

www.pathagar.com

একনায়ক যদি বর্তমান বিশ্বে আগমন করতেন, তবে তিনি সমস্যা-জর্জরিত এই বিশ্বের সকল সমস্যার এমন সমাধান করতে পারতেন যে, আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে সুখ ও শান্তি-তা প্রতিষ্ঠা পেত। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আজকের ইউরোপে 'মুহাম্মদের বিশ্বাস' যেভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে আগামী দিনের সমগ্র ইউরোপ তা গ্রহণ করবে।" (I have always held the religion of Muhammad (PBUH) in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of assistance which can make itself appeal to every age. I have studied for from being and antichrist, he must be that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring in the much needed peace and happiness. I have proposed about the faith of Muhammad (PBUH) that it would be acceptable to the Europe tomorrow it is beginning to be acceptable to the Europe of today.) তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা এই যে বর্তমানে ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্ম ইসলাম। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় শুধু পশ্চিম ইউরোপেই মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় আট মিলিয়ন। আবার সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকাতে ইসলামের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। বহু মসজিদ, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র-তথা মুসলিম সেন্টার তৈরি হচ্ছে। এ সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে ইসলামী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে তুলছে।

ইসলাম যে সর্বকালের সর্বজাতির জন্য কল্যাণময় জীবনাদর্শ সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনীষীরাই বেশি অবগত। যেমন-এইচ এ আর গিব মনে করেন, "পাশ্চাত্য বিশ্বের চরম বিরোধী মতবাদগুলোর মধ্যে ইসলাম এখনো ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। একদিকে যেমন ইউরোপিয় উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে তেমনি রাশিয়ানদের শোষণমূলক সাম্যবাদেরও বিরোধিতা করে। অর্থনীতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইসলাম তেমন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়নি যেমন চলছে আজকের দিনের ইউরোপ ও রাশিয়ায়।" (H.A.R. Gibb-Whither Islam p-379)

আবার ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর "Civilisation in Trial" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তার সারবস্তু হল ইসলামী চেতনা আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের দুটি প্রভাবশালী কুৎসিত উদায়ন গোষ্ঠী সচেতনতা ও অ্যালকোহল এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

অতি সম্প্রতি লন্ডনে মুসলিম সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম সেন্টার পরিদর্শনকালে প্রিন্স চার্লস মন্তব্য করেন, "ইসলামের শাশ্বত দিকগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে।" সেই সাথে তিনি উক্ত সেন্টারে গৃহীত পরিকল্পনার প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপিয়ানরা জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে। এখন বিশ্বের সর্বত্রই ইসলামের বিস্তার ঘটছে। ইসলাম এখন সর্বজাতির সর্বগোষ্ঠীর কাছে সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে যে ধর্মের যাবতীয় অনুশাসনের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সকল সভ্যতার উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। পরিশেষে আল কোরআনের বাণী উল্লেখ্য- "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করতে দেখবেন" (নছর-১,২)। আল কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সারা বিশ্বে সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। উদহারণস্বরূপ, এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ফ্রান্সে প্রতিদিন যে হারে অমুসলিমরা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী ৪০ বৎসরে ফ্রান্সে মুসলমানের সংখ্যা অমুসলমানের সমান হয়ে যাবে।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১। ইসলামের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা কর। ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
[Describe the meaning and explaing of Islam. What are the Characteristics of Islam.]

২। ইসলামের অর্থসহ এর মৌল ভিত্তিগুলো বর্ণনা কর।
[Describe the fundamental base of Islam with its meaning.]

৩। "ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
[Islam isn't a mere religion, it is a complete code of life," Explaing the statesment.]

৪। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ধারণা পর্যালোচনা কর।
[Review the concepts towards Islam of the western non-muslim intellectuals.]

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের মৌল ধারণা
Basic Concepts of Islam

❑ প্রাক-কথা, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সমাজ, সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয়তাবাদ/উম্মাহ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

প্রাক-কথা
Introduction

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তুর মধ্যে ইসলামের মৌলিক ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনায় যে প্রত্যয়গুলো বারংবার আসে সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া শ্রেয়। সামাজিক সুবিচার, মানবাধিকার, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, উম্মাহ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শান্তি, নিরাপত্তা, যুদ্ধ ও জিহাদ ইত্যাকার প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে বিশদভাবে এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত এই প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ ছাড়া ইসলামকে অপূর্ণাঙ্গই মনে হবে। প্রাচ্যের বা ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনা ক্ষেত্রও এই প্রত্যয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস
Tawheed/ Faith

[প্রাক-কথা, তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা, তাওহীদের প্রকারভেদ, তাওহীদের প্রমাণ, মুমিন মুসলমানের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা]

প্রাক-কথা
Introduction

তাওহীদ বা আল্লাহর 'একত্ববাদ' ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌল ভিত্তিস্বরূপ। ইসলামের মূলবাণী কালিমা তাইয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মুসলমানীত্ব গ্রহণ করে

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অন্তঃকরণে গ্রহণ করা ও তদানুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ঘোষিত এ অমোঘ বাণী তথা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। বিশ্বসৃষ্টি, এবাদত ও দাসত্বে এবং সেফাতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তায়ালাকে এক, একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া অপরিহার্য। কেননা ইসলামের মূলমন্ত্রই হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদের স্থান সব কিছুর অতি উর্ধ্বে। রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়াত, সেফাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে কোন প্রকার অংশীদার না করে বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক, পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা, মৃত্যুদাতা ও মরণোত্তর জীবনদাতা হিসেবে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করাই হল তাওহীদের মূলকথা। তাওহীদ হল ইসলামের প্রবেশদ্বার এবং চিরবিদায়ের মূলমন্ত্র। সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ তায়ালার উপর সুদিনে-দুর্দিনে, লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে সর্বাবস্থায় নির্ভর করা মুমিন বান্দার জন্য শ্রেয়। তাওহীদে বিশ্বাসী একজন মুমিন কখনো প্রচলিত বহুত্ববাদ, দ্বৈত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, নাস্তিক্যবাদ ও পৌত্তলিকতার মত জঘন্য মতাদর্শের সাথে কোন প্রকার আপস করে না। তাওহীদে বিশ্বাস মুমিনের জীবনে অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পরম প্রশান্তি আনয়ন করে। তাই সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মুসলিম জাতির সত্য, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য তাওহীদের শিক্ষা অনস্বীকার্য। তাওহীদ মুসলিম জাতির প্রাণশক্তি।

তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Tawheed

'তাওহীদ' আরবি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এটি মূল 'ওহিদুন' বা 'আহাদুন' শব্দ থেকে উৎসারিত যার অর্থ এক, একক, একত্ববাদ তথা কোন সত্ত্বাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করা। অর্থাৎ বিশ্ব স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালাকে তার সত্তায় (যাত), গুণাবলী (সেফাত) ও কর্মে (আফয়াল) এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা। পবিত্র কোরআনে তাওহীদের ঘোষণা সূরা এখলাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। "হে নবী আপনি বলুন, আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষীহীন।"

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালাকে ইবাদতের যোগ্য একক সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করাকে তাওহীদ বলে। আল্লাহ্ তায়ালা এমন এক সত্ত্বা যার লয়, ক্ষয় ধ্বংস কোনটিই নেই। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ তায়ালাকে মেনে নেয়ার নামই হল তাওহীদ।

আবার Encyclopedia of Islam-এ তাওহীদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "It is applied theologically to the oneness (wahdaniyah) of Allah in all its meaning."

সারকথা, বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ তায়ালা যিনি অপরিসীম প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক, জীবন ও মৃত্যুদাতা তিনি মানুষের চিন্তালোকের অতি উর্ধ্বে। তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি সকল জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের উৎস। এটাই তাওহীদের মর্মকথা।

www.pathagar.com

তাওহীদের প্রকারভেদ
Different Type of Tawheed

ইসলামের পঞ্চ মৌল বুনিয়াদের প্রথমটি হল তাওহীদ। এই তাওহীদ ইসলামী আকিদার মূল স্তম্ভ। ইসলামের ফকীহ মহল ও গবেষকবৃন্দ তাওহীদকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তুলে ধরেছেন এবং আল কোরআনের বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করেছেন। নিম্নে সেগুলো সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

প্রথমত, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ :

রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ অর্থ হল এ বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা যে মহান স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর রব বা প্রতিপালক, সকল কিছুর রক্ষক ও সকল প্রাণীর রিযিকদাতা। তিনি জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যু ঘটান। মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ সবই তাঁর পক্ষ থেকে আসে। বিপদ-আপদ, বিভিন্ন দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, ঝড়, দাবানল, রোগ-ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি থেকে নিরাপদ ও মুক্ত করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

এতদ্বিষয়ে সকল ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর হাতেই চরম সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত। আর এই সার্বভৌম ক্ষমতায় কারও কোন অংশীদারিত্ব নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কতিপয় ঘোষণা (আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন) "আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে রিযিক দান করেন তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন থেকে, কে তোমাদের শ্রবণ (কর্ণ) ও দর্শন (চক্ষু) ইন্দ্রিয়ের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন, এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? আর কে সব কিছু পরিচালনা করেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ! তাহলে আপনি বলুন, তারপরও তোমরা ভয় করছ না?" (ইউনুস – ৩১)। অর্থাৎ রুবুবিয়্যাত বলতে সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মেনে নেয়া। সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে কেবল তাঁরই কাছে পরিত্রাণের জন্য সাহায্য চাওয়া।

দ্বিতীয়ত, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ :

ইবাদতের তাওহীদ হচ্ছে প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় এককভাবে আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কোনরূপভাবে কাউকে অংশীদার না করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না। বিশ্ব চরাচরের সকল কিছুতে দাসত্ব ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাতদের মাধ্যমে তাঁর এককত্বের প্রমাণ দেয়া। মুসলমানের যাবতীয় ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে। কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের গুণে এবং সৃষ্টিরাজির প্রতি তাঁর অফুরন্ত করুণার গুণেই তিনি একমাত্র ইলাহ এবং উপাস্য হওয়ার যোগ্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি" (ফাতিহা-৫)।

"তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্ক তোমাদের প্রতিপালক গাফেল নয়।" (হুদ-১২৪)

www.pathagar.com

"তিনি আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সকল কিছুর পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাতে সুদৃঢ় থাকুন। আপনি কি তাঁর সমকক্ষ কাউকে জানেন? (মরিয়ম–৬৬)

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। সকল ঐশী গ্রন্থ এবং যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানুষদেরকে এ তাওহীদের দিকেই আহবান করেছেন। বিশেষকরে খাতামুন নাবিয়্যিইন বা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এ তাওহীদের বাণী বলিষ্ঠভাবে প্রচার করেছেন এবং বলেছেন তাওহীদই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়।

তৃতীয়ত, তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত বা নাম ও গুণাবলির তাওহীদ :

আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র নাম ও গুণাবলির প্রতি আকিদা বা বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব শক্তিমান এবং সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলিতে একক ও নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ সব গুণাবলিতে কেউ তার সমকক্ষ বা অংশীদার হতে পারে না। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তিনি অনন্য এবং অতুলনীয়। আল কোরআনে এবং রাসূলের হাদিসে আল্লাহ তায়ালার যে সব গুণাবলির উল্লেখ আছে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা প্রজ্ঞা, শক্তি-সামর্থ, চিরঞ্জীব প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত। আল্লাহ্ তায়ালার কোন গুণই একটি অপরটি থেকে ভিন্ন নয়, বরং একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাফিররা অজ্ঞতাবশত এ ধরনের তাওহীদকে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের (জাতির) মাঝে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত গত হয়েছে, আপনি তাদের ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করেছি। তথাপিও তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। আপনি বলুন, তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কারও উপাসনা নেই। আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন" (রা'দ – ৩০)। সুতরাং রহমান রহিম এরূপ বৈচিত্র্যময় গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন একান্তই অপরিহার্য।

অতএব উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য ও যুক্তি তাওহীদের অকাট্যতা প্রমাণ করে। তাই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন জগতেই মুক্তি বা পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

তাওহীদের প্রমাণ
Reasons of Tawheed

আল্লাহ তায়ালা এক, অদ্বিতীয়, অংশীদারহীন। তিনি রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও আসমা ওয়াসসিফাতে অনন্য। তিনি সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় কোন অংশীদার বা সমকক্ষ কেউ নেই, উপাস্যের ক্ষেত্রেও তাঁর সমমর্যাদায় কেউ নেই। আল্লাহর এই একত্ববাদের প্রমাণ তাঁর অপার সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে সহজেই পাওয়া যায়। আল কোরআন এবং রাসূলের হাদিসে

www.pathagar.com

একত্ববাদের অসংখ্য বর্ণনা এসেছে এবং অসংখ্য যৌক্তিক প্রমাণও রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হল।

১. উপাস্যে একত্ব : মানুষের সকল প্রকার আরাধনা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তিনি আরাধনার একমাত্রযোগ্য। যেমন–আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্যের যোগ্য নয়। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা কোনটিই তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর সিংহাসন সর্বত্র বিরাজমান। এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহৎ ও মহীয়ান।" (সূরা বাক্বারা – ২৫৪)

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্যমান সবই তাঁর একক সৃষ্টি। যা কিছু সৃষ্ট, ভবিষ্যতে সৃষ্টমান, তার একচ্ছত্র অধিকারী তিনিই। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একক স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। এক্ষেত্রে কারো কোন অংশীদারিত্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের একক সত্ত্বা সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একক সত্তা।" (কাহাফ – ১১০)

"হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো গর্ভে জন্মগ্রহণও করেননি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।" (এখলাস)

আবার আল্লাহ তায়ালা একটি নিকৃষ্ট প্রাণীর উপমা দিয়ে তার একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন এভাবে –

"হে লোক সমাজ! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না যদি তারা সকলে একত্রিতও হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাও উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী এবং যার প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।" (আলহজ্ব – ৭৩-৭৪)

"আল্লাহ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই, ফেরেশতাকুল এবং জ্ঞানীলোকেরাও সততার সাথে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশীল ও বিজ্ঞানী ব্যতীত আর কেউ-ই উপাস্য হতে পারে না।" (ইমরান-১৪)

২. প্রতিপালনে একত্ব : আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সৃষ্টিকুলের রব বা প্রভু তথা পালনকর্তা। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের প্রথম সূরায় ঘোষণা করেন, "আল্লাহ হচ্ছেন এ বিশ্বের রব বা পালনকর্তা।" তিনি সমস্ত সৃষ্টির যেমন স্রষ্টা তেমনি সকল কিছুর রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। আর তিনি এককভাবে সকল কিছুর মহাব্যবস্থাপক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক (জীবিকা) দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং জীবিত করবেন।" তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, "তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যে এগুলোর কোন একটিও করতে পারে?" (রুম – ৪০)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এ সকল আয়াত তথা নিদর্শনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও এক ও অদ্বিতীয়।

www.pathagar.com

৩. সার্বভৌম কর্তৃত্বে একত্ব : সার্বভৌমত্বের আধুনিক ধারণায় দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি হল সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ (Monism), অপরটি সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ (Pluralism). একত্ববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাহীন, অপ্রতিরোধ্য, সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক, চরম, নিরঙ্কুশ এবং স্থায়ী। (Sovereignty is the original, absolute, unlimited, universal, unrestrained power of the state)

এ ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এটাকে অন্যের হাতে হস্তান্তর করা যায় না। আর বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য নয়। এটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমভাবে প্রয়োগের অধিকারী।

কিন্তু ইসলামেও সার্বভৌমত্বের একত্ববাদের কথাই বলা হয়েছে। তবে সেই একত্ববাদী সর্বাভৌমত্ব কেবল মহান আল্লাহ তায়ালার। তিনি সমগ্র বিশ্বের একক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এ ক্ষমতায় কোন অংশীদার বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি প্রতিটি বিষয়ে চরম ক্ষমতাবান। আল্লাহ বলেন,

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অধীন।" (ইমরান – ৮৩)

তাঁর সৃষ্ট সব কিছুই তাঁর আনুগত্য করে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, " সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ"। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এরূপ একক ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান এবং এ আনুগত্যের মাধ্যমেই বিশ্বচরাচর চিরগতিশীল ও কর্মচঞ্চল রয়েছে।

৪. গুণবাচক নামে একত্ব : আল্লাহ তায়ালা আসমা ওয়াসসিফাত তথা গুণবাচক নামেও এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর নিজ সত্ত্বার জন্য যে সকল গুণবাচক পবিত্র নাম সাব্যস্ত করেছেন এবং নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) এর শানে যে বৈচিত্র্যময় গুণাবলির উল্লেখ করেছেন তাতেই তাঁর একত্ব সম্যকভাবে অনুমেয়। তিনি কোরআনে বলেন, "তাঁর মত কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।" সূরা ফাতিহার মধ্যে আছে " তিনি পরমদাতা ও দয়ালু এবং শেষ বিচার দিবসের মালিক।" "তোমাদের প্রভু আল্লাহ একক সত্ত্বা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।" "আল্লাহু, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" (ত্ব-হা – ৯৮, ৮)

আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত একাধিক উপাস্য থাকত তাহলে উভয়স্থানে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পুতপবিত্র।" (আম্বিয়া–২২)

বর্ণিত আয়াত দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের স্বভাবতগত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একান্তই যৌক্তিক। একই সাথে আয়াতটি দ্বারা বিশ্বচরাচরে একাধিক ইলাহ বা উপাস্যের অসারতাকেও খণ্ডন করা হয়েছে। একাধিক উপাস্যের ধারণা ভ্রান্ত, অসার ও অযৌক্তিক যার কোন জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। কারণ একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যের অস্তিত্ব থাকলে নিঃসন্দেহে এর

www.pathagar.com

পরিচালনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত এবং ধ্বংস অনিবার্যরূপে দেখা দিত। এমনকি একাধিক স্রষ্টা থাকলে কোন মৌলিক বস্তুর সৃষ্টি হত না। কেননা স্রষ্টা বা উপাস্য তারা নিজেরাই অস্তিত্ব ও গুণাবলির দিক দিয়ে অপূর্ণ থাকত এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা মতদ্বৈততা বিরাজ করত। উদাহরণস্বরূপ একজন সৃষ্টিকর্তা চাইবে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হোক, অপরজন চাইবে সূর্য পশ্চিমে উদিত হোক; একজন চাইবে বৃষ্টি, অপর জন খরা; একজন মৃত্যু, অপর জন জীবিত। সুতরাং একজন অপরজনের উপর পরস্পর বিরোধী নির্দেশের মাধমে সর্বময় কর্তৃত্ব করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্তা একজন এবং সর্বময় ক্ষমতা সেই একজনের হাতে ন্যস্ত বিধায় আদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত সূর্যের উদয়-অস্ত এক ও অভিন্ন নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। এগুলোর নিয়ন্ত্রক যদি একাধিক হত তাহলে অবশ্যই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত। আল্লাহ্ বলেন, "তাঁর সাথে কোন ইলাহ্ নেই। থাকলে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে এবং একজন আরেকজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।" (মুমিনুন – ৯১)

সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সকল কিছু এক নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে চলছে। অর্থাৎ প্রতিটি অণু-পরমাণু এক মহাপরিচালকের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণাধীন। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই তাওহীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রত্যাদেশভিত্তিক প্রমাণ

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হযরত জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে রাসূলদের প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন। ওহী আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রমাণ। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথের সন্ধানদানের জন্য যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব ও গুণাবলির উল্লেখের মাধ্যমে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। হযরত নুহ (আ), হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ) সহ প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাদের নিজ নিজ গোত্রে পথভ্রান্ত লোকদের যারা এক আল্লাহকে ছেড়ে একাধিক জীবজন্তু ও জড়বস্তু, দেব-দেবীর পূজা করত তাদের উদ্দেশ্যে একটি অতি ছোট্টবাক্যই প্রচার করেছেন। আর সেটি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন –

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ আদেশ দান করে যে তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাক।" (আন নাহল-৩৬)

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স) কে উদ্দেশ্য করে বলছেন "আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁকে এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে আমি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত করুন।" (আম্বিয়া – ২৫)

সারকথা তাওহীদ হল একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার প্রথম ও শেষ আদেশ। আর নবী-রাসূলগণেরও দাওয়াতের প্রথম বিষয়। তাই 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই' একথার স্বীকারোক্তি একজন মুমিন মুসলমানের জীবনে ওয়াজিব। যারা তাওহীদের এ

www.pathagar.com

মর্মবাণী প্রত্যাখ্যান করবে তারা কাফির আর যারা আল্লাহর একত্ববাদে কাউকে অংশীস্থাপন করবে তারা মুশরিক হিসেবে পরিচিত। সেই সাথে যারা মুখে তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে বাস্তবে অন্যরূপ আচরণ করে তা মুনাফিক হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনে যেমন রয়েছে লাঞ্ছনা, অপমানজনক আচরণ তেমনি পারলৌকিক অনন্ত জীবনে রয়েছে সীমাহীন অবর্ণনীয় কঠিন শাস্তির অনিবার্য ব্যবস্থা। বিপরীতে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তদানুযায়ী আমলকারীর জন্য দুনিয়াতে রয়েছে মহান সম্মান এবং পরকালে রয়েছে মহা পুরস্কার।

মুমিন মুসলমানের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা/ উপকারিতা

ইসলামের প্রথম মৌল স্তম্ভ তাওহীদের বাণী কালিমা তাইয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" – অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ তথা উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই এই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন এবং তদানুযায়ী কার্য সম্পাদন করা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। ইসলামকে কুফর থেকে পৃথক করেছে এই তাওহীদ। তাওহীদের আলোকেই একজন মুমিনের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সেই সাথে তাওহীদ বিশ্ব চরাচরের আত্মাস্বরূপ। আর একমাত্র তাওহীদের শক্তিতেই টিকে আছে বিশ্ব চরাচর। তাই মুমিনের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নিম্নে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হল।

প্রথমত, মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত : কোন মানুষকে মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে কতিপয় মৌল ভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন প্রথম এবং প্রধান কাজ। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম ইসলামের মূল বাণী প্রচার করেন, "লা ইলাহা --- রাসূলুল্লাহ।" সুতরাং একত্ববাদের এই দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয়ের প্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ মুমিনের জন্য খুবই জরুরি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি : তাওহীদ হল ইসলামের মৌল ভিত্তি। সর্বান্তকরণে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত ইসলামের অস্তিত্বই অর্থহীন। আল্লাহ তায়ালাকে সর্বক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে কায়মনোবাক্যে মেনে না নিলে ইসলামী শরীয়াতের অপরাপর আনুষ্ঠানিকতার কোনই মূল্য থাকে না। এই দৃষ্টিকোণে তাওহীদ ইসলামের মৌল ভিত্তি।

তৃতীয়ত, রিসালাতের ভিত্তি : আল্লাহ তায়ালা চিরসত্য, সুন্দর, শান্তিময় ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের প্রচারের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এই প্রেরিত দূতগণ তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের সাথে তাঁদের নামও প্রচার করেছেন। যেমন – হযরত মুহাম্মদ (স) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তদ্রুপ মুসা (আ), ঈসা (আ) প্রমুখ নবী আল্লাহর একত্ববাদের বাণীর সাথে নিজেদের নাম জুড়ে দিয়েছেন।

চতুর্থত, ঈমানকে সুদৃঢ় করে : একজন মুমিন মুসলমানের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব বা উপকারিতা হল এটা তাঁর ঈমানী শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

www.pathagar.com

করার ক্ষেত্রে তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ফলে তাঁর প্রতি শয়তানী ওয়াসওয়াসা বা কুপ্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এতে করে সে সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থেকে শক্তিশালী ঈমান নিয়ে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

পঞ্চমত, আল্লাহর নৈকট্য লাভ : একজন বান্দাকে মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে যেমন তাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, তেমনি আল্লাহর বিশ্বাসীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ। আল্লাহ্ তায়ালা যেমন তাঁর সাথে কোন প্রকার অংশীদার করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তেমনি যারা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে তিনি খুব ভালবাসেন। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম ও স্থায়ী পুরস্কার চিরশান্তিময় জান্নাত।

ষষ্ঠত, সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ্ দান : মুসলমানের জীবনে তাওহীদের আরেকটি উপকারিতা হল এটা তাঁর জন্য সৎ কাজ করার পথকে সুগম করে দেয়, খোদাভীতি জাগ্রত করে এবং অন্যায় অসৎ কাজ পরিহারে সহায়তা করে। সুতরাং সে বেশি বেশি নেক কাজ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সপ্তমত, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব : ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নানা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হল তাওহীদ। তাওহীদের শক্তিতে বলীয়ান এবং পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী বান্দা সকল প্রকার দুঃখ-যাতনা, বিপদ-আপদ উদার চিত্তে গ্রহণ করে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য একমাত্র আল্লাহর তায়ালার সাহায্য কামনা করে। তাওহীদ বিপদাপদে মুমিনের মনে শান্তি যোগায়।

অষ্টমত, পরাধীনতা থেকে মুক্তি : মানব জীবনে তাওহীদের বিশেষ উপকারিতা হল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীগণ অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে। মাখলুকের দাসত্ব বা মাখলুকের সাথে অসৎ সম্পর্ক স্থাপন কিংবা তার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কাজ করা ইত্যাদি থেকে দূরে রাখে। বস্তুত একমাত্র আল্লাহর একত্বে নিমগ্ন থেকে তাঁরই প্রকৃত গোলামে পরিণত হওয়াই মুমিন বান্দার একমাত্র লক্ষ্য।

নবমত, জান্নাত লাভের উপায় : তাওহীদ বান্দাকে জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তির হাত থেকে বাঁচায় এবং চিরশান্তিময় জান্নাতে পৌছে দেয়। তাওহীদের অনুসারী প্রত্যেক বান্দাই জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় দিনাতিপাত করবে এটা অমোঘ সত্য। সুতরাং যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর বিধি-বিধানের আলোকে রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে তাদের জন্য সেই আরামদায়ক জান্নাত অপেক্ষা করছে।

দশমত, আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে : যখন কোন বান্দা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে তখন সে তাঁর আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কারণ সে তখন এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে মস্তক অবনত করে না। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সর্বময় ক্ষমতাধর এবং সর্বদাতা হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। এক্ষেত্রে অন্য কাউকে ভয় করা বা কারো কাছে নত হওয়া কিংবা কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

একাদশ, ঐক্য-সংহতি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চাবিকাঠি : মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে সকল মুসলমান এক সারিতে এসে আল্লাহর নবী (স) এর বাণী

www.pathagar.com

'প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই' নীতিতে বিশ্বাসী। তাই সমগ্র বিশ্বের মুসলমান একে অপরের দ্বীনি ভাইস্বরূপ। বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মুসলমানের দুঃখ কষ্টে সকল মানুষ একযোগে সমবেদনা, সহমর্মিতা প্রকাশ করে কোনরূপ রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই। একমাত্র তাওহীদের মর্মবাণী সকল মানুষের মাঝে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরের বিশদ, বিস্তৃত, সারবান আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, তাওহীদ এমন একটি শক্তি যার বলে সকল অনৈক্য দূরীভূত হয়ে মানুষের মাঝে সুন্দর-সুশৃঙ্খল মনোভাব গড়ে তোলে, সদ্‌ভাব জাগ্রত করে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে, মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। একজন মানুষকে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তোলার একমাত্র উপায় তাওহীদ। তাওহীদে বিশ্বাস একজন মুমিনের জীবনে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সহজতর হয়, সংকট, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়। তাই মানব জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কিংবা উপকারিতা অপরিসীম।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. তাওহীদের সংজ্ঞা দাও। তাওহীদের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[Define Tawheed. Discuss the classification of Tawheed.]

২. তাওহীদ বলতে কি বুঝায়? তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা কর।
[What is meant by Tawheed? Discuss the different period of Tawheed.]

৩. তাওহীদের সংজ্ঞা দাও। মুসলমানদের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
[Define Tawheed. Discuss its importance and necessity in Muslim life.]

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব
Sovereignty

[প্রাক-কথা, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, ইসলামী দৃষ্টি কোণে সার্বভৌমত্ব]

প্রাক-কথা
Introduction

"সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য" (আন আ'ম-৫৭), 'সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নয়।" (ইউসুফ-৪০)

ইসলামের মৌল ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ হল সার্বভৌম প্রভূত্ব সংক্রান্ত ধারণা। এটা ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন (Islamic State and Administration) পরিচালনার মৌল ভিত্তি। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মৌল প্রশ্ন সার্বভৌম কর্তৃত্ব কার? ইসলাম Sovereign Power এর অর্থ, প্রকৃতি, অবস্থান ও প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে যা পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল্ কোরআন ও বিশ্ব নবীর হাদিসে বিশদভাবে বিধৃত রয়েছে; সেই সাথে নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার Islamic Democratic State এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন কাঠামোয় প্রত্যক্ষ করা যায়।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ তথা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হল এটা রাষ্ট্রের সর্বময়, সর্বোচ্চ, চূড়ান্ত, নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন ক্ষমতা (Absolute, Unlimited Power of the State)। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার দিক পালগণ সার্বভৌম ক্ষমতাকে একটি পরিপূর্ণ ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রের মস্তিষ্ক/হৃদযন্ত্রের সাথে তুলনীয়। সার্বভৌমত্বের অর্থ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতামত প্রত্যক্ষ করা যায়। W.W. Willoughby বলেন, "Sovereignty is the supreme will of the State". আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Burgess এর মতে, "Sovereignty is original, absolute, unlimited power over individual subject and over all association. ফরাসি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ Duguit বলেন, "The Commanding power of the state, the right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state". তবে সাধারণ দৃষ্টিকোণে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে দুটি ভিন্নধর্মী মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হল : Monistic Concepts যারা মনে করেন সার্বভৌমত্ব একক, অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য, অপ্রতিরোধ্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাহীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। অপরটি হল Pluralistic Concepts তাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য নয়, বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ এটা বহুধাবিভক্ত।

www.pathagar.com

ইসলামী দৃষ্টিকোণে সার্বভৌমত্ব
Sovereignty in Islam

ইসলামী দৃষ্টিকোণে ইসলামী রাষ্ট্র (Islamic State) গঠনের অপরাপর উপাদান তথা ভূখণ্ড (Territory), জনসমষ্টি (Population), সরকারের (Government) ন্যায় সার্বভৌমত্বও অপরিহার্য উপাদান। এখানে সার্বভৌম প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। তাঁর উচ্চতর প্রভূত্ব, একাধিপত্য, একচ্ছত্রাধিকার, নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা এসব দিক বিচারে অখণ্ড, সীমাহীন, অবিভাজ্য সর্বোপরি অংশীহীন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, 'কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর"।

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক শাসক কিংবা জনগণ নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষত প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative Government) ব্যবস্থায় জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হলেও বস্তুত সরকার রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার চর্চা করে থাকে। আর ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। এই ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা, আধিপত্য, সংবিধান প্রণয়নের একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার বিধান প্রদান একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট। মানুষ আল্লাহর প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী তা পরিচালনা করবে। মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস কোরআন। যেমন – আল্লাহর বাণী – "সতর্ক হও, তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে" – (আরাফ : ৫৪)। মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থিত সব কিছুরই একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং সকলের চূড়ান্ত গন্তব্য তার কাছেই।

এরূপ আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুসা (আ) লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশিত Islamic Democratic State প্রতিষ্ঠার মানসে প্রিয় জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নির্ভর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তুমি কি জান না যে আসমান ও জমীনের রাজত্ব আল্লাহর?" (সিজদা – ৫)। অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং তাঁরই রাজত্ব ও প্রভূত্ব বিদ্যমান। এই রাজত্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালনাও তাঁর হাতে। আল্লাহ বলেন, "সকল বরকত মহিমা সেই মহান সত্ত্বার। রাজত্ব তাঁর হাতের মুঠোয়, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান" (মূলক–১)। অর্থাৎ আল্লাহ কেবল বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের অধিকারীই নয়, বরং তাঁর সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিশ্বাসগত সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত।

ইসলামে রাষ্ট্রকে সামাজিক চুক্তির (Social contract) ফল হিসেবে দেখা হয় না। বরং মানুষ ও তাঁর স্রষ্টার মধ্যকার চুক্তির ফলে রাষ্ট্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই এরূপ রাষ্ট্রে সার্বভৌম কেবল এবং শুধু এক অদ্বিতীয় আল্লাহ। এরূপ সার্বভৌমত্ব একক, চিরস্থায়ী, অংশীদারহীন, সর্বব্যাপক। আল্লাহর কতিপয় ঘোষণা – "আল্লাহ তায়ালা কেবল তোমাদের স্রষ্টা, অধিকর্তা, রিযিকদাতা ও প্রতিপালকই নন, বরং তিনি তোমাদের শাসক ও বিধানদাতাও।" তাঁর ক্ষমতা

www.pathagar.com

ও সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই। এই মর্মে আল্লাহর ঘোষণা – "রাজত্বের ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি তাঁর রাজ্য শাসনে কাউকে অংশীদার করেন না।" (বনী ইসরাইল-১১১, বাহাক-২৬)। তাঁর সর্বময় শাসন কর্তৃত্বের কোন সীমা নেই। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, পৃথিবীর বর্হিভাগে অবস্থিত সর্বস্থানে চরম কর্তৃত্বের অধিকারী।

অর্থাৎ বিশ্বলয়ে প্রতিটি বস্তু কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার একচ্ছত্র প্রভূত্বের অধীন এবং এর অনুগত হয়ে আছে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর যিনি সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনে, কল্যাণে ও উপকারের জন্য। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, যার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব রয়েছে সকলের উপর সর্বক্ষেত্রে এবং মানুষ যাকে তিনি আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন শুধু তারই আনুগত্য করার ,মাথা নত করবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন-ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বস্তুগত, জ্ঞানগত ও আধুনিক ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধি বিধান মান্য করে চলবে। কোরআন মজিদে বহু সংখ্যক আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে। যেমন-সূরা আল আনামে বলা হয়েছে "চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার – সার্বভৌমত্বের অধিকার অন্য কারোরই নেই – আছে শুধু আল্লাহর। তিনিই পরম সত্য কথা বলেন আর তিনিই হচ্ছে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" একই সূরায় বলা হয়েছে "তোমরা জেনে রাখবে সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লারই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি রয়েছে যখন মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চলে। আল্লাহ মানুষকে তারই প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এমন কিছু গুণাবলী দিয়ে যা অন্য কোন সৃষ্টিজীবকে দান করেন নি যার জন্য মানুষকে বলা হয়েছে 'আশরাফুল মাখলুকাত'।

বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বলা হয় জনগণ সকল ক্ষমতার অধিকারী। যখন যে দল জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে সে সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যতদিনের জন্য নির্বাচিত ততদিন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্ট যে মানুষ কখনই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। মানুষ আল্লাহ ও জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং তা কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সেখানেই যখন সরকার আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেন এবং যখন কোন প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হয় তা তারা করে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. সার্বভৌমত্ব কি? সার্বভৌমত্বের প্রচলিত ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is Sovereignty? Explain the traditional concept of Sovereignty.]

২. সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায়? ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is meant by Sovereignty? Explain the concept of Sovereignty as Islamic Conditions.]

www.pathagar.com

স্বাধীনতা
Freedom / Liberty

[প্রাক-কথা, স্বাধীনতার অর্থ ও সংজ্ঞা, স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার স্বরূপ]

প্রাক-কথা
Introduction

ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম মন্ত্রদাতা, স্বাধীনতার অমোঘবাণীর উদগাতা সুইস দার্শনিক Jean Jacques Rousseau তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "The Social Contract" এর প্রারম্ভে লিখেছেন, Man is born free but everywhere he is in chains. One thinks himself the master of others and still remains a greater slave then they." আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস হল স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ইতিহাস। কেননা স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী – এই ত্রিবিধ রাজনৈতিক ধারণা (Political Concept) মানুষের মনে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্য ও স্বাধীনতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ফরাসি চিন্তাবিদ এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম প্রবক্তা Montesquieu এর মতে, স্বাধীনতার মত অপর কোন ধারণা বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ নয় এবং মানব মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। স্বাধীনতা হল মানুষের মৌল রাজনৈতিক অধিকার। তবে যা খুশী তা করার নাম স্বাধীনতা নয়; বরং নিয়ন্ত্রিতভাবে অধিকার উপভোগ করার নামই স্বাধীনতা। ইসলামে স্বাধীনতার একটি ভিন্ন অর্থ আছে, কারণ এর সাথে স্রষ্টার নির্দেশনা বিদ্যমান। অর্থাৎ স্বাধীনতা অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে সম্পদ ভোগ ও উপভোগের অধিকারকে নির্দেশ করে। এতে রয়েছে দেশের আইন বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা। প্রকৃত পক্ষে এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ আল্লাহ মানুষকে সে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যা তার জন্য উপযোগী ও প্রয়োজন।

স্বাধীনতার অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Liberty

ইংরেজি Liberty শব্দটি Latin word 'liber' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, যার অর্থ 'free' বা মুক্ত। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় স্ব-অধীনতা, নিজের অধীনতা বা সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত অবস্থায় যা খুশি তাই করা। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বা আধুনিক সভ্যসমাজে স্বাধীনতার একটি বিশেষ অর্থ আছে। স্বাধীনতা বলতে যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অধিকারকে নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ যদিও দুরূহ, তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রয়াস থেমে নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। যেমন -

(i) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **Seeley** বলেন, "অতিশাসনের বিপরীত ব্যবস্থাই হল স্বাধীনতা।" (Liberty is the opposite of over government.)

(ii) **Prof. H. J. Laski** -র মতে, "By liberty I mean the eager maintenance of the atmosphere in which mean have the opportunity to be their best self." (যে অনুকূল পরিবেশে মানুষ তার জীবনের চরম ও পরম বিকাশ সাধনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে তার সাগ্রহ সংরক্ষণকে আমি স্বাধীনতা বলি।)

(iii) **Herbert Spencer** বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বুঝায়। যদি উক্ত কাজের দ্বারা অপরের অনুরূপ কাজ করার অধিকার বিনষ্ট না হয়।"

(iv) **John Stuart Mill** বলেন, "Over himself, his own body and mind individual is sovereign." (ব্যক্তি তার নিজের উপর, নিজের মন ও দেহের উপর সম্পূর্ণ সার্বভৌম।)

(v) **Gettell** বলেন, "Liberty is the opposite power of doing and enjoying those things which are worthy of enjoyment and work."

(vi) **T. H. Green** -এর মতে, "Freedom consists in positive power of capacity of doing or enjoying something worth doing or worth-enjoying." (মানুষের জীবন ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাই হল স্বাধীনতা।)

উপরে নির্দেশিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রিত অধিকার। সকলকে সকলের রক্ষার অধিকারের মধ্যে স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহিত। **Prof. E. Barker** বলেন, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।"

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ
Types of Liberty

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ছয় প্রকার স্বাধীনতার উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে সবিস্তারে তুলে ধরা হল :

এক, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) : সামাজিক চুক্তিবাদী দার্শনিকত্রয় হবস, লক এবং রুশো বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রপূর্বাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) মানুষেরা কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা বা স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু স্বাধীনতার এহেন ধারণা অলীক, অসার ও অবাস্তব বলেই প্রতিপন্ন হয়। কারণ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন রাষ্ট্র এবং আইনের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে **John Locke** বলেন, "Where there is no law, there is no freedom." (যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।)

www.pathagar.com

দুই, সামাজিক স্বাধীনতা (Civil Liberty) : সামাজিক স্বাধীনতা বলতে অনেকেই Rule of Law- কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ সমাজের সুসভ্য হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন অনুভব করে সেগুলোকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে। যেমন - জীবন রক্ষার স্বাধীনতা, সম্পত্তি রক্ষার স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার স্বাধীনতা, অবাধে চলাফেরা করার স্বাধীনতা। বস্তুত, সামাজিক ধারণা থেকে সামাজিক স্বাধীনতা উদ্ভূত এবং এ স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করতে হয় যাতে অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়।

তিন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) : রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বুঝায় "Liberty of citizens participate in the political life and affairs of the state." রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাস্কিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। আবার **Prof. Leacock** -এর মতে, Political liberty as "Constitutional liberty." গিলক্রিস্টসহ অনেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের সমার্থবোধক বলে উল্লেখ করেছেন। ভোটাধিকার, সরকারের সমালোচনা করা, সরকারি চাকরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

চার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Personal Liberty) : ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হল সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির এমন স্বাধীনতা যেগুলো ব্যক্তির একান্তই নিজের, যার প্রতি অন্য কেউ কোনরূপ interfere করতে পারে না। যেমন - খাদ্য, বস্ত্র, উন্নত জীবন যাপন, বিবাহ, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ইত্যাদি এ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

পাঁচ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) : অর্থনৈতিক কার্যাদির ব্যাপারে জনগণের স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বুঝানো হয়। **H.J. Laski** তাঁর 'A Grammar of Politics' গ্রন্থে বলেন, "By economic liberty, I mean, security and the opportunity to find reasonable significance in the earning of one's daily bread,.......against the wants tomorrow.

ছয়, জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) : বৈদেশিক অধীনতা থেকে মুক্তিকে জাতীয় স্বাধীনতা বুঝায়। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশ যখন অন্য কোন দেশের পরাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারে তখনই সে জাতি বা রাষ্ট্রকে স্বাধীন বলা যায়।

তবে এসব স্বাধীনতা উপভোগের জন্য অবশ্যই অনুকূল পরিবেশ দরকার। সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা, ভয়, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস ইত্যাদি থাকে তাহলে কোন স্বাধীনতাই অর্থবহ হয় না।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ
Safeguards of Liberty

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, স্বাধীনতা ভোগ করার চেয়ে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা কঠিন কাজ। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এর স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভবপর হয়

www.pathagar.com

না। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা রক্ষার কতকগুলো রক্ষাকবচের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ -

লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার (Written Fundamental Rights) : স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধকরণ। কারণ মৌলিক অধিকার উপভোগের সুযোগ ব্যতীত নাগরিক জীবন পূর্ণতা পায় না। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হলে নাগরিকেরা তদসম্পর্কে সচেতন থাকে। মৌলিক অধিকার ভঙ্গের কারণে ভিকটিম সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে।

গণতন্ত্র (Democracy) : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার উপভোগের সর্বাধিক সুযোগ থাকে। গণতন্ত্র বলতে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের পক্ষে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের চেষ্টা করা হয়। গণতন্ত্রের মূল স্লোগান "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।" শাসকগোষ্ঠী জনগণের ভোটাধিকার লাভ করে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এরূপ সরকার সাধারণত জনস্বার্থবিরোধী কোন কাজ করে না। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্ভাব্য জনমত যাচাই করা হয়। এতে জনমতের (Public opinion) প্রতিফলন ঘটে।

আইনের শাসন (Rule of Law) : আইনের শাসন স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। আইনের শাসনের অর্থ মূলত (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, (খ) বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা চলবে না এবং (গ) বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না এবং আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য। আইনের শাসন বলতে আইনের পরিপূর্ণ প্রাধান্যকেই নির্দেশ করে— যেখানে শাসকমহল আইনের উর্ধ্বে উঠে কোন কিছু করতে পারে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অতি নগণ্য ব্যক্তিটিও একই আইনের অধীন।

আইন (Law) : আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত (Law is the pre-condition of liberty)। আইনের উপস্থিতিতেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয়। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **John Locke** বলেন, "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না" (Where there is no law there is no liberty)। আইনের যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা উপভোগ অর্থবহ হয়ে উঠে। **Willoughby** বলেন, "নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়।" মূলত আইনের সঠিক প্রয়োগে নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা পায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা মন্টেস্কু বলেন, "অধিকার ভঙ্গের কারণে আইন কতটুকু শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে তার উপর স্বাধীনতার সংরক্ষণ নির্ভর করে।"

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Powers) : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জনক **Montesquieu** ও আদর্শবাদী **Madision** প্রমুখের মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বাধীনতা সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এ নীতির মূলকথা হল সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। এক

www.pathagar.com

বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ করবে না বা প্রভাব বিস্তার করবে না। কারণ একই ব্যক্তির হাতে একাধিক বিভাগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে স্বৈরশাসনের সৃষ্টি হয়।

সদাসতর্ক জনমত (Eternal Public Vigilance) : আধুনিককালে স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হল সদাসতর্ক জনমত। **Prof. H. J. Laski** বলেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল।" (Eternal vigilance is the price of liberty.) নাগরিকদের উচিত স্বাধীনতা বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। এ প্রসঙ্গে **হেনরি নেভিনশন** যথার্থই বলেন, "স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন দিন শেষ হয় না কিংবা এর সংগ্রামক্ষেত্র কোন দিন নীরব হয় না।"

স্বাধীন বিচার বিভাগ (Independent Judiciary) : স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ। ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। কারণ বিচার বিভাগ স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ থাকলে কোন নাগরিকের অধিকার ভঙ্গ হলে সর্বোচ্চ আদালত তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অধিকতর ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা (Responsible Government) : স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণের সরকারকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। সরকারের দায়িত্বশীলতা দু'ভাবে নিশ্চিত করা যায়। এক. জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত আইনসভা জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকবে। দুই. নির্বাচিত আইনসভার সদস্য নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য আইনসভার কাছে এবং শেষত জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এরূপ দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা থাকলে নাগরিকের স্বাধীনতা অধিকতর রক্ষা পাবে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power) : স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। কারণ একটিমাত্র কেন্দ্রের হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে একদিকে শাসনব্যবস্থায় স্থবিরতা আসে, অন্যদিকে শাসক স্বৈরাচারিতার পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। এজন্য তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতার অবাধ প্রবাহ প্রয়োজন।

সরকার ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা (Co-operation between Government and People) : সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচ্য। কারণ বিরোধিতা শুধু ধ্বংস ডেকে আনে। আর বিপরীতে মধুর সম্পর্ক সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এজন্য সরকার যদি জনগণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং জনগণ যদি সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল হয় তাহলে স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

গণভোট (Referrendum) : গণতান্ত্রিক বিশেষত প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গণভোট। আইনসভায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে জনমত যাচাই করার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করা আবশ্যক (Must be referred to the people)। এতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে বিতর্কের অবসান ঘটে এবং জনমতেরও প্রতিফলন ঘটে। সুইজারল্যান্ডে এরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

গণউদ্যোগ (Initiative) : গণভোট অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল গণউদ্যোগ। কেননা, গণভোটে আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত আইন গ্রহণ কিংবা বর্জনের সুযোগ জনগণ পায়। কিন্তু গণউদ্যোগ ব্যবস্থায় জনগণ সরাসরি আইন প্রণয়ন কিংবা সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখনও কখনও জনগণ নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া তৈরি করে আইনসভায় প্রেরণ করে। আইনসভা এরূপ খসড়া বিলের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই শেষে পাসের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণের স্বাধীন মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

পদচ্যুতি (Recall) : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণ করার সুযোগ পায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি জনগণের আস্থা হারায় বা জনগণ প্রতিনিধির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় কিংবা প্রতিনিধিরা যদি নির্বাচনপূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাহলে জনগণের একাংশ তাদের অপসারণের অভিযোগ আনলে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটারের সমর্থন নিয়ে প্রতিনিধিদের অপসারণ করা যায়।

বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপ : অনেক সময় রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারের যোগসাজশে বিশেষ মহলের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এতে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরূপ সুযোগ-সুবিধা বিলোপ করতে হবে।

উপরের বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদিও স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার তথাপি স্বাধীনতা বিনাশ্রমে উপভোগ করা যায় না। স্বাধীনতার স্বাদ পরিপূর্ণরূপে পেতে হলে উপর্যুক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ আবশ্যক। অন্যথায় স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা
Liberty in Islam

মানুষ স্বাধীনচেতা জীব হলেও মানুষকে নিরঙ্কুশভাবে মুক্ত বলা চলে না। কারণ এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং বিপর্যয় ঘটবে, সেই সাথে মানব স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হবে। মানবিকতার বিকাশ ও অন্যের অনুরূপ বিকাশের পথ সুগমকরণের মধ্যদিয়ে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত সীমারেখা ও বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে অধিকার উপভোগ ও সম্পদের ব্যবহারই স্বাধীনতা। ইসলাম মানুষকে যৌক্তিক তথা যথার্থ স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতার এই শিক্ষা সযত্নে লালনের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের অনুরূপ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলাম কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার যথেচ্ছাচার বা বাড়াবাড়িকে বরদাস্ত করে না। হাদীসে আছে, প্রতিটি মানব শিশুই 'ফিতরাত' এর উপর জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে নির্ভেজাল প্রকৃতির উপর প্রতিটি শিশুর জন্ম হয়। পরাধীনতা, বংশগত পাপাচার কিংবা মৌলিক বাধা-বিপত্তি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এভাবে সে যতক্ষণ না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, ততক্ষণ তার স্বাধীনতার অধিকার যৌক্তিক, পবিত্র ও অলঙ্ঘণীয়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার আরবি শব্দ 'ইসতিকলাল'। আবার হুররীয়াত অর্থও স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ইসলামী প্রেক্ষিত হল ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তদানুযায়ী কাজ করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের অধিকার লাভ করা।

তবে ইসলামে প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর আনুগত্য করা ঈমানী আকিদার অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতা মানে নিজের ইচ্ছা ও বিবেকের বশবর্তী হয়ে যা খুশী তাই করাকে বুঝায় না। বরং ইসলামে স্বাধীনতার উপভোগ আল্লাহ প্রদত্ত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামে স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত কথা হল সকল মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে প্রভু গোলাম সম্পর্কের কোন সুযোগ নেই। এখানে সকল মানুষ কেবল আল্লাহর গোলাম। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত বিধানের আলোকে চলার পথে কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নেই। জীবন, সম্পত্তি, মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না। থাকবে না মানুষের মৌলিক অধিকার ভঙ্গের কোন হুমকি বা অনিশ্চয়তা। কিংবা স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব অপর রাষ্ট্রের অপশক্তি প্রয়োগে হুমকির সম্মুখীন হবে না।

এরূপ স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও উপভোগ করে তোলার জন্য মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন "ইসলামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের মনকে কুসংস্কার ও অনিশ্চয়তা থেকে, তার আত্মাকে পাপাচার ও দুর্নীতি থেকে, তার বিবেককে নিপীড়ন ও ভয় থেকে, এমনকি তার দেহকে বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতনের কবল থেকে মুক্ত করা। এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ইসলাম মানুষের জন্য যে কর্মধারা নির্দেশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন, নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পালন, নৈতিক বিধিমালার বাধ্যবাধকতা এমনকি পানাহারের বিধি-নিষেধ পর্যন্ত। মানুষ যখন এই কর্মধারা ধর্মীয় দৃষ্টিতে অবলম্বন করে, তখন সে কিছুতেই স্বাধীনতা ও মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না করে পারে না।" (ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান – ৪৯)

ধর্মবিশ্বাস, ইবাদত ও বিবেকের স্বাধীনতার উপর ইসলাম অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। প্রতিটি মানুষ তার বিশ্বাস, ইবাদত ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রয়োগের অধিকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন – "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই।" (বাক্বারা – ২৫৬)

অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির সদিচ্ছার ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু আল্লাহর সত্যকে গ্রহণ ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে মানুষের পছন্দের (Choice) উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রভুর কাছ থেকে সত্য সমাগত। অতঃপর যার ইচ্ছা তা বিশ্বাস করতে পারে এবং যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করতে পারে।"

ইসলামে স্বাধীনতার মূলনীতি/ ভিত্তি : ইসলামে স্বাধীনতা ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং আল্লাহর কাছ থেকে আগত একটি পবিত্র নির্দেশ। এ স্বাধীনতা কয়েকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা –

(১) প্রত্যেক মানুষের বিবেক কেবল আল্লাহর অধীন। এক্ষেত্রে স্ব-অধীনতার কোন অবকাশ নেই। কেননা মানুষ সরাসরি তাঁর স্রষ্টার কাছে দায়ী। কোরআন এবং সুন্নাহর

www.pathagar.com

অসংখ্য বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মানুষকে তার দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসবাদ করা হবে।

(২) প্রত্যেক মানুষই তাঁর কর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী – এবং কর্মের প্রতিফল সে একাই ভোগের অধিকারী। আল্লাহ বলেন – "কেউ অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।" (যিলযাল – ৭, ৮)

(৩) নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ মানুষের কাছেই অর্পণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে অন্যের মুখাপেক্ষী করা হয়নি।

(৪) মানুষকে সঠিক নির্ভুল ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি প্রদান করা হয়েছে। এটাই হল ইসলামে স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণার মূলভিত্তি।

বস্তুত ইসলামে স্বাধীনতা একটি আধ্যাত্মিক সুবিধা, একটি নৈতিক অধিকার, সর্বোপরি একটি ধর্মীয় পবিত্র দায়িত্ব।

স্বাধীনতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র দার্শনিকদের সাথে প্রাচ্যের তথা ইসলামী রাষ্ট্র দার্শনিকদের মৌল বিরোধ হল পূর্বোক্তরা স্বাধীনতার প্রশ্নে মানবিক আইনের ছত্রছায়ায় ব্যক্তিত্বের বিকাশের সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকে অপসারণ করে অনুকূল পরিবেশ তৈরির উপর জোর দিয়ে একে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। আর পরবর্তীরা স্বাধীনতার প্রশ্নে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত সীমারেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে স্বাধীনতাকে একটি জন্মগত পবিত্র অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে এর উপভোগকে সহজ করে তোলার কথা বলেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার স্বরূপ

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার স্বরূপকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা : সকল মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ইসলামে পূর্ণভাবে স্বীকৃত। ইসলামের সকল প্রকার দাওয়াত এই স্বাধীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সামাজিক প্রথা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধেও এর প্রমাণ মেলে। ইসলামী ধারণার এই ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র এর অমুসলিম প্রজাদেরকে তাদের ধর্মীয় কার্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে।

বিদেশি রাজা বাদশাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত, প্রজাদের প্রতি অত্যাচার না করা, সকলকে নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যে স্বাধীনতা প্রদান এর কথা উল্লেখ ছিল। মানুষের মুক্ত ইচ্ছা তার সাধারণ জ্ঞান এর সামনে সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে : "হে মনুষ্য জাতি যাহা সত্য তাহা তোমাদের রব এর নিকট হতে তোমাদের নিকট পৌছে যাচ্ছে অতঃপর যাহারা সৎপথ ধরিবে তাহা তাহাদের নিজেদেরই কল্যাণে আর যাহারা বিভ্রান্ত হইবে তাহা তাহাদেরই অকল্যাণে।" "তাহাকে পাপ-পূণ্যের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই সফলকাম যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে এবং সেই ব্যর্থ যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিয়াছে।"

সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ইচ্ছা প্রকাশে এবং দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা : মানুষের মতামতের

www.pathagar.com

এবং আনুসঙ্গিক দায়িত্বের স্বাধীনতা একটি মৌলিক নীতি, যার উপরে ইসলামী চিন্তা ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং আনুসঙ্গিক দায়িত্বের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব যদি আমরা জীবনের প্রতি ইসলামের বাণী, রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবন, জেহাদ অথবা প্রাথমিক মুসলমানদের পারস্য ও রোমান শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ এ সকল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

একজন মানুষের কার্যাবলী তার ইচ্ছার গুণাগুণ প্রকাশ করে সেটা ভাল হোক বা মন্দ হোক এটা সত্য কল্যাণ বা সুবিচারের পথ অনুসরণ করুক অথবা নিজ লোভ লালসা দ্বারা কলুষিত হোক।

সর্বশেষে প্রত্যেকের কার্যের হিসাব হবে খলিফা হিসেবে তার ব্যক্তিগত ভূমিকায় এবং প্রত্যেকে পরকালে তার ইহলৌকিক কার্য ও ইচ্ছার প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। কোরআনের ঘোষণা -

"নিশ্চয়ই সেই সফলকাম যে নিজকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে এবং সেই ব্যর্থ যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিয়াছে।"

"সত্যসহ কোরআন নাজিল করিয়াছি আর আমি তোমাকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।"

"অত্যাচার অবিচার এবং জবরদস্তি ইসলাম সমর্থন করে না, এ সকল কার্যকলাপ ইসলামের দীন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। ধর্মে জবরদস্তি নাই সত্য সুস্পষ্ট হইয়াছে অসত্য হইতে।"

"বল, সত্য তোমার রবের নিকট হইতে আসিয়াছে, যাহার ইচ্ছা সে উহা মান্য করে যাহার ইচ্ছা সে উহা অমান্য করে।"

ঐশী বাণীতে (ওহি) সম্পৃক্ত থাকায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বে এবং এখনও অবিচল এবং সক্রিয়। শক্তি প্রয়োগে নয় বরং বাস্তব ভিত্তিতে ইসলাম এখনও তার আদর্শে উজ্জীবিত। ইসলামী সত্তা সঠিক পদ্ধতি ও কাঠামোতে যতদিন স্থিতিশীল ছিল ততদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ বৈরীতা ইত্যাদিকে ভয় করার কোন কারণ ছিল না। কারণ ইসলামী ফিতরাত এর শক্তি উম্মাহকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিত।

ইসলামকে রক্ষা করার একমাত্র পথ ইসলামকে জানা বুঝা এবং এর ব্যাখ্যা দেওয়া যে ইসলামী পদ্ধতির কাঠামো একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে অবস্থিত। অন্যান্য ভাবাদর্শ বা বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র এর লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে ভয় করার কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অন্যান্য ভাবাদর্শ এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে গ্যারান্টি প্রদান করে। অপরপক্ষে ইসলামী দর্শন এবং পদ্ধতির জন্য এ সকল ভাবাদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে ভয় করার কিছুই নেই।

ইসলামী সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা একটা গভীর নদীর ন্যায় যা তার লক্ষ্যস্থলের দিকে প্রবাহিত। যখন এটা বিস্তৃতি লাভ করে এর স্বচ্ছতাও তখন বৃদ্ধি পায়। মানুষের ইচ্ছা ও সততার আপেক্ষিকতা অনুযায়ী ইসলামী চিন্তাধারায় সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে ইসলামের পক্ষ হতে গ্যারান্টি প্রদান করা হয় বিভিন্ন প্রকার চিন্তা বিশ্বাসের এবং বিতর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থানসমূহের স্বাধীনতাকে।

www.pathagar.com

উম্মাহ এর মধ্যে বিতর্কিত মতামত মূল অবস্থানকে ধ্বংস করতে পারে এরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই, বরং এর দ্বারা ইসলামে ব্যাপ্তি ও ভারসাম্য সম্প্রসারিত হয়। কারণ ইসলামী চিন্তা এবং এর স্বচ্ছ-দর্শন 'ওহি' এর দিক নির্দেশনা, মূল্যবোধ এবং ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা সব সময়ের জন্য শক্তিশালী এবং কার্যকর। উম্মাহ কর্তৃক নতুন কিছু উদ্ভাবন বা সংযোজনের ভিত্তি মূলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীনতা ভোগের বিশেষকরে 'বিশ্বাস' এর স্বাধীনতা ভোগের একটা পূর্বশর্ত সংস্কৃতির পূর্ণতা। আদি যুগের কৃষ্টির পরিবেশ বা কৃষ্টির পশ্চাদপদতা যা বেদুইন বর্বর অথবা আদিবাসীদের মাঝে বিরাজ করত তা প্রকৃতই কৃষ্টি হিসাবে সামাজিক ও মানসিক দিক দিয়ে অনুন্নত ছিল। এজন্য দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তারা ছিল অপারগ। এজন্য প্রয়োজন তাদের প্রতি যত্ন নেয়া এবং তা অব্যাহত রাখা, যত দিন না তারা স্বাধীনতা ভোগের বা এর দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। ইসলাম তার সংস্পর্শে আসা আদিবাসী পৌত্তলিক ও আরবের মরু অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রসমূহের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালায় যাতে তারা বর্বর যুগের অভ্যাস ও ত্রুটি বিচ্যুতি এবং কৃষ্টির পশ্চাদপদতা থেকে বেরিয়ে আসে এবং মুসলমান ও তাদের সমর্থকদের সঙ্গে শত্রুতা পরিহার করে।

মুসলমানগণ তাদের দায়িত্বজ্ঞানে ঐ সকল লোকদের তাদের বর্বর আচরণ ও অভ্যাস থেকে বের হয়ে ইসলামী কৃষ্টি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কোন ধর্ম পালনে স্বাধীনতা নেই, এতে তারা বর্বরতার মধ্যেই বসবাস করে। বরং স্বাধীনতা ও শান্তি ইসলামী পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। এ সম্পর্কে কোরআনের বাণী :

"তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ভ্রান্তি শেষ হয় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয় তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেন।"

"মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন , তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি, যদি তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম মেহেরবান"।

আদিবাসী পৌত্তলিক এবং মরু আরববাসীদের প্রতি ইসলামের আচরণ এবং প্রচেষ্টা ছিল তাদের বর্বরতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে তাদের স্বাধীনতা ভোগের জন্য যোগ্য করে তোলা। যোগ্য ব্যক্তিদের ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদানে ইসলাম অস্বীকার করেনি। আহলে কিতাবদের অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপাসনা ও ধর্মাচরণের অধিকারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করেনি যদিও তারা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তেমনি পারশিয়ানে এবং মাজিয়ানদের ধর্মীয় আচরণে স্বাধীনতা ছিল যদিও তারা অগ্নিপূজক ছিল। স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে উপরিউক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে।

চিন্তার স্বাধীনতা : মানব চিন্তার স্বাধীনতার পরিধি ধর্মীয় কাজের স্বাধীনতা হতে উৎসারিত। চিন্তার স্বাধীনতা মানুষের নৈতিক স্বাধীনতার সাথে জড়িত এবং নৈতিক

www.pathagar.com

ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামী সমাজে একজন তার নীতিগত বিশ্বাসে বিবেক অনুযায়ী কাজ করতে স্বাধীন। এবং ইসলাম স্বীকার করে না কাউকেও তার মতের বা বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার জন্য বাধ্য করতে। যে তার বিবেক অনুযায়ী কাজ করবে তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। "তুমি তোমার নিজের সহিত পরামর্শ কর যদিও অন্য লোকেরা তাদের আইনগত মতামত প্রদান করে।" (আহমদ) '

"যে বিভ্রান্ত সে নিজেরই ক্ষতি করে, একজনের বোঝা অন্যজন বহন করে না।"

টিকে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে এবং খলিফার দায়িত্ব পালন করতে মূল প্রয়োজন হচ্ছে চিন্তার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ইসলামী চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অন্যের চিন্তা ও ধর্মীয় কাজের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান জরুরি। একটা ইসলামী সমাজে সৃজনশীলতার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সমাজের উন্নয়ন নীতির প্রবর্তন এবং এই সৃজনশীলতা সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করবে, অনৈতিক কোন কিছু করবে না। তেমনিভাবে সামাজিক আচরণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিন্তা ও ধর্মীয় কাজে স্বাধীনতা প্রদানে। এটা শুধু তাত্ত্বিক পর্যায়েই থাকবে না ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটবে। মানবিক আচরণ এবং কর্মের একটা সমষ্টিগত রূপ থাকবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত আচার আচরণ শেষ পর্যায়ে সামাজিক নীতিতে ঐকীভূত হবে। সামাজিক নীতি কোন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে দমন করবে না বরং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ রাখবে। ব্যক্তিগত কাজে এবং চিন্তায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকবে। নিজস্ব ধ্যান ধারণা থেকে উৎসারিত কোন বিশ্বাসে কেউ কোন কাজ করতে পারবে না যদি সে কাজ সামাজিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যায়। কারণ সামাজিক নীতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ব্যক্তিগত চিন্তা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী চললে সে চলার স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। ফলে সকল প্রকার অধিকার এবং স্বাধীনতা বাজেয়াপ্ত হবে, মানবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। কোন কাজের আইনগত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনানুগ সিদ্ধান্তের উপরে, যে সিদ্ধান্ত হবে মানবকল্যাণের স্বার্থে, ইসলামী ধ্যান ধারণা অনুযায়ী যার বাস্তবায়ন খলিফার দায়িত্বে যিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি।

কোন ব্যক্তিগত কার্য সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে গেলে সে কার্যের বৈধতা থাকে না। অনুরূপভাবে সামাজিক নিয়ম নীতির কোন বৈধতা থাকবে না যদি তা ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং চিন্তার স্বাধীনতা সংরক্ষণে প্রণীত না হয়। একটি মুসলিম সমাজে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত আচরণ এবং গণআইন প্রণয়ন পদ্ধতি ইসলামী আদর্শ থেকে গ্রহণ করতে হবে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নীতি, মূল্যবোধ সবই ইসলামী হবে। মুসলিম আইন প্রণেতাগণ ইসলামী সমাজে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ ঐ সকল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো এবং এটা হল খলিফার দায়িত্ব পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে। অনুরূপ একজন মুসলমানের কার্যকলাপ এবং আচরণ উপেক্ষা করতে পারে না ইসলামী পদ্ধতির বিধিসমূহকে যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কর্তৃক ইসলামের আদর্শে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইসলামী পদ্ধতির একটি মূলনীতি প্রত্যেক বস্তুই হালাল যা কোরআনে স্পষ্টভাবে হারাম বলে নিষিদ্ধ করা হয়নি অথবা যাকে সমাজের মূল স্বার্থ হননকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়নি।

www.pathagar.com

আলোচ্য নীতির আলোকে আমরা বুঝতে পারি সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ (আমার বিল মা'রূফ ওয়া নেহী আনিল মুনকার) সম্পর্কে ইসলামী ধারণা।

ব্যক্তিগত চিন্তা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে উপদেশ, আদেশ, পথ প্রদর্শন ও নির্দেশাবলী প্রদান। আর সামাজিক আচরণের স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ হল জিহাদ, প্রতিকার, ত্যাগ এবং সমাজকেও এর উদ্দেশ্যাবলীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা : ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হল মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে তার পছন্দের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে। প্রত্যেকের রয়েছে ভয়ভীতি ও হস্তক্ষেপ মুক্ত ভাবে স্বীয় ধর্ম পালন ও অনুশীলন করার স্বাধীনতা। ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে কোন অমুসলিমকে যেন ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা না হয় এবং তারা যেন নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের অধিকার আছে স্বীয় ধর্ম প্রচার করার এবং স্বধর্মীয় বা ভিন্নধর্মীয় কেউ যদি ধর্মের উপর আঘাত করে বা উস্কানিমূলক কাজ করে তাহলে তা প্রতিহত করার অধিকারও রয়েছে সেই ধর্মাবলম্বীর।

ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে ইসলামী শরীআয়। এটা এমন আইন ব্যবস্থা যা ধর্মীয় ও আইনগত মানদণ্ডে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। যেহেতু শরীআর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস, তাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও পালন করার স্বাধীনতা আছে কি নেই তা ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল ও বিতর্কিত বিষয়। তারপরও শুধু এটিই ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল অর্থ ও প্রকৃতিকে আবশ্যিকভাবে পাল্টে দেয় না। তাই ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মানুষ ইসলামী বা অন্য যে কোন আইন ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলুক তা এখানে মুখ্য নয়। কারণ স্বাধীনতার মৌলিক ধারণা ব্যক্তির পছন্দের বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়াকে অস্বীকার করে। অন্যান্য স্বাধীনতার মতই ধর্মীয় স্বাধীনতাও ক্ষমতার উচ্চতর উৎস থেকে নিপীড়নের সম্ভাব্য আতংকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। এই বিষয়টি ইসলামের স্বাধীনতার ধারণার ক্ষেত্রেও আবশ্যিকভাবেই সত্য। ফাতহি উসমান বলেন, "মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কোন শক্তি নিয়োজিত করে না। এই ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কাজ হল ঐ সমস্ত অপশক্তিকে নজরদারি ও দমন করা যারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে চায়।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় নবী মুহাম্মদ (স) যখন মক্কার মুশরিকদের মধ্যে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন, তখন মুশরিকদের শত্রুতা এবং বিরুদ্ধ আচরণ ও প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নতুন ধর্ম ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। আল ইল্লির মতে, এ ঘটনা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে যে ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে এবং ইসলাম নিজেই যুক্তি ও সত্যের বিচারে মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছে ও কৌশলে বুঝিয়েছে। অন্য কথায় ইসলাম যদি তার সূচনার প্রতি সত্য থাকতে চায় তাহলে আশা করা যায় যে সে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে বৈধতা দেবে। যথার্থভাবে বলতে গেলে আলেমগণ

www.pathagar.com

এই মতকেই গ্রহণ করেছেন এবং সমর্থন করেছে : "ধর্মশাস্ত্রবিদগণ একমত যে স্বেচ্ছায় ঈমানের স্বীকারোক্তি না দিলে তা বৈধ নয়। জোরপূর্বক ঈমানের স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।"

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। স্বাধীনতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
[Define liberty. Explain the nature of liberty.]

২. স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? স্বাধীনতার প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[What is meant by liberty? Discuss the classification of liberty.]

৩. স্বাধীনতা কি? আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো আলোচনা কর।
[What is liberty? Discuss the safeguards of liberty in the modern democratic state.]

৪. স্বাধীনতা কি? ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
[What is liberty? Explain the scope of liberty as Islamic conditions.]

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার মূলনীতি/ভিত্তি আলোচনা কর।
[Discuss the principles/basis of liberty as Islamic conditions.]

www.pathagar.com

সাম্য
Equality

[প্রাক-কথা, সাম্যের অর্থ ও সংজ্ঞা, সমাজজীবনে সাম্যের গুরুত্ব, সাম্যের প্রকারভেদ, ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্য, ইসলামের মূলনীতি]

প্রাক-কথা
Introduction

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর মধ্যে সাম্য (Equality) অন্যতম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সাম্য সংক্রান্ত আলোচনায় তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। কারণ সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা স্বাধীনতা ও অধিকার উপভোগের জন্য অত্যন্ত জরুরি। মূলত সাম্য বলতে সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধাকে বুঝায়, যেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন মহলের জন্য বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও এরূপ বৈষম্যহীন সাম্যব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী। ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেই কেবল সকল মানুষের সমান অবস্থান আশা করা যায়। আর এজন্যই সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব অত্যধিক।

সাম্যের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Equality

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সকল বিষয় অতীব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে সাম্য অন্যতম। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকমহল থেকে শুরু করে আধুনিক চিন্তকদের সকলেই সাম্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগে যুগে বহু রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে যা ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে।

সাধারণত সাম্য বলতে সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা, সমান অধিকার ও সমান স্বাধীনতা ভোগ করাকে বুঝায়। এই প্রকৃতিগত সাম্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে এরূপ সাম্যের উল্লেখ আছে। যেমন-১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, "আমরা এই সত্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এবং মান্য করি যে, সৃষ্টির দিক থেকে সকল মানুষ সমান।" অন্যদিকে ফরাসি নাগরিক অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সমান স্বাধীন থাকে।" কিন্তু এ প্রকৃতিগত সাম্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অচল। সাম্য কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনটি বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

www.pathagar.com

১. সাম্য বলতে সমতাভিত্তিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ সমাজে সকলের অবস্থান সমান। কেউ এমন অবস্থানে আসীন হবে না যার কারণে অন্যের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যেকের সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার উপলব্ধির সুযোগ থাকতে হবে। সামাজিক শক্তি ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ এমনভাবে সজ্জিত হবে যাতে প্রত্যেকের কর্মের ব্যবস্থা হয় এবং যথোপযুক্ত মজুরি পায়।

২. সাম্য বলতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে। **Prof. H. J. Laski** বলেন, "Equality means first of all the absence of special privilege." সাম্যের প্রকাশরূপ সমাজে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা যাতে প্রত্যেকের জন্য সমান হয়, কেউ যেন বিশেষ কোন প্রভাবের কারণে বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে না পারে।

৩. সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কে **Laski** বলেন, "Equality means ... that adequate opportunities are laid open to all. রাষ্ট্র কেবল সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সাম্য বলতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা বুঝায়। বলা হয়, "Equality is a levelling process."

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাম্য বলতে নারী-পুরুষের ভোটাধিকার, প্রয়োজনীয় যোগ্যতানুযায়ী চাকরি লাভের অধিকার, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের অধিকারকে বুঝায়। যেমন - **Laski** বলেন, "সাম্য হল সেই সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার বেদীতে আত্মবিসর্জন দিতে না হয়।"

সমাজজীবনে সাম্যের গুরুত্ব
Importance of Equality in Social Life

সমাজজীবনে সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সুখসমৃদ্ধ জীবনের জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ অপরিহার্য। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল :

সভ্য সমাজের সূচনায় : সাম্যের মাধ্যমেই সভ্য সমাজব্যবস্থা সূচিত হয়। কারণ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সমান অধিকার উপভোগের সুযোগ লাভ করে। সাম্য বর্ণবৈষম্য বা সাংস্কৃতিক বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন করে সমাজ সুন্দর করে তোলে।

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় : একমাত্র সাম্য ব্যবস্থাই পারে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে। যেখানে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণীভেদের অস্তিত্ব থাকে না।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় : গণতান্ত্রিক সমাজ বলতে ক্ষমতাভিত্তিক সমাজকেই বোঝায়। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ মহলের জন্য বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা লাভের সুযোগ থাকে না। তাই গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সাম্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় : সাম্যব্যবস্থা সমাজে কাউকে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার সুযোগ দেয় না বা কাউকে একেবারে দারিদ্র্যের শিকার হতে দেয় না। সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য রোধ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে সাম্যের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে : সমৃদ্ধ সমাজ বলতে সকলের সুখ-সমৃদ্ধিশীল জীবন ব্যবস্থাকে বোঝায়। আর এরূপ সমাজের রূপায়ণে সাম্য অপরিহার্য। সাম্যভিত্তিক সমাজে সকলের সুখ-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব।

উপরের আলোচনার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের সকল মানুষের মানবিক সত্তার বিকাশ এবং সেইসাথে সুখ-সমৃদ্ধ জীবন উপভোগের জন্য সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ সকলেরই একান্ত কাম্য।

সাম্যের প্রকারভেদ
Classification of Equality

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সাম্য অপরিহার্য। কারণ সুযোগ-সুবিধা দানে সাম্য অবস্থা বিরাজ করলে মানুষ সে সুযোগ গ্রহণ করে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে। সাম্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। **Ernest Barker** দুই প্রকার সাম্যের কথা বলেন। যথা :

(i) আইনগত সাম্য (Legal Equality) এবং
(ii) সামাজিক সাম্য (Social Equality)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **H. J. Laski**-ও দুই প্রকার সাম্যের উল্লেখ করেছেন। যথা :

(i) রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) এবং
(ii) সামাজিক সাম্য (Social Equality)।

সর্বোপরি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছয় ধরনের সাম্য আলোচিত হয়ে থাকে। যথা :

(i) পৌর সাম্য (Civil Equality)
(ii) সামাজিক সাম্য (Social Equality)
(iii) রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality)
(iv) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality)
(v) আইনগত সাম্য (Legal Equality)
(vi) স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality)

নিম্নে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল :

(i) পৌর সাম্য (Civil Equality) : সকল মানুষের সমানভাবে পৌর অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করাকে পৌর সাম্য বলে অভিহিত করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ যখন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সমভাবে ভোগ করে তখন পৌর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সকল নাগরিককে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয়।

www.pathagar.com

(ii) সামাজিক সাম্য (Social Equality) : সামাজিক সাম্য বলতে বোঝায় সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্বিশেষে যখন কোন মানুষের সাথে কোন মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলা হয়। মূলত সামাজিক দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, সমমর্যাদাবান ও সমান সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন।

(iii) রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) : রাজনৈতিক সাম্য রাজনৈতিক অধিকার (Political rights) ভোগের সমতাকে নির্দেশ করে। রাজনৈতিক অধিকার বলতে বোঝায় ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ও সরকারি চাকরি লাভের অধিকারকে। রাজনৈতিক সাম্য ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য।

(iv) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) : ধনবৈষম্যপূর্ণ সমাজে কখনই অধিকার ও স্বাধীনতার সুফল আশা করা যায় না। আবার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। সাম্য বলতে যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় তাহলে অর্থনৈতিক সাম্যের গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতিতে সাম্যের প্রকৃত আদর্শ ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়।

(v) আইনগত সাম্য (Legal Equality) : আইনের আলোকে সাম্য বা সমঅধিকার স্বীকৃত হলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়। আইনের চোখে সকলেই সমান, সকল ব্যক্তির জন্য আইন সমভাবে প্রযোজ্য –এটাই আইনগত সাম্যের মূল কথা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র যেহেতু একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রভুত্ব করে সেহেতু এরূপ রাষ্ট্র কখনই সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

(vi) স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality) : স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সাম্য বলতে বোঝায় জন্মগতভাবেই মানুষ সমান অধিকারসম্পন্ন। জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। সমান অধিকার সহজাত। এটাই স্বাভাবিক সাম্যের মূল কথা। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় স্বাভাবিক সাম্যের কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে এ ধারণার অবসান ঘটেছে। কেননা শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে মানুষ সমানভাবে জন্মায় না। এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। উল্লিখিত বিভিন্ন সাম্য ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সমাজ যেমন সমৃদ্ধ হবে তেমনি ব্যক্তির উৎকর্ষও সাধিত হবে। সাম্যের সফল বাস্তবায়ন আর ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ— এ দুয়ের সংমিশ্রণে সমাজ ও দেশ হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ।

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্য
Equality in Islam

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্যের অর্থ হল সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই আল্লাহর কাছে তাঁর সৃষ্ট সকল মানুষ সমান; কিন্তু বাস্তবপক্ষে সকল মানুষ অভিন্ন নয়। কারণ শিক্ষা, যোগ্যতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিত্ত-বৈভব, ইত্যাদি ভেদে মানুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তবে

www.pathagar.com

এরূপ পার্থ্যক্যের সুযোগে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরের উপর শ্রেষ্ঠ দাবি করতে পারে না। কেননা সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা, সম্মান দাতা ও রক্ষাকর্তা আল্লাহর কাছে মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বংশ, বর্ণ, গোত্র, প্রাচুর্যের পরিমাণ কিংবা মান-মর্যাদার মাত্রা গুরুত্বহীন। ইসলামে সাম্যের ব্যাপারে কোরআনের কতিপয় দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রতি লক্ষ করা যাক।

১. পবিত্র কোরআনে অসংখ্যবার আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্বোধন করেছেন "হে মানব জাতি বা মানবমণ্ডলী" বলে। সুতরাং আল্লাহর এই সম্বোধন কোন শ্রেণীবিশেষের জন্য নয়। বংশ, বর্ণ, গোত্র, ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে এ আহ্বান।

২. আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতরাজির উপর সকলের সমান ভোগাধিকার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হল "হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর" (বাক্বারা : ১৬৮)।

৩. আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে একই উৎসস্থল হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) থেকে সৃষ্টির কথা বলেছেন। সৃষ্টিগত দৃষ্টিতে নর-নারীর মধ্যেও মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই।

৪. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে যেমন মানুষে মানুষে কোন অসমতা নেই তেমনি মহাপ্রলয় দিবসেও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ সবাইকে একই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ইসলামে সাম্যের মূলনীতি
Principles of Equality in Islam

বংশ, বর্ণ, গোত্র, সামাজিক মান-মর্যাদা ইত্যাকার পার্থক্য আল্লাহর কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন। ইসলামী আকিদার ধারকদের কাছে সাম্য ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হয়। এরূপ সাম্য নিম্নোক্ত মূলনীতি থেকে উৎসারিত হয়।

প্রথমত, সমগ্র মানব এক, অদ্বিতীয়, চিরন্তন ও শাশ্বত বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, সকল মানুষ এক ও অভিন্ন মানবকুল তথা আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর বংশধারার সমান অংশীদার।

তৃতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরাজির স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও পরম দয়াশীল। এক্ষেত্রে যুগ, জাতি, গোত্র, ধর্ম নির্বিশেষে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

চতুর্থত, সমানভাবে জন্মগ্রহণ করে সকল মানুষ যেমন কোন বিশেষ অধিকার নিয়ে আসে না তেমনি সকল মানুষ সমানভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং কেউ পার্থিব ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায় না।

পঞ্চমত, প্রত্যেক মানুষই নিজ গুণাবলীর ও কর্মের কারণে আল্লাহর কাছে বিচারের সম্মুখীন হবে।

মানব মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড : মহান স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে একমাত্র মানুষই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের পশ্চাতে রয়েছে তার সম্মান ও মর্যাদার অধিকার। কিন্তু এই মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হল তাক্‌ওয়া বা খোদাভীরুতা। মানুষের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে কবি সাহিত্যিকরাও কেবল মানুষের সাম্যের

www.pathagar.com

জয়গান গেয়েছেন, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। কবি চণ্ডীদাস বলেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" বিদ্রোহী কবি নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান"। আর কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সুন্দর মানদণ্ড দিয়েছেন। আর এই মানদণ্ড হল পূর্ণশীলতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। যেমন-আল্লাহর ঘোষণা "হে মানবমণ্ডলী। আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি এজন্য যে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন।" (হুজরাত – ১৩)

সুতরাং তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত ও শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য বিদ্যমান। বিশ্বাসের সততা ও পরহেযগারিত্বের আলোকে বিদায় হজ্জে সমবেত সাদা-কালো, আরব-অনারবের বিশাল জনসমুদ্রে মহানবীর উদাত্ত ঘোষণা, "সকল মানুষ আদমের বংশধর আর আদম মাটির তৈরি। তাকওয়া বা পরহেযগারী ছাড়া কোন অনারবের উপর আরবের এবং কোন কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

ইসলামী সাম্যের এই আদর্শ সমাজে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে জাতি-বিদ্বেষ, ধর্মীয় নিপীড়নের কোন সুযোগ থাকবে না; থাকবে না কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অত্যাচার-নির্যাতনের অবকাশ। সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে –

"গাহি-সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীস্টান।" (সাম্যবাদী)

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব মানবের কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। মানুষে মানুষে অভেদ নীতি ইসলামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং সুখী সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন কেবল ইসলামী সাম্যভিত্তিক সমাজেই সম্ভব। আর এরূপ জীবন-যাপনের মধ্যেই কেবল স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ সহজ হয়।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. সাম্যের সংজ্ঞা দাও। সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।
[Define Equality. Discuss its importance in social life.]

২. সাম্য কি? সাম্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[What is Equality? Discuss the classification of Equality.]

৩. সাম্য কি? ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
[What is Equality? Explain the scope of Equality as Islamic Conditions.]

৪. সাম্য সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।
[Explain the principles of Islam about Equality.]

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্ব
Brotherhood

[প্রাক-কথা, ভ্রাতৃত্বের অর্থ ও সংজ্ঞা, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব]

প্রাক-কথা
Introduction

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (হুজরাত: ১০)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ প্রগতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলামী জীবন বা সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণতা বিধানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীক নীতিমালা যেমন রয়েছে; তেমনি রয়েছে সুনীতিভিত্তিক উদার আন্তর্জাতিক নীতিমালা। ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার মৌল উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মানবীয় ভ্রাতৃত্ব (Brotherhood)। মানবতার ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনা সর্বজনবিদিত। কেননা এ বিশ্বলয় থেকে সর্বপ্রকার হিংসাদ্বেষ, বর্ণভেদ, কৌলিণ্যতা দূর করে বিশ্ব মানবতাকে সৌহার্দ, সুসম্প্রীতি, সুহৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুপম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় জাতি গঠন করাই ইসলামী বিধানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভ্রাতৃত্বের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definitions of Brotherhood

ভ্রাতৃত্বের কুরআনিক শব্দ 'উখওয়াত' আরবি মূল আখুন থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, বন্ধুত্ব, সৌহার্দপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ক ইত্যাদি। অর্থাৎ পারস্পরিক হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দমূলক নিবিড় সম্বন্ধ বা বন্ধনকে উখওয়াত বলে। ভ্রাতৃত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঔরশজাত ভ্রাতৃত্ব, কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শগত ভ্রাতৃত্ব। দু সহোদর ভ্রাতার মধ্যকার যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি তাই ঔরশজাত বা জন্মসূত্রে ভ্রাতৃত্ব। আর উখওয়াতের উৎপত্তি এখানেই। অন্যদিকে কোন নির্দিষ্ট বংশ, বর্ণ বা অঞ্চলে জন্ম বা বসবাসের ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে তা কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব। সমগ্র বিশ্বের মানবকুল একই ভ্রাতৃমূল হতে উৎসারিত। বিশ্বের সর্বপ্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) হতে সকল মানবের উৎপত্তি। এ দৃষ্টিকোণে সকল

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে মূলগত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে কোরআনের ঘোষণা "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এবং একে অপরকে যাতে চিনতে পার এজন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি।" (হুজরাত – ১৩)। আর আদর্শগত ভ্রাতৃত্ব বলতে বোঝায় কোন বিশেষ আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে উঠা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে। যেমন—হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভ্রাতৃসংঘ, মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামী পুনর্জাগরণ (Islami Renaissance) ও তাহজীব তমুদ্দুন সংরক্ষণের অভিপ্রায়ে মিসরে উখওয়ান-উল-মুসলিমুন নামক যে ভ্রাতৃ সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে তা পরবর্তীকালে সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে অনেক অনারব মুসলিম দেশে ঐ সংগঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য এর অঙ্গ-সংগঠনরূপে 'আখওয়াত-উল-মুসলিমাত' সমগ্র বিশ্বে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
Importance and Significance of Islamic Brotherhood

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ একটি আদর্শ জাতিতে (Ideal Nation) পরিণত হয়। এরূপ ভ্রাতৃত্ব দেশ, কাল, পাত্র, বর্ণ, ভাষাভেদে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আর তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী।

প্রথমত, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অপরিহার্য দাবির ভিত্তিতে গড়ে উঠে বিধায় ইহা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ঈমানের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে। কেননা মুসলমানগণ বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অংশীদারহীন শাশ্বত ও সর্বজনীন; যিনি সমগ্র মানবের স্রষ্টা, খাদ্যদাতা, পালনকর্তা, বিচারকর্তা। তাঁর কাছে সামাজিক মর্যাদা, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং বংশগত মৌলিকত্ব একেবারেই অর্থহীন। তাঁর নিকট সকল মানুষ সমান ও পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য। রাসূল (স) এর বাণী, "প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই।"

দ্বিতীয়ত, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সর্বজনীনভাবে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করণের নিমিত্তে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ "তোমরা আল্লাহর দ্বীনের রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধর" (ইমরান : ১০৩)। আর এই নির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটলেই মানবের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সহযোগিতাকামী। তাই পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব অত্যধিক। পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যেমন- মহানবীর বাণী "আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে নিমগ্ন থাকে" (মুসলিম)।

www.pathagar.com

চতুর্থত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সমাজকে সুদৃঢ় করে। ইসলামী সমাজের প্রতিটি নাগরিক পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা ও সহনশীলতার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিময় সুদৃঢ় সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। তাই ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যতীত সমাজ ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে অর্ধ-পৃথিবীব্যাপী যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল তার ভিত্তিমূলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সক্রিয় ছিল। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের সাথে পৃথিবীতে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্চমত, সকল প্রকার খারাপ কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রয়োজন। কেননা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবিদারগণ অনধিকার চর্চা, অন্যায় রক্তপাত, গালমন্দ, গীবত, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরের ক্ষতি সাধন, অন্যকে কষ্ট দেয়া, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি গর্হিত বা অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে। মহানবী (স) এর মূল্যবান বাণী "তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরকে ঘৃণা করো না, এবং একে অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য পেছনে লেগে থেকো না বরং তোমরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।" (বুখারী – মুসলিম)

ষষ্ঠত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই মানবীয় গুণটি পরস্পরের মাঝে স্থায়ী ও মজবুত সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করে। একই আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত। যেমন- আল্লাহর বাণী, "এরা যেন সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়।"

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব
Islamic and Universal Brotherhood

ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের বিজ্ঞাভিমতের আলোকে যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ সমগ্র মানবজাতিকে এক বুনিয়াদী মহান আদর্শের দিকে আহবান করেছেন। যারা সেই আহবানকে সত্য ও কল্যাণকর মনে করে এর প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে তাদের এক নতুন ইসলামী ঐক্যসূত্রে গ্রোথিত করে তাদের মাধ্যমে অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন তাই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। মওলানা আব্দুর রহিম এর মতে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলতে বোঝায় এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। এতে বর্ণ, গোত্র, জাতি বা সম্প্রদায় এবং ভূখণ্ডগত কোন পার্থক্য থাকবে না। সকল মুসলমান তাদের বর্ণবাদ ভুলে গিয়ে একটিমাত্র আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হবে এবং ভাই ভাই সম্পর্কের মূলমন্ত্রে দীক্ষা নিবে। আবার ইতিহাসবেত্তা খোদাবক্স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "Mohammad The Prophet" এর মধ্যে উল্লেখ করেন "The immediate result of the prophetis teaching was the dissolution of tribal system and the foundation of brotherhood of Islam."

বস্তুত আরাধ্য হিসেবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর একত্ব ও সর্বজনীনতা, আরাধক হিসেবে মানুষের ঐক্য, সংহতি সর্বোপরি আরাধনার মাধ্যম হিসেবে ধর্মের অভিন্নতার উপর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, বংশ ইত্যাদি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মহানবীর ঘোষণা"-তোমরা সকলেই এক আদম (আ) হতে উৎসারিত, আর আদম হলেন মাটি থেকে।" মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল বলেন-"জগৎ জোড়া ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বজোড়া ভাব দেশ-বিদেশে থাকবে নাকো সম্প্রীতির অভাব।" অপরদিকে মহানবী (স) বিদায় হজ্বের ভাষণে আরাফাত ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ হজ্ব যাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে মানবমণ্ডলী, আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোন এবং তা অনুধাবন কর। জেনে রাখ সমস্ত মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। তোমরা একই ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত। স্বেচ্ছায় ও সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে না দেয়া পর্যন্ত অন্যের মালিকানাভুক্ত কোন জিনিস তার ভাইয়ের জন্য বৈধ ও আইনসঙ্গত নয়। অন্যায়-অত্যাচার থেকে তোমরা নিজেকে রক্ষা কর"।

সুতরাং পরিপূর্ণ ও শান্তিময় বিশেষত আল্লাহর নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা অবশ্যই জরুরি।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ভ্রাতৃত্ব কি? ইসলামে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
[What is Brotherhood? Explain the importance of Brotherhood in Islam.]

২. ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব আলোচনা কর।
[Define Brotherhood. Discuss the Islamic Brotherhood and Universal Brotherhood.]

www.pathagar.com

সমাজ
Society

[প্রাক-কথা, ইসলামী সমাজের অর্থ ও প্রকৃতি, ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য]

প্রাক-কথা
Introduction

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ একাকী-বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না; কিংবা একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতা মানুষের কাম্যও নয়। তাই বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আ) এর নিঃসঙ্গতাকে দূর করার জন্য প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ) এর সৃষ্টি। সুতরাং জন্মগতভাবেই মানুষ সঙ্গপ্রিয় ও সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনো চলতে পারে না; অর্থাৎ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এটা যেমন পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও মনীষীদের মন্তব্য তেমনি কুরআনিক দৃষ্টিতেও। সামাজিক জীব মানুষের জন্য আদর্শ সমাজ গঠনের নিমিত্তে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যার নিদর্শন আজ থেকে প্রায় পনের'শ বছর পূর্বে মহানবী (স) কর্তৃক আরবের অসভ্য, বর্বর, কুসংস্কার আর নগ্ন কুহেলিকার অপসংস্কৃতির দাসত্বকে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহা আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা।

ইসলামী সমাজের অর্থ ও প্রকৃতি
Meaning and Native of Islamic Socity

সাধারণভাবে সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণে সমাজ হল একটি মানবীয় সংগঠন। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি। মানুষ বর্বর বন্য দশা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতা নীতির বশবর্তী হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই সমাজের অভ্যুদয় ঘটেছে। R.M. MacIver বলেন, "সমাজ মানুষের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক বিচিত্ররূপ। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, লাভ-ক্ষতি ও মমতা-বৈষম্যকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাই সমাজ।" অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী Giddings মনে করেন, "সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।"

আর ইসলামী রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজই হল ইসলামী সমাজ। অর্থাৎ যে সমাজের প্রত্যেক মানুষের অধিকার, চাহিদা, দায়িত্ব-কর্তব্য ইসলামের অনুশাসনের আলোকে নির্ধারিত হয় তাই ইসলামী সমাজ। ইসলামে গোটা মানব জাতিই একটি সমাজ। এরূপ সমাজের উৎপত্তি হযরত আদম (আ) থেকে এবং এর

www.pathagar.com

বিস্তৃতি ও প্রসারতা বিশ্বব্যাপী। এ সমাজের সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। অন্যভাবে বলা যায়, যে সমাজের সদস্যগণ মুসলমান, যারা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপন করে তাই ইসলামী সমাজ। এটি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সকল প্রকার গোঁড়ামী, রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা কিংবা সীমালঙ্ঘনতাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং অগ্রগামিতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এরূপ ইসলামী সমাজের সদস্যদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "বলুন, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য নিবেদিত" (আনআম - ১৬৩)। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের সার্বিক কল্যাণে ইসলামী সমাজের সকল কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। যেমন-আল্লাহর বাণী "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণ দান কর।" (বাক্বারা – ২০১)। এ প্রসঙ্গে রাসূলের বাণী "কল্যাণ কামনাই দ্বীনের মূল কথা।" এটা তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ বললেন, কল্যাণ কামনা করার জন্যে রাসূল (স) বলেন, "আল্লাহ তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলমানদের নেতা এবং জনগণের জন্য।"

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য
Features of a Islamic Society

শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচারক মুহাম্মদ (স) বিশ্ব নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ায় সমাজের সংকীর্ণ অর্থ রহিত হয়ে একটি বিশ্বজনীন রূপ লাভ করেছে। কারণ নবীশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (স) হলেন সমস্ত বিশ্বের রহমত স্বরূপ। সেই সাথে তাঁর প্রবর্তিত ও নির্দেশিত একটি আদর্শ সমাজের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

১. একত্ববাদভিত্তিক : ইসলামী সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল ইসলামের মৌল শিক্ষা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ এ সমাজ তাওহীদের বিশ্বাসে উজ্জীবিত ও বলীয়ান। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানব জাতিকে এ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। পৃথিবীর মানুষ বারংবার ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়েছে বলে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ যিনি এর পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং ধ্বংস কর্তা। মানুষ হল আল্লাহর বান্দা। আর ইসলামী সমাজে সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহ।

২. রিসালাত : ইসলামী সমাজের দ্বিতীয় ভিত্তিমূল রিসালাত। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর, লোভী, যশ ও ক্ষমতা প্রত্যাশী। মানুষের এসব প্রত্যাশা যখন পূরণ হয় না তখন সে নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি পাপাচারে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। সমাজের এহেন দুর্দিনে প্রয়োজন দেখা দেয় রিসালাতের। প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত বিশ্বে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের আলোকে সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠনে নিজেদেরকে আত্মনিয়োজিত রেখেছেন। নবী-রাসূলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্র, অনুপম জ্ঞান ও ঐশী শক্তির অধিকারী

www.pathagar.com

সমকালীন শ্রেষ্ঠ মানুষ। নবী-রাসূলগণ আদর্শ সমাজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। যেমন- আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা "অবশ্যই রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ" (আহযাব - ২১) অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুকরণ কর" (নিসা - ৫৯)। রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানি করল" (আল হাদিস)। আর ইসলামী সমাজে বিশ্ব নবীর আদর্শ ও নেতৃত্বকে অনুসরণ করা হয়।

৩. **ঈমান ও আমলের সমন্বয় :** ঈমান তথা বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলামী সমাজের কাঠামো নির্মিত হয়। তাওহীদ ও রিসালাতের উপর কেবল বিশ্বাস স্থাপন করলেই চলবে না, বরং তদানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে হবে। ইসলামে বলা হয় কর্মই ধর্মের পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা "মহাকালের শপথ, অবশ্যই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে" (আল আসর - ১-৩)। বস্তুত ইসলামী সমাজের একজন ঈমানদার মুমিন-মুত্তাকী বান্দা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশের সাথে সাথে পরকাল, ফেরেশতা, ঐশী গ্রন্থসমূহ, নবীকুলের প্রতি বিশ্বাস করে, সম্পদের প্রতি অনাসক্ত থাকে; আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, অসহায়-সাহায্য প্রার্থী, কৃতদাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, সমাজের মঙ্গল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যাকাত প্রদান করে এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ, সংকটে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। এ সমাজে পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণের পথও সুগম করে।

৪. **সাম্যভিত্তিক সমাজ :** ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানবতার উজ্জ্বল আদর্শ যেমন- সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়। বিপরীতে অন্ধ আভিজাত্যের গৌরব জন্মগত বা বংশগত মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। রাসূল (স) বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী"।

৫. **দায়িত্ব নির্ভর :** ইসলামী সমাজের প্রতিটি সদস্যের একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী। এখানে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরূপ সমাজের কোন সদস্যই দায়িত্বমুক্ত নয়। রাসূল (স) বলেন, "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল"। তিনি অন্যত্র বলেন, "কল্যাণকামীতাই ধর্ম। যে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ করে সেই উত্তম।"

৬. **ন্যায়নীতি :** ইসলামী সমাজের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানে ন্যায়ের আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হয়। এ সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার অন্যায় বা জুলুম-অত্যাচার চলতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ "তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী'। অন্যত্র বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীকে ভালবাসেন।"

www.pathagar.com

৭. সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ সমাজ : বর্ণভেদ, গোত্রভেদ, ভাষা-জাতিভেদ কিংবা আঞ্চলিকতার ভিন্নতামুক্ত একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন সমাজ হল ইসলামী সমাজ। ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেকেই এ সমাজের সদস্য। এ সমাজের সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। রাসূল (স) বলেন, "মুসলমানগণ একটি দেহের মত।" তিনি আরো বলেন, "মুসলমানগণ একত্রে মিলিত একটি অট্টালিকা স্বরূপ।" (বুখারী)

সর্বোপরি এটা শ্রেষ্ঠ সমাজ। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। কেবল তাদের উদ্দেশ্যে আলাহ্ তায়ালা বলেন-"তোমরাই শ্রেষ্ঠ।" (ইমরান - ১১০)

বস্তুত এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলামী সমাজে কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত অপরাপর মূলনীতির বাস্তবায়ন সম্ভব। কেননা এ সমাজ ইসলামী আকিদা বিশ্বাস নির্ভর, ইবাদত ও আইন-কানুন ইসলা নিয়ন্ত্রিত।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. সমাজ কি? ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
[What is Society? Explain the nature of Islamic Society.]

২. ইসলামী সমাজের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
[Define Islamic Society. Discuss the Characteristics of Islamic Society.]

www.pathagar.com

সামাজিক ন্যায়বিচার
Social Justice

[প্রাক-কথা, ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, প্লেটোর ন্যায়ধর্ম ও আধুনিক ন্যায়ধর্মের মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচার]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়বিচার ও এহসান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।" (নহল–৯০)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রকৃত প্রাপকের নিকট পৌছে দাও। আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে।" (নিসা – ৫৮)

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষের কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" (মায়েদা – ৮)

প্রাক-কথা
Introduction

ইসলাম একাধারে সর্বোত্তম, আদর্শ, ন্যায়ানুগ, শান্তিময়, উদার, পরিপূর্ণ, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, কল্যাণকর, সর্বজনীন ও সর্বকালীন শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠন ও সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের অনুসৃত নীতিমালা ও আদর্শের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ হল সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এটা বিশ্বনিয়ন্তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত 'ফরজ' তথা অবশ্য করণীয় কাজ। ন্যায়বিচার বা সুবিচার ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ (Safeguards) এবং মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতির চমৎকার বন্ধন রচনা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠার মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। নানা অত্যাচার অবিচার, জঘন্যতম অপরাধসূমহ, অন্যায়, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে অসংখ্য নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং মানব জীবনে সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা
Traditional Concept of Justice

ন্যায়বিচারের ধারণাটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে তথা Plato ও Aristotle

www.pathagar.com

এর লেখনীতে ন্যায়বিচার সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। প্লেটো তাঁর শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের পবিত্র বাণী 'Virtue is Knowledge' (পুণ্যই জ্ঞান) কে রূপায়নের লক্ষ্যে অধিকন্তু তৎকালীন গ্রিসে প্রচলিত রাষ্ট্রীক নানা অব্যবস্থা-বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটনের জন্য যে আদর্শ রাষ্ট্রের নীল নকশা (Blue-print of Ideal State) অঙ্কন করেন তাঁর মূলভিত্তিই ছিল Justice তথা ন্যায়বিচার। যদিও তাঁর ন্যায়বিচারের প্রত্যয় ছিল কল্পনাসর্বস্ব। তবে তিনি ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic' -এ নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে তৎকালীন গ্রিসের বুদ্ধিজীবীরা ন্যায়বিচার সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

১। **সিফেলাসের** মতে, "সত্য কথা বলা ও ঋণ পরিশোধ করার নাম ন্যায়বিচার।" (Justice means speaking the truth and paying one's debt)

২। সিফেলাসের পুত্র **পলিমার্কাস** বলেন, "প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করার নামই ন্যায়বিচার।" (Justice means paying one's due). প্লেটো এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে বলেন, ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ করার নাম ন্যায়বিচার হতে পারে না। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন– কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন ধারালো অস্ত্র ধার নেয়ার পর প্রথম ব্যক্তি যদি উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে ঐ অবস্থায় তার প্রাপ্যকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত হবে না। পলিমার্কাস আরো বলেন, "অন্যায়কারীর অনিষ্ট করা এবং ন্যায়কারীর উপকার করাই হল ন্যায়ধর্ম।" কিন্তু এ ধারণাও ভুল।

৩। Radical Sophist **থ্রাসিমেকাস** বলেন, "সরকারের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় তাকে ন্যায়ধর্ম বলে।" সরকার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন তৈরি করে। সরকারের আইন অনেক সময় সবলের স্বার্থ রক্ষা করে। প্লেটো যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, সরকারের ক্ষমতাকে যদি ন্যায়ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে "জোর যার মুল্লুক তার" (Might is right) নীতিকে মেনে নিতে হয়।

ন্যায়ধর্ম সম্পর্কে উপর্যুক্ত মতামতকে ভ্রান্ত, অসার ও অযৌক্তিক প্রমাণিত করে ন্যায়ধর্ম সম্পর্কে প্লেটো নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "ন্যায়ধর্ম কোন কৃত্রিম বা বাহ্যিক জিনিস নয়; বরং তা মানবের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত এবং মানবাত্মার যথার্থ স্বরূপ।" তিনি আরও বলেন, "Giving every man his due and what is proper for him." অর্থাৎ প্রত্যেককে তার যোগ্যতানুযায়ী স্ব স্ব প্রাপ্য প্রদান করা যা তার ন্যায়ত প্রাপ্য।

Plato ন্যায়বিচার আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনের তিনটি উপাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় জীবনেও অনুরূপ তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিজীবনের তিনটি উপাদান হল : (i) Wisdom (প্রজ্ঞা); (ii) Courage (সাহস বা বিক্রম); (iii) Appetite (প্রবৃত্তি বা কামনা)।

রাষ্ট্রীয় জীবনের অনুরূপ তিনটি উপাদান হল : (১) Philosophers (দার্শনিক শ্রেণী); (২) Warriors (যোদ্ধা শ্রেণী); (৩) Peasants (শ্রমিক শ্রেণী)।

এ তিন শ্রেণীর দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে বলেন, দার্শনিক শ্রেণী রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করবে, যোদ্ধা শ্রেণী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় এবং শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে **জর্জ সেবাইন** (George Sabine) তাঁর "A History of Political Theory" গ্রন্থে বলেন, "ন্যায়বিচার এমন একটি বন্ধন যা সমাজকে সুসংহত করে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে এবং প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা ও শিক্ষা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্মজীবন বেছে নিতে পারে।"

ন্যায়ধর্মের বৈশিষ্ট্য : প্লেটোর ন্যায়ধর্ম তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন–

১। ন্যায়ধর্ম একটি সামাজিক বন্ধন। এ বন্ধন সমাজকে সুসংহত করে এবং সমাজের লোকদেরকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে।

২। ন্যায়বিচার প্রত্যেককে সমাজে তার নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দেয়। এ স্থান নির্ধারণের ভিত্তি হল প্রকৃতিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।

৩। প্লেটোর ন্যায়বিচারের ধারণায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৪। প্লেটোর ন্যায়ধর্ম কর্মবিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত; এতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

৫। ন্যায়ধর্ম একটি শিল্পকৌশলবিশেষ। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ন্যায়ধর্মও শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

৬। প্লেটোর ন্যায়নীতির ধারণার মধ্যে মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন ও নৈতিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্লেটোর ন্যায়ধর্ম ও আধুনিক ন্যায়ধর্মের মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য
Difference Between Plato's Justice and Modern Justice

উভয় ন্যায়বিচারের ধারণার মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, প্লেটো ন্যায়বিচার বলতে যোগ্যতা অনুযায়ী স্ব স্ব প্রাপ্য প্রদান করাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আধুনিককালে ন্যায়বিচার বলতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ রায়কে নির্দেশ করে। আধুনিক ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যক্তির সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদিকে নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো নৈতিকতার দৃষ্টিতে ন্যায়ধর্মকে রূপায়ণ করেছেন। আর আধুনিক ন্যায়বিচার আইনগত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত, প্লেটো যে ন্যায়বিচারের ধারণা দিয়েছেন তা সমাজে শ্রেণী শাসনকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু আধুনিক ন্যায়বিচারের ধারণা সামাজিক সাম্যাবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থত, প্লেটো শিক্ষাগত মানদণ্ডের উপর ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন আর আধুনিক ন্যায়বিচার ব্যক্তির সমান সুযোগ-সুবিধাকে নিশ্চিত করে।

পঞ্চমত, প্লেটোর ন্যায়বিচার গণতান্ত্রিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু আধুনিক ন্যায়বিচার কেবল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বাস্তবায়িত হতে পারে।

ষষ্ঠত, প্লেটোর ন্যায়বিচারে আইন-আদালতের কোন সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, আধুনিক ন্যায়বিচার আইন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

www.pathagar.com

সপ্তমত, প্লেটোর ন্যায়বিচারে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষিত হয় নি। কিন্তু আধুনিক ন্যায়বিচারের অর্থই ব্যক্তির স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা।

আর Aristotle এর মতে, সমাজের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান বেশি, সুযোগ-সুবিধা তাদেরই বেশি প্রাপ্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন, ধনীর সম্পদ না কেড়ে, দরিদ্রের চাহিদা পূরণ করাই ন্যায়বিচার। কার্যত, পশ্চিমারা ন্যায়বিচারকে চতুর্বিদ সাম্যের মধ্যে নিহিত বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ উপযুক্ততা, প্রয়োজন, নৈতিক অধিকার ও আইনানুগ।

গ্রিক দার্শনিক Plato'র পর মধ্যযুগের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ Saint Augustin (সেন্ট অগাস্টিন) ন্যায়বিচার সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনার অবতারণা করেন। অগাস্টিনের মতে, কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ যখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতির সাথে সঙ্গতি বিধান করে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, তখন বলা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ন্যায়পরায়ণ। অর্থাৎ অগাস্টিন ন্যায়বিচার বলতে প্রতিষ্ঠানের আরোপিত নীতিমালার আলোকে জীবন যাপনকে বুঝিয়েছেন।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই) আমেরিকানদের বিভিন্ন অধিকারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার বা সাম্য নীতির উল্লেখ করা হয়। তবে আমেরিকায় সংবিধানের আলোকে সাম্যনীতি ঘোষিত হলেও এখনো সেখানে সাদা-কালোর প্রভেদ বিদ্যমান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল জে ফ্রেডারিক মনে করেন, আধুনিক সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এক. আইনানুযায়ী সকলের প্রাপ্য নিশ্চিত করা এবং দুই. আইনভঙ্গ না করলে কারও জীবন ও অঙ্গের ক্ষতি সাধন না করা।

আবার আধুনিক রাষ্টবিজ্ঞানীদের অনেকেই ন্যায়বিচার বলতে নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাকে বুঝিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচার
Social Justice in Islam

সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার দুর্বলতা, অপূর্ণতা এবং অসারতা হেতু সমগ্র বিশ্বের মানবকুলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে বিশেষত সমাজে সকলের ন্যায়সঙ্গত সমানাধিকার ও সমপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের যৌক্তিক ধারণার অবতারণা হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীক জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত জীবন বিধানের আলোকে যার যা প্রাপ্য তা নিশ্চিতকরণের সুব্যবস্থাই আদল বা ন্যায়বিচার। আর এরূপ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা মহান আল্লাহর অমোঘ নির্দেশ। আল কোরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা "যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা কর, তখন ন্যায়বিচারের (আদলের) সাথে কর।" (নিসা-৫৮)

"আপনি বলেন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (আরাফ-২৯)

www.pathagar.com

ন্যায়বিচারের আরবি শব্দ 'আদল' যার অর্থ ভারসাম্য রক্ষা করা, ইনসাফ করা বা ন্যায়বিচার করা। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে যার যতটুকু প্রাপ্য আল্লাহর বিধানের আলোকে এর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হল আদল বা ন্যায়বিচার। কিন্তু ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ আরো ব্যাপক, এর অন্তর্নিহিত ভাব আরো গভীর। প্রচলিত ন্যায়বিচার কেবল সমাজের মানুষের বাহ্যিক মানবাধিকারের উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু ইসলামে ন্যায়বিচার ব্যক্তির কথা-বার্তা, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে। এরূপ ন্যায়বিচারের ধারণা কেবল সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল সৃষ্টি জীব-জড় প্রত্যেকের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যান্য জীব-জন্তুর সাথেও শরীয়তসম্মত পন্থায় আচরণ করা। পৃথিবীতে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। আদর্শ সমাজের ভিত্তি যে ন্যায়নীতি এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন "আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ (ন্যায়নীতি) প্রতিষ্ঠা করে" (হাদীদ-২৫)। বস্তুত যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির নিকট অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও ঐসব কিতাব অবতীর্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় : ন্যায়ভিত্তিক সমাজে যেখানে আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) পূর্ণ প্রয়োগ ঘটে সেখানে জনগণের জীবন সম্পত্তি, মান-সম্মানের অধিকার অধিকতর নিরাপদ। অন্যায়-অত্যাচার বা জোর-জুলুমের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর নির্দেশিত বিধানের প্রয়োগ ঘটান হয় এবং বিচার কার্যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না নিয়ে ন্যায়বিচার করা হয় তাহলে সমাজে ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাজী বা বিচারপতির দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে করবে।" (নিসা-৫৮)

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় : সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তথা সমাজ থেকে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, হত্যা, ব্যভিচার, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদি গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ উচ্ছেদ করতে কোরআন নির্দেশিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। রাসূল (স) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এর অনুসরণ ব্যতীত সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ তার অধিকার উপভোগের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রশংসা কীর্তন করে থাকে। সেই অধিকার উপভোগের সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামে মানুষের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, ইসলাম মানুষের অধিকার উপভোগের যাবতীয় ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেকেই সমান অধিকার লাভ করে থাকে।

www.pathagar.com

সাক্ষ্যদান ও বিচারকার্য : সাক্ষ্যদান ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল কোরআন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিচ্ছে এভাবে "তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ো না।" আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সত্য সাক্ষ্যদান এবং ন্যায়ভিত্তিক বিচার কার্য পরিচালনা করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ও কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই।

•**সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে :** ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচারে কোন শ্রেণী বৈষম্যের সুযোগ নেই। বরং ধনী-গরিব, উচ্চ-নিম্ন, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, মুসলিম-অমুসলিম, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই ন্যায়ের মানদণ্ডে সমান। হযরত ওমর (রা) সমস্ত প্রশাসকের উদ্দেশ্যে পত্রে লিখেন "ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে সমান জ্ঞান করবে। নিকট ও দূরের লোকদেরকে সমান বিবেচনা করবে। আর ঘুষ গ্রহণ থেকে দূরে থাকবে।"

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে : ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ মুসলমানদের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে আদর্শ বা ন্যায়বিচারভিত্তিক। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা পরিমাপে কম দিও না" পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাও হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য হতে হবে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে। আল্লাহর ঘোষণা "তোমরা ন্যায়বিচারের সাথে ওজন পরিপূর্ণভাবে দাও।"

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে : আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর, ইহা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী।" "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীকে ভালবাসেন।" ন্যায়বিচারকরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবেন। দুনিয়াতেও ন্যায়বিচারকদের অতি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা শ্রেয়।

পরিশেষে, ইসলাম ন্যায়বিচারের যে অনুপম নিদর্শন তুলে ধরেছে তা মানব জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আল্লাহর উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কাজেই পরিপূর্ণভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ নির্দেশিত ন্যায়বিচারের বিধান কায়েম করা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ্ ইনসাফ বা আদর্শ প্রতিষ্ঠাতাকারীকে ভালবাসেন আর অবিচারকারী বা যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না তাদেরকে তিনি কাফের, জালেম, ফাসেক বলে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ন্যায়বিচার কি? ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is Justice? Explain the traditional Concept of Justice.]

২. ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
[Explain the Islamic Concept of Social Justice.]

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ/ উম্মাহ্
Nationalism / Ummah

[প্রাক-কথা, জাতি-অর্থ ও সংজ্ঞা, জাতীয়তাবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা, জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদের উপাদান, জাতি ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য, জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী?, জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার পথে একটি হুমকি?, উম্মাহ্র অর্থ ও সংজ্ঞা, মুসলিম/ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্র বৈশিষ্ট্য, মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য]

"সমগ্র মানব জাতি একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।" (বাক্বারা - ২১৩)

প্রাক-কথা
Introduction

ইসলামের মৌল ধারণাগুলোর মধ্যে 'উম্মাহ' বা 'জাতি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ উম্মাহ সম্পর্কে ইসলাম সবিস্তারে আলোকপাত করে থাকে। তবে প্রচলিত ধারণায় জাতি বা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মতদ্বৈততা বিদ্যমান থাকলেও ইসলামে এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহ্ তথা জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অবতারণা একান্তই শ্রেয়।

জাতি : অর্থ ও সংজ্ঞা
Nation : Meaning and Definitions

জাতির ইংরেজি শব্দ Nation যা ল্যাটিন শব্দ Natus Natio (জন্ম) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জাতি বলতে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টিকে বোঝায়।

জাতি মূলত এমন এক জনসমাজকে বোঝায় যা ক্রমবিকাশের পথে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আধুনিককালে জাতি বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টিকে, যারা একই ভূখণ্ডে বাস করে এবং একই ভাষা-সাহিত্য, ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে আবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাপর জাতি ও রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট থাকে। যদিও জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তথাপিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। যেমন -

(i) **Prof. Zimmern** বলেন, "Nationality is a form of corporate sentiment of peculiar intensity intimacy and dignity related to a definite territory. A nation is that collectivity which is inbuad with this sentiment." (কোন নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

আবাসভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সংঘবদ্ধভাবে বিশেষ অন্তরঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ এক মর্যাদাযুক্ত অনুভূতির প্রকাশই জাতীয়তাবোধ। এ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই জাতি।)

(ii) **R. M. Maclver** তাঁর 'The Modern State' গ্রন্থে বলেন, "জাতি হল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্ম চেতনা সম্বলিত জনসমষ্টির সম্প্রদায়গত মনোভাব যা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনা করে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে চায়।"

(iii) **Lord Bryce** জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে, "A nation is a nationality which has organised itself into a political body, either independent or desiring to be independent." (জাতি হল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত বহিঃশাসন হতে মুক্ত অথবা মুক্তিকামী একটি জনসমাজ)

(iv) **R.N. Gilchrist** বলেন, "Nation is the state plus something else, the state looked of from certain point of newsiz, that of the unity of the people organised into one state."

(v) জাতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন **Prof. Hayes.** তিনি বলেন, "A nationality by acquiring unity and sovereign independence becomes state." (একটি জাতীয় জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জন করে জাতিতে পরিণত হয়।)

(vi) **বার্জেস** (Burgess) বলেন, "A nation is a population of an ethnic unity, inhabiting a territory of a geographical unity, ethnic unity means a population having common language and literature, a common custom and common consciousness of right and wrong." অর্থাৎ একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি যদি একই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, একই আচার-আচরণ ও ন্যায়-অন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাকে জাতি বলে।

উপরে নির্দেশিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে জাতি বলতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এমন জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিতে বসবাস করে। জাতি হয় স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামে রত।

জাতীয়তাবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Nationalism

জাতীয়তাবাদের ইংরেজি শব্দ Nationalism যা ল্যাটিন শব্দ *Natio* বা *Natus* থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যাদের অর্থ Birth বা জন্ম। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হল কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে জনসমষ্টির একাত্মবোধের প্রকাশস্বরূপ।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একে মানসিক ঐক্যানুভূতি হিসেবে দেখেছেন। যেমন – **C. L. Lioyd** মন্তব্য করেছেন, "Nationalism is the religion of the modern world." আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একে প্রাচীন

www.pathagar.com

ভাবের আধুনিক অনুভূতিপ্রবণ সংমিশ্রণ ও অতিরঞ্জন বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন -

(i) **Hans Kohn** তাঁর 'The Idea of Nationalism.' গ্রন্থে বলেন, "Nationalism is first and formost a state of mind, an act of consciousness." (জাতীয়তাবাদ মূলত এক মানসিক অবস্থা, এক প্রকার সচেতনতা।)

(ii) **Hayes** বলেন, " Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very cold phenomena - nationality and patriotism."

(iii) **Lioyd**'র মতে, "Nationalism may be called a religion because it is rooted in the deepest instincts of man." (জাতীয়তাবাদকে একটি ধর্ম হিসেবে অভিহিত করা যায়, কারণ এর উৎস মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত আছে।)

(iv) **L. L. Snyder**-এর মতে, "Nationalism is a product of political, economic, social and intellectual factors at a certain stage in history is a condition of mind, feeling of sentiment by a group of people living in a well defined geographical area." (জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্ম চেতনার ফলশ্রুতি। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির মানসিকতা, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার ফল।)

(v) **Lord Bryce** বলেন, "A nationality is a population held together by certain ties, as for example Language and literature, ideas, customs and traditions in such a way so as to feel itself a coherent unity distinct from other population similarity held together by like ties of their own."

(vi) **N. J. Padelford and Lincoln** বলেন, " Nationalism is an amalgam of two elements; an ideology embroidered about the idea of nationality and the institutionalisation of that ideology in to national stage"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাবাদ একটি ভাবগত বা মানসিক ধারণা–যা একটি জনসমষ্টির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ বা স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে। কোন জনসমাজ যখন ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবোধের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (১) নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ এবং (২) বিশ্বের অন্যান্য জনসমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদের উপাদান
Elements of Nationality or Nationalism

জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাজনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation-state) উদ্ভব এবং এ জাতীয় রাষ্ট্রই বিশ্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। যে সকল উপাদান একটি জনসমাজকে জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত করে সে সকল উপাদানকে জাতীয়তার উপাদান বলে। আর এ

www.pathagar.com

উপাদানগুলো জাতীয় জনসমাজকে জাতি গঠনে সহায়তা করে। যে কোন সমাজে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে দ্বিবিধ উপাদানের সংমিশ্রণে। যথা : ভাবগত উপাদান ও বাহ্যিক উপাদান। এ সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity) : জাতীয়তাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ভৌগোলিক ঐক্য। কোন একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি জনসমষ্টি যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এর ফলে ঐ জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যানুভূতি গড়ে ওঠে। জাতি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করা বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে Ramsay Muir-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "একটি স্বতন্ত্র জাতি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে। কেননা, একই সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করার ফলে একটি জনসমাজ তার নিজস্ব অভ্যাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠানের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।"

বংশগত ঐক্য (Racial Unity) : জাতি গঠনের একটি শক্তিশালী উপাদান হল বংশগত ঐক্য। কোন জনসমাজ যখন বিশ্বাস করে যে, তাদের শিরা-উপশিরায় একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অভিন্ন তখন স্বভাবতই তাদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি দেখা দেয়। রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে একাত্মতার ভাব গড়ে তোলে যা গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। তবে জাতি গঠনের জন্য এ উপাদানটি একান্ত আবশ্যক নয় বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হল একই বংশোদ্ভূত হয়েও অনেকেই জাতি হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে নি। যেমন– আরবের লোকেরা একই বংশোদ্ভূত। কিন্তু তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। আবার জার্মান, ইংরেজ একই বংশোদ্ভূত হয়েও তারা স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের অনুসারী। আমরা বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী।

ভাষা ও সাহিত্যের ঐক্য (Unity of language and Literature) : মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। তাই ভাষার মাধ্যমে একটি জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। ভাষা সাহিত্যের ঐক্য বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জনগণের মধ্যে ঐক্যানুভূতি জাগ্রত করে। যেমন– বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। তবে ভাষাগত ভিন্নতা জাতি গঠনের প্রতিবন্ধক নয়। কারণ, সুইজারল্যান্ডের জনগণ তিনটি ভাষায় কথা বলে, রাশিয়ার জনগণ পাঁচটি এবং চীনে বহুভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পেরেছে। অপরদিকে আরবীয়দের ভাষা আরবি হওয়া সত্ত্বেও তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নি।

ঐতিহ্যগত ঐক্য (Cultural Unity) : প্রচলিত রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্যও জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। Burns-এর মতে, রক্তের অভিন্নতা অপেক্ষা একটি যৌথ স্মৃতি একটি যৌথ আদর্শ জাতি গঠনে অধিকতর সহায়তা করে। তবে **Ramsay Muir** এবং রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **J. S. Mill** ঐতিহ্যগত উপাদানকে জাতি গঠনের জন্য অনাবশ্যক বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

ধর্মীয় ঐক্য (Community of Religion) : একই ধরনের ধর্ম বিশ্বাস জনসমষ্টিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজনীতির বিশ্লেষণে এর নজির পাওয়া যায়। যেমন– ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই ভারতীয় মুসলমানগণ প্রথমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতীয় জনসমাজে সংঘবদ্ধ হয়েছেন এবং ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে "Two Nation Theory"-এর ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে। G. Lioyd বলেন "The possesion of common religion has been extremely important in creating nation-state."

রাষ্ট্রীয় সংগঠন (Political Organisation) : দীর্ঘদিন ধরে কোন জনসমষ্টি একই শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা ক্রমান্বয়ে লোপ পায় এবং ঐক্যবোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৩টি কলোনি তাদের প্রাচীন সত্তা জার্মান, ইংরেজ, পোলিশ ইত্যাদি হারিয়ে আজ আমেরিকান জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আবার দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছে।

অর্থনৈতিক ঐক্য (Economic Unity) : অর্থনৈতিক বন্ধনও জাতীয়তাবাদের একটি অন্যতম উপাদান। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটি আন্তরিক বন্ধন প্রয়োজন যাতে জাতির বিভিন্ন অংশ একই পূর্ণতার মধ্যে গ্রোথিত হয়। মানুষ সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলনে লিপ্ত হয় এবং সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজে বসবাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

মানসিক ভাবগত ঐক্য (Feeling of Meness) : ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Reman-এর মতে, জাতীয় জনসমাজ সম্পর্কে ধারণা মূলত ভাবগত। জনসমাজের মধ্যে মনোগত একাত্মবোধের অস্তিত্ব জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান। যেমন— **Prof. Laski** মন্তব্য করেন, ব্যাপক অর্থে জাতীয়তার ভাব বস্তুত মানসিক ব্যাপার। আবার, **R.C. Gettell**-এর মতে "জাতীয়তা আসলে একটি ভাবগত ব্যাপার, একটি মানসিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, চিন্তা এবং অনুভূতির একটি পদ্ধতি।"

জাতি ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Nation and Nationalism

জাতি ও জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাগুলো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা নেই। কারণ উভয় শব্দই Latin word 'Natio' ও 'Natus' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে–যাদের অর্থ Birth বা জন্ম।

কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যেমন–নিচের সমীকরণ থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়।

জনসমাজ (People) = একই ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত জনসমষ্টি।

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) = জনসমাজ + রাজনৈতিক চেতনা।

জাতি (Nation) = জাতীয় জনসমাজ + রাজনৈতিক সংগঠন।

www.pathagar.com

Lord Bryce বলেন, "রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত বহিঃশাসন থেকে সর্বপ্রকার মুক্ত অথবা মুক্তিকামী একটি নির্দিষ্ট জনসমাজকে জাতি বলা হয়।" আবার **Stalin**-এর ভাষায়, "ভাষা, আবাসভূমি,অর্থনৈতিক জীবন আর নির্দিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে ব্যক্ত মননভঙ্গি–এই উপাদানগুলোর সহযোগে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত একটি স্থায়ী জনসমষ্টি হল জাতি।"

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে **Lord Bryce** বলেন, "Broadly speaking the idea of nationality essentially is spiritual." **Hans Kohn**- এর মতে, "জাতীয়তাবোধ মূলত এক মানসিক অবস্থা এবং এক প্রকার সচেতনতা।"

উল্লিখিত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায় যে,

(ক) জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন অত্যাবশ্যক কিন্তু জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক সংগঠন অনুপস্থিত।

(খ) জাতি সংঘবদ্ধভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সুসংহত নয়।

(গ) জাতি একটি মূর্ত ধারণা। কিন্তু জাতীয়তা বিমূর্ত ধারণা।

(ঘ) জাতি একটি পরিপূর্ণ রূপ। আর জাতীয়তা জাতির প্রাথমিক অবস্থা মাত্র।

জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও উভয়েই সমার্থবোধক হিসেবে পরিচিত। জাতিকে সুদৃঢ় করতে উপরে নির্দেশিত উপাদানগুলোর সুষম সমন্বয় একান্তই অপরিহার্য। সে সাথে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত ও রক্ষাকল্পে উভয়ের সুস্পষ্টতা একান্তই কাম্য।

জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী?
Is Nationalism Antithetical to Internationalism?

জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে পরিগণিত। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভবের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদ বিশ্ব ইতিহাসকে নব ধারায় প্রবাহিত করেছে। ছোট-বড় সকল দেশ ও রাষ্ট্রে জাতীয়তাবোধকে সামাজিক মানুষ ও নাগরিকের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্দেশ করা হয়। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতা বিশ্ববাসীর মধ্যে একাত্মতা ও মিলনের চেতনাকে জাগ্রত করে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদই হল আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু অনেকেই বলেন জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতবাদের পরিপন্থী। সুতরাং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্ন একটি বিতর্কিত প্রশ্ন।

জাতীয়তাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Nationalism (Nationality) ল্যাটিন শব্দ Natio and Natus থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। Natio and Natus- অর্থ Birth বা জন্ম। জাতীয়তাবোধ থেকে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি। জাতীয়তাবোধ জাতীয় কৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদ মূলত মানসিক অবস্থা এবং এক ধরনের চেতনা। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জাতীয়তাবাদ মূর্তরূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে বলা হয় যে, বর্তমান বিশ্বে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্ণধারগণ পর্যন্ত সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই প্রত্যেকের প্রধান দায়িত্ব। আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বের সকল জনগণকে ঐক্য ও মিলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। **Goldsmith** বলেন, "ব্যক্তি কেবল তার রাষ্ট্রের সদস্যই নয়; বরং বিশ্বের নাগরিক" এ অনুভূতিই আন্তর্জাতিকতাবাদ।

বর্তমান বিশ্বের জাতিগুলো নিজেদের পৃথক পৃথক জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির লক্ষ্যে অন্যান্য জাতির সাথে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী?

আপাতদৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দার্শনিক মহলের অনেকেই এ দুটি আদর্শের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তির অন্তরায়। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী। এ প্রশ্নের জবাবে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পক্ষে অবস্থান দিয়েছেন এবং উপযুক্ত যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। আবার একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন।

সপক্ষে যুক্তি

প্রথমত, জাতীয়তাবাদ এমন একটি আদর্শ যা একটি জনসমষ্টিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করে এবং অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে পৃথিবীর বিপুল জনসমষ্টি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে স্বতন্ত্র এলাকা গড়ে তোলে, যাকে বলা হয় জাতি। আর আন্তর্জাতিকতাবাদ কোন স্বাধীন সার্বভৌম জনসমষ্টিকে জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে ওঠে বিশ্বের জনসমষ্টির সাথে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করে বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদ সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়াসী। জাতীয়তাবাদ জাতীয় গৌরব গাঁথা ধরে রাখতে সচেষ্ট। আর আন্তর্জাতিকতাবাদ সকল জাতির আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করে। সুতরাং বলা যায় আন্তর্জাতিকতাবাদে জাতীয়তাবাদ লয় হয় না বরং সম্প্রসারণ ঘটে।

তৃতীয়ত, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। বিশ্ববাসী আজ আঞ্চলিক জোটবদ্ধ কিম্বা আন্তর্জাতিক জোট বদ্ধ। এ জোটবদ্ধতার উদ্দেশ্য হল জাতীয়তাবাদকে সংরক্ষণ করে আন্তর্জাতিক হওয়া। মানুষের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম ইত্যাদির উন্নতির পূর্বশর্ত হল শান্তি ও সুস্থিতি। তাই জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ শান্তির অন্বেষায় সহযাত্রী।

বিপক্ষে যুক্তি

অনেকেই মনে করেন জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। যার দৃষ্টান্ত পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদের নগ্ন বহিঃপ্রকাশের কারণে। আগামী বিশ্ব হয়তো আর একটি তৃতীয় মহাসমরের অশনি সংকেত শুনতে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রথমত, জাতীয়তাবাদের চরম ধারণা আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারণা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের বিভেদকে বাড়িয়ে তুলেছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জাতিসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়ে তুলছে ,অন্যদিকে অপর রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে। শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব থেকে এ চরমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ফলে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটার ফলে বিশ্ব পর পর দুটি মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। যুদ্ধের ফলে বিশ্বশান্তি ধূলিসাৎ হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। মাঝে মাঝে বৃহৎ শক্তিগুলো (Super-power) বিশ্বশান্তির বুলি আওড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রকে মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে। অথচ নিজেরা সেগুলো অবলীলায় করে যাচ্ছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় জাতীয়তাবাদের আদর্শ কখনোই আন্তর্জাতিক শান্তি বয়ে আনতে পারে না।

উপর্যুক্ত বিশদ আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শ নিজ নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে ওঠে সকল জাতির সাথে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করে বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন চরম আকার ধারণ করে এবং সম্প্রসারনবাদী হয়ে ওঠে তখন আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীতে চলে যায়–বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার পথে একটি হুমকি?
Is it a Menace to Civilisation?

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরাধীনতা আর শোষণের শৃঙ্খল ভেদ করে স্বাধীন হয়েছে; বিশেষকরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর পতনে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত জাতীয়তাবাদে আমরা দুটি রূপ দেখতে পাই। একটি হল জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ যার সংস্পর্শে একটি জাতি মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন সত্তাকে উপভোগ করার সুযোগ পায়; আরেকটি হল বিকৃতরূপ যার দংশনে একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ করতে হয়। আর তখনই জাতীয়তাবাদ সভ্যতাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ

জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ মানুষের সুসভ্য জীবনব্যবস্থা নিশ্চিত করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা : গণতন্ত্র এমন এক শাসন পদ্ধতি যেখানে সকল জনগণের সমান অংশ রয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনগণ সমঅংশীদারিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

ঐক্যবন্ধন : জাতীয়তার চেতনা জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। জাতীয়তাবাদের আদর্শ একটি জনসমাজকে সকল সংকীর্ণতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা যোগায়।

বিশ্বসভ্যতার সমৃদ্ধি সাধন : প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনা বিশ্ব মানবের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। একটি জাতি জাতীয়তার আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হলে তা বিশ্বমানবের জন্যও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি এবং পরে বিশ্ব সমৃদ্ধি।

দেশপ্রেম জাগ্রত করে : জাতীয়তাবাদের আদর্শ একটি জাতির মননে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। তাই প্রকৃত জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে জনগণের মধ্যে দেশমাতৃকার বহ্নি ছড়িয়ে দেয়।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় : প্রকৃত জাতীয়তাবোধের আরেক ভাল দিক হল অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানের সাথে সাথে তা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদী আদর্শের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

জাতীয়তাবাদের বিকৃতরূপ

সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত : বিকৃত জাতীয়তাবাদ স্বার্থবাদীদের স্বার্থ চরিতার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য করে অপরাপর জাতির উপর বিভিন্ন কৌশলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলো বিদেশে বাজারের সম্প্রসারণ, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিদেশে বিনিয়োগের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। যেমন - ইউরোপীয় বণিকেরা এশিয়া মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সীমারেখাকে সীমিত করে জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রবাহে দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে : উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। যেমন : জার্মান উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই জাতীয়তার বিকৃত রূপ কোন অর্থেই জাতির জন্য কল্যাণকর নয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হয় : জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবকিছুই জাতীয়তাবাদের কষাঘাতে পদদলিত হয়। ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সকল উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বশান্তির পরিপন্থী : জাতীয়তাবাদ বর্তমানে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোকে সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে যা শান্তিময় পরিবেশ ও উন্নতির পরিপন্থী। এরূপ অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মোকাবিলায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। সেইসাথে অস্ত্র তৈরিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উগ্রজাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয় এবং অনুন্নত জাতিসমূহের উপর শোষণের স্টীমরোলার চালায়। বিশ্বের বিলুপ্ত হওয়া ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

শোষণের দিকে দৃষ্টি দিলে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত রূপ ধারণ করে তখনই তা সভ্যতার পথে হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

উম্মাহর অর্থ ও সংজ্ঞা
Ummah : Meaning and Definition

জাতি, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকবাদ সম্পর্কে উপরে আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ হল। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে এক অতি উত্তম, কল্যাণকামী এবং চিরস্থায়ী শান্তির ধারণা দিয়েছে যা নিম্নের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উম্মাহ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ জাতি, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় আবার কখনো কখনো নিয়ম পদ্ধতি বা শরীয়ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোন বিশেষ বিশেষ নীতি, আদর্শ, চিন্তাচেতনা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সংগঠিত বা ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে উম্মাহ বলে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে নবী-রাসূলের অনুসারী বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিকে উম্মাহ বলে। উম্মাহ এর সংজ্ঞায় আব্দুল রশিদ মতিন বলেন, "Ummah is a Universal order enclosing the entire collectively of Muslims inhabiting the globe, united by the bone of one strong and comprehensive ideology of Islam. It is indispensable for the actualisation of the divine will in space time and for the achievement of happiness in this world and salvation in the hereafter." তবে পবিত্র কোরআনে উম্মাহ শব্দটি কখনো বিশ্বমানব অর্থে আবার কখনো নবী-রাসূলের অনুসারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন – হযরত মুসা (আ) এর অনুসারীদের উম্মাতে মুসা, আবার ঈসা (আ) এর অনুসারীদের উম্মাতে ঈসা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে বিশ্বনবীর নবুয়্যাত বিশ্বজনীন হওয়ার কথা কোরআনে ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিতে উম্মাহর তিনটি পর্যায় রয়েছে।

প্রথমত, বিশ্বমানব একই উম্মাহ : পবিত্র কোরআনে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে এক ও অভিন্ন উম্মাহ বা জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে "মানব জাতি একই উম্মাহ ছিল, অতঃপর তাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার ও সতর্ক করার জন্য আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন।" (বাক্বারা – ২১৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই উম্মাহ করতে পারতেন।" কোরআনে বর্ণিত এই উম্মাহের মর্মার্থ সম্পর্কে অনেক তাফসীরকারক হযরত আদম (আ) হতে হযরত ইদ্রিস (আ) কিংবা নূহ (আ) পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষ একমাত্র তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। ঐ সময়ে একত্ববাদ বিরোধী কোন মতাদর্শের উদ্ভব হয়নি। এই অর্থে ঐ সময়ে বিশ্বের সমগ্র মানুষ একটি অখণ্ড জাতি (উম্মাহ) ছিল। যেমন – কোরআনের ঘোষণা "তোমরা মূলত একই দলভুক্ত আর আমি তোমাদের প্রভু। অতএব আমাকেই ভয় করে চল।" (মুমিন – ৫২)

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, কোন নবীর উম্মাহ : পবিত্র কোরআনের বর্ণনানুযায়ী প্রত্যেক নবী-রাসূলের স্বতন্ত্র উম্মাহ ছিল। যেমন— "প্রত্যেক উম্মাহর জন্য একজন রাসূল আছেন।" (ইউনুস – ৪৭)। অন্যত্র বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি রাসূল প্রেরণ করেছি।" (নাহল–৩৬)

মহান আল্লাহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতির মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ তাদেরকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য দিক নির্দেশক হিসাবে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন যারা ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারক হিসাবে সেই সময়ের লোকদেরকে হেদায়েত করেছেন—হযরত ইব্রাহীম (আ) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত (হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়া) সকলেই একটি বিশেষ সময়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের সকলকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ তারা সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদি দূর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তৃতীয়ত, বিশ্বনবীর বিশ্বজনীন উম্মাহ বা মুসলিম উম্মাহ : সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পূর্বের নবী বা বিশেষ সময়ের রাসূলদের ন্যায় কোন একটি বিশেষ এলাকা/জনপদের কিংবা বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হননি। বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির জন্য রহমত ও সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা "আমি আপনাকে [মুহাম্মদ (স) কে] নিখিল বিশ্বের সকল মানুষের শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি" (সাবা – ২৮)। এ সম্পর্কে স্বয়ং বিশ্বনবীর ঘোষণা "অন্যান্য নবীগণ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিল, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের নিকট।" সুতরাং বিশ্বনবীর আগমনের ফলে উম্মাহ তার ভৌগোলিক সীমারেখা, বর্ণ-ভাষা গোত্র ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বজনীন উম্মাহর রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমানে বিশ্বজনীন উম্মাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে সকলেই এই উম্মাহর সদস্য। আল্লামা ইকবালের ভাষায় "Islam Tromunds all geographical boundar" ভাষা, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকল মুসলমান একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আর সেটি হচ্ছে এক আল্লাহ, কোরআন ও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

মুসলিম/ শ্রেষ্ঠ উম্মাহর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Muslim Ummah

পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে মুসলিম উম্মাহর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয়।

১. বিশ্ব শ্রেষ্ঠ উম্মাহ : মুসলমান তথা শেষ নবীর অনুসারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হওয়ার কারণ ত্রিবিধ। যথা – (ক) মুসলিম উম্মাহর নবী শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। (২) এই উম্মাহর ঐশী গ্রন্থ আল কোরআন যা সকল ঐশী গ্রন্থের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। (গ) এই উম্মাহর উপর দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হওয়ার প্রমাণরূপ আল্লাহ তায়ালার বাণী "তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজের নিষেধ করবে। আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।" (আল ইমরান – ১১০)

www.pathagar.com

২. উচ্চ মর্যাদার অধিকারী : মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য নবীদের উম্মাহর চেয়ে এমনকি কোন কোন জাতির নবীদের চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী। কারণ মুহাম্মদ (স) ছাড়া অন্য সকল নবী নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। একজনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা অপর নবীকে প্রেরণ করতেন। অথচ মুহাম্মদ (স) শেষ নবী এবং তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। তাই পূর্ববর্তী সময়ে পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ পথের সন্ধান দেয়ার গুরুদায়িত্ব নবীদের উপর অর্পিত হত, যে দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা শেষ নবীর উপর অর্পণ করেছেন যার নির্দেশনা পূর্বোক্ত আয়াতে বিধৃত আছে। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ যে কোন জাতির নবীদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন, "আমার উম্মাহর আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী।"

৩. মধ্যমপন্থী উম্মাহ : মুসলিম উম্মাহর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মধ্যমপন্থী উম্মাহ। আর এর অর্থ হল জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা। যেমন- পবিত্র কোরআনের ঘোষণা – "এভাবে আমি তাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ করেছি" (বাক্বারা – ১৪৩)। মুসলিম উম্মাহ মধ্যমপন্থী এজন্য যে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাহরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে বিশ্বনবীর উম্মাহ তা যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক মুসলিম মনীষী ও তাফসীরকারক এই মধ্যমপন্থার কয়েকটি বাস্তব ও ব্যবহারিক দিকের উল্লেখ করেছেন। যেমন –

(ক) ঈমানের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা : ঈমান তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের উম্মাহরা তাদের নবীকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা করতে শুরু করেছে। যেমন – কোরআনের ঘোষণা – "ইহুদিরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র, খ্রিস্টানরা বলেছে ঈসাই আল্লাহর পুত্র।"

অন্যদিকে এসব উম্মাহের অনেকেই তাদের নবীর সুস্পষ্ট মোজেযা দেখা সত্ত্বেও নবীরা যখন তাদের ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছে তখন তারা বলেছে আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। আবার কখনো কখনো নবীদেরকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতে নির্যাতিত লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। তারা একদিকে যেমন বিশ্বনবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করেছে এবং নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জাত-আবরু সব কিছু বিসর্জন দিতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না অন্যদিকে তেমনি রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। তারা আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা ও গুণকীর্তণের ক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক সীমার মধ্যে থাকে।

(খ) কর্ম ও ইবাদতে মধ্যমপন্থা : ঈমানের পরেই আসে আমল ও ইবাদত। এক্ষেত্রেও বিশ্বনবীর পূর্ববর্তী উম্মাহরা শরীয়তের বিধি-বিধানকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, কিংবা ঘুষ, উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থকে পরিবর্তন বা মিথ্যা ফতোয়া জারি করে বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে। এমনকি তাদের উপাসনালয়ে সংসারধর্ম ত্যাগী বৈরাগীদের দেখা যায়। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল বস্তু থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকে সওয়াব ও ইবাদত মনে করে।

www.pathagar.com

অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ বৈরাগ্যসাধনকে মানবতার প্রতি জুলুম মনে করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মাঝে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি। হাট-মাঠ, অফিস, আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তারা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী কিংবা ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

(গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা : সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী উম্মাহ একদিকে যেমন মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছে অন্যদিকে তেমনি ন্যায়-অন্যায়ের প্রতি কোনরূপ বাচবিচার করেনি। স্বার্থের প্রশ্নে, নিপীড়ন, হত্যা, লুণ্ঠন করাকে বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। কারণে অকারণে জাতিতে জাতিতে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হয়েছে এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটেছে। নারীর প্রতি চরম অবজ্ঞা, কন্যাশিশু জীবন্ত প্রোথিতকরণ, মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করা হত। জীব-হত্যাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করে তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল প্রাণীর মাংস ভক্ষণকে অন্যায় মনে করত।

বিপরীতে মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের শরীয়ত এরূপ ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়ে মানবাধিকারকে সমুন্নত করেছে; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে। ক্ষমা, ত্যাগ, অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নবান প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা যৌক্তিক সীমার মধ্যে অবস্থান করেছে।

(ঘ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অপরাপর জাতির মধ্যে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। পুঁজিবাদ সে তো অভিশাপ; যেখানে হালাল-হারাম এবং অন্যের সুখ-শান্তি, দুঃখ-দুরবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়াকে সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য মনে করা হয়। আর সমাজতন্ত্র সে তো আত্মার বন্দিশালা। এতে ব্যক্তিমালিকানাকে অপরাধ জ্ঞান করা হয়। এখানেও ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য মনে করা হয়।

কেবল মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের শরীয়তই এক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়াকে জীবনের লক্ষ্য মনে করে না এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকেও বড় মনে করে না। অন্যদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয় সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় এনেছে। আর বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি যৌক্তিক সম্মান দেখিয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত হালাল সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। সম্পদ বণ্টনের সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা যথাযথ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সম্পদ কোন একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং অন্যরা বঞ্চিত না হয় বা সম্পদহীন না হয়। এ সম্পর্কে আল কোরআনের সূরা নেসাতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে কিভাবে পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

www.pathagar.com

৪. বিশ্বাসী উম্মাহ : মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর সকল সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। নবী-রাসূল, আসমানী গ্রন্থ, ইহকাল, পরকাল, পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার সকল কিছুর উপর দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস স্থাপন মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্বাসের ভিত্তি আল কোরআন ও রাসূলের হাদিস।

মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
Duties of Muslim Ummah

উম্মাহ বা ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি ও জাতীয়তার উপরিউক্ত অর্থ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, বাসস্থান বা জন্মস্থানকেন্দ্রিক গড়ে উঠা জাতি ও জাতীয়তা হয় খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কারণ এখানে বিদেশিরা চিরদিন বহিরাগত হিসেবে বাস করবে যদিও তাদের ভাষা, ধর্ম, চিন্তা চেতনা অভিন্ন হয়। সুতরাং এরূপ জাতীয়তা কখনও বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। বিদেশিরা বহিরাগত হিসেবে পরিচিত হয় এবং দেশি-বিদেশির মাঝে সর্বদা দ্বন্দ্ব-বিরোধ লেগেই থাকে। তাই এই জাতীয়তা পরস্পরকে স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু আদর্শগত কারণে দুই অপরিচিতের মাঝে ঐক্যের বন্ধন স্থাপিত হতে পারে। ইসলাম ভাষা, বর্ণ, গোত্র, শিক্ষা, জন্মস্থানগত সংকীর্ণ জাতীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি হল একটি আদর্শ ও বিশ্বাস। আর এ আদর্শ ও বিশ্বাস হল ইসলাম। এই আদর্শভিত্তিক মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় নিছক একটি জাতি নয়; বরং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এ জাতির সৃষ্টি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. সত্যের সাক্ষ্য দান : ইসলামী উম্মাহর প্রথম দায়িত্ব হল সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এমনিভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা বিশ্বমানবের জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রাসূল তোমাদের সাক্ষী হতে পারেন"। (বাক্বারা – ১৪৩)। সর্বশেষ নবীর উম্মাহ হিসেবে সমগ্র মানব সমাজকে হেদায়েত ও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্বও উম্মাহর উপর বর্তিয়েছে।

২. সৎ কাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ : মুসলিম উম্মাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। যেহেতু পৃথিবীতে আর কোন নবী-রাসূল আসবে না এবং মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাই তাঁর অবর্তমানে তাঁর এ সত্যের মিশন তাওহীদ ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গুরুদায়িত্ব তারই সুযোগ্য উম্মাহর উপর অর্পিত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "তোমারই সর্বোত্তম উম্মাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে অসৎ কাজে বাধা দেবে। এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান আনবে।" (ইমরান–১১০)

৩. মানবতার কল্যাণ সাধন : মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের দায়িত্ব হবে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেখানে নিজেদেরকে ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতা লাভ কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রাখে, সেখানে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের মানবের কল্যাণে নিয়োজিত রাখে।

www.pathagar.com

৪. ইসলামের প্রচার ও প্রসার : মুসলিম উম্মাহর আরেকটি গুরুদায়িত্ব ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এ প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে মহানবী বলেছেন "আমার এ বাণী অনাগত বিশ্ব মানবমণ্ডলীর কাছে পৌছে দিও।" স্বীয় উম্মাত তাঁর এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ইসলামকে বিশ্বময় প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর এ প্রচারাভিযান আজও অব্যাহত গতিতে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

৫. সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলাম সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হল ইসলামের মূলনীতির আলোকে বৈষম্যহীন ন্যায়-নীতিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেই সাথে সমাজের সকল প্রকার অসাম্য-বৈষম্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। ইসলামের মূলনীতিই হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সকল মুসলমান ভাই ভাই, উঁচু নিচু ভেদাভেদ নেই।

৬. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা : বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাও মুসলিম উম্মাহর অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্বব্যাপী যত জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন বিদ্যমান আছে কঠোর হস্তে এর মূলোৎপাটন করে কোরআন সুন্নাহর আলোকে শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সংঘর্ষের বা জোর জুলুমের নয়। তাই যারা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী তারা কখনও মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া, ফ্যাসাদে বিশ্বাস করতে পারে না এবং তা তারা করবেও না এবং অন্যদেরকেও তা করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে উপরের আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, অপরাপর উম্মাহর চেয়ে মুসলিম উম্মাহর উপর অধিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে একদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। কাজেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়া, দায়িত্বে অবহেলা কিংবা ফাঁকি দেয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণায় এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু তাই নয় আধুনিক জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে আবদ্ধ। যেহেতু ইসলাম ধর্ম হিসেবে সর্বজনীন এবং এর আহবান সর্বকালীন সকল মানুষের জন্য তাই এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলাম কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠির জন্য নয়, নয় কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ সময়ের জন্য। এটা সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং সর্বস্থানের।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. জাতির সংজ্ঞা দাও। জাতি বা জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা কর।
[Define Nation. Discuss it elements.]

২. জাতীয়তার সংজ্ঞা দাও। জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা কর।
[Define Nationalism. Discuss the elements of Nationalism.]

৩. উম্মাহ কি? উম্মাহর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
[What is Ummah? Discuss the Characteristics of Ummah.]

৪. উম্মাহ কি? মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা কর।
[What is Ummah? discuss the Duties of Muslim Ummah.]

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদ
Secularism

[প্রাক-কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ও প্রকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও বিকাশ, মুসলিম বিশ্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষবাদ]

প্রাক-কথা
Introduction

ধর্মনিরপেক্ষবাদ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার মৌলনীতির অন্যতম হিসেবে পরিগণিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তী বিশেষত ইউরোপিয় রেনেসাঁর ফলে সৃষ্ট এই মতবাদ প্রথমত ইউরোপে এবং পরবর্তীতে ইহুদি, খ্রিস্টান ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে আধুনিককালে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর বাস্তব প্রতিফলন লক্ষণীয়। সেকুলার রাষ্ট্রদর্শনের আরেকরূপ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষবাদ (Secularism)। তবে এ মতবাদ বিশ্ব মানবের জন্য অভিশাপস্বরূপ। এর সর্বনাশী বিষক্রিয়ায় বিশ্ব আজ দ্বিধাবিভক্ত, উত্তপ্ত, অশান্ত। এ মতবাদকে ভিত্তি করেই বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে অধার্মিক কর্মকাণ্ড চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য হল ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। সহজ কথায় ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ 'ধর্মহীনতা'।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ও প্রকৃতি
Meaning and Nature of Secularism

ইংরেজি Secularism এর বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষবাদ। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Secularis থেকে যার অর্থ, বৈষয়িক, আদি, অস্থায়ী। আর Secular এর অর্থ হচ্ছে পার্থিব বা ইহজাতিক (জড়জাগতিক, লোকায়ত)। Secularism হল ধর্মহীন ইহবাদ বা ধর্মহীন জাগতিক মতবাদ। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

Random House Dictionary of the English Language-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

(i) Not regarded as religious of spiritually sacred (যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিক পবিত্র বলে বিবেচিত হয়)।

(ii) Not Partaining to and Connceted with religion. (যা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়)।

(iii) Not belonging to or It is a Social and Political philosophy that

www.pathagar.com

rejects all forms of religious faith (যা কোন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয়, বা এটি একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক দর্শন যা ধর্ম বিশ্বাস নাকচ করে দেয়।)

Oxford Dictionary'র সংজ্ঞা অনুযায়ী "Secularism means the doctrine that morality should be based solely of regard to the wellbeing of mankind in the present life to be exclusion of all considerations drawn from belief in God or in future state."(ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ এমন এক মতবাদ, যা সৃষ্টিকর্তা বা পারলৌকিক বিশ্বাস নির্ভর বিবেচনা মুক্ত থেকে মানব জাতির বর্তমান কল্যাণকর জীবন চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।'

Encyclopaedia of Britanica এর বর্ণনানুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের অন্তর্গত নয়, ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতা বিরোধীদের বুঝানো হয়েছে।

ড. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এর 'রাজনীতির অভিধান' গ্রন্থের ভাষ্যানুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি দর্শন বা মনোভঙ্গি যার পশ্চাতে অতিপ্রাকৃত বা ঐশী শক্তির স্থান নেই। ইহজীবন সর্বস্ব এই প্রত্যয় অনুযায়ী ব্যক্তিমানুষ তার সহজাত যুক্তিবোধের সাহায্যেই নিজের আচরণ ও জীবনযাত্রার বিধি-বিধান নির্ধারণে সক্ষম। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায় নিরীশ্বরবাদী কিন্তু মানবতাবাদের সমার্থক।

Secular State এর বর্ণনা দিতে গিয়ে D.E Smith বলেন, The Secular State is a state which guarantees of religion, deals with individual as Citizen irrespective of his religion in not Constitutionally Connected to a particular religion nor does it seek either to promote or infergere with religion".(ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন রাষ্ট্রকে বুঝায় যা ধর্মের নিশ্চয়তা বিধান করে, ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না, ধর্মের উন্নতিও চায় না কিংবা ধর্মের উপর হস্তক্ষেপও করে না। India as a secular state).

ধর্মনিরপেক্ষতার উপরিউক্ত বর্ণনানুযায়ী বলা যায় রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে ধর্মমুক্ত শাসন এবং রাষ্ট্রকর্তৃক কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা অবহেলা না করে নিরপেক্ষ থাকা। আর ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণে নিধর্ম ব্যক্তি যিনি নিজে কোন ধর্মের অনুসারী নন এবং কোন ধর্মানুসারীর পক্ষেও নন। কিন্তু বাস্তব জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যা অর্থহীন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী'র মতে, ধর্ম নিরপেক্ষতা কেবল কিছু খারাপই নয়, এটি সত্য বিধ্বংসী ইবলিসী কালিকূট।

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও বিকাশ
Origin and Development of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে নিহিত। এই ইহজাগতিক মানবতন্ত্রী মতবাদের উত্থান এবং রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে

www.pathagar.com

ইউরোপীয় সমাজে Secularism এর প্রসার ঘটে। একদিকে খ্রিস্টধর্ম যাজক বা পোপের আধিপত্য, অপরদিকে জাগতিক তথা রাষ্ট্রীক শাসনের উপর গুরুত্বারোপ। অর্থাৎ মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম ও যাজকদের যে একচেটিয়া আধিপত্য-তার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী মতবাদ Secularism এর উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসারের সাথে সাথে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান তথা মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ সুগম হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, আর রাজতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। অর্থাৎ সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী খ্রিস্টধর্ম ও যাজক সম্প্রদায়ের অধিপত্যের ফলে ধর্মের নামে অধার্মিক কার্যকলাপ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল, এর ফলে ধর্মের সাথে রাজনীতির দ্বন্দ্ব সহজ কথায় গির্জার সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ ঘটে। এ মতবাদের উত্থাপনের ফলে দীর্ঘ দু'শত বছরের খ্রিস্টধর্ম যাজক ও রাজশক্তির মধ্যকার বিরোধের অবসান ঘটে। উভয়ের মধ্যে আপস প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্মে যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়। এ বিষয়ে চার্চ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; বিপরীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে রাষ্ট্র সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক ইতালীয় চিন্তাবিদ মেকিয়াভেলিই সর্বপ্রথম রাজনীতিকে ধর্মীয় বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব থাকা উচিত নয় বলে মত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে হবস, লক, রুশো এবং সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্কস রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করেছেন।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে ইংল্যান্ডের G.J. Holyoake (হোলিওক) এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তিনিই সর্বপ্রথম ১৮৪৬ সালে এ মতবাদ প্রচার করেন। তবে এ মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন Charles Bradlaugh (চার্লস ব্রাডলাফ)। এ মতবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইংল্যান্ডে 'National Secular Society' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মনে করেন মানব জীবনের পক্ষে যা কিছু মঙ্গলজনক তাই সৎনীতি এবং সৎনীতি ঈশ্বর ও ধর্মনিরপেক্ষ। আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা যা কোন ধর্মবিশেষের ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন ধর্মকে বিশেষ আনুকূল্য প্রদান কিংবা কোন ধর্মকে অবজ্ঞাও করে না। রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন নাগরিকদের যৌথভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত, নীতি ও পদ্ধতির বিষয়। ঐ হিসেবে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত। যদিও সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আত্মস্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, মুসলিম নিধন, বাবরী মসজিদ ধ্বংস ইত্যাকার ঘটনায় বিধ্বস্ত। আবার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দাবিদার পাশ্চাত্য বিশ্ব মুসলিম জাহানে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তাতে ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও তৎকালীন ইউরোপ

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের জন্ম ইউরোপে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু যে সময়ে এর জন্ম সে সময়কার ইউরোপের বাস্তব চিত্র কেমন ছিল তা জানা থাকা শ্রেয়। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে পনর শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই মুসলিম সভ্যতার সৃষ্টি। কারণ বর্তমানকালে আমরা উচ্চ শিক্ষার জন্য যেমন- ইউরোপ, আমেরিকায় পাড়ি জমাই; তেমনি পনর শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয়ানদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আলহামরা, গ্রানাডা, কর্ডোভায় আসতে হত। যে প্রতিষ্ঠানগুলো Spain এ মুসলিম শাসন আমলে স্থাপিত হয়েছিল এবং যার উদ্দেশ্য ছিল কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিতরণ করণ। মুসলমান শাসকগণ যখন এ সকল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান (highist seat of learning) স্থাপন করেন তখন সমগ্র ইউরোপ ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনগ্রসর। ইউরোপিয়ানরা এ সকল উচ্চ শিক্ষার স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন করে পরবর্তীতে সে লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে যার ফল ভোগ করছে বর্তমান আধুনিক ও উন্নত বিশ্ব। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সূতিকাগার Spain এর সেসকল উচ্চ শিক্ষালয় যা মুসলিম শাসকগণ স্থাপন করেছিলেন কোরআন ও সুন্নাহর চর্চার জন্য। অর্থাৎ মুসলমানদের নিকটই ইউরোপীয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতে খড়ি। কিন্তু মুসলমানরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তখন ইউরোপীয়ানরা জ্ঞান সাধনায় অগ্রসর হতে থাকে। এবং তারা দ্রুত বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে নতুন নতুন আবিষ্কার উপহার দেয়।

সে সময় সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম যাজকদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। তারা ধর্মের নামে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। অর্থাৎ যাজকরা ধর্মের নামে নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রচার করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করে। কিন্তু সমাজের জ্ঞান তাপসরা যখন জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে ধর্মযাজকদের মনগড়া মতবাদ ভ্রান্ত প্রমান করল তখন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার যাজকদের শাসনভিত নড়বড়ে করেছিল তখন যাজকরা বিজ্ঞানীদের মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথ রুদ্ধ করার অপকৌশল এঁটে তাদেরকে খোদায়ী বিধান অস্বীকার করার দায়ে দণ্ড ভোগ করাল। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশের সাথে সাথে যাজকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। ধর্মের নামে যাজকদের এরূপ অর্ধামিক আচরণ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মননে ধর্ম সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। ফলে ধর্মকে কেবল মানুষের ব্যক্তিক জীবনে আবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যাজকদের সাথে বুদ্ধিজীবীদের এই দ্বন্দ্বকে আরো সুস্পষ্ট করে বলা যায় গির্জা বনাম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব। দীর্ঘ দু'শত বছর এই দ্বন্দ্বের শেষ প্রান্তে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগী হল–আধ্যাত্মিক বা ব্যক্তিগত জীবনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চার্চের, আর পার্থিব জীবনের সকল দিকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার রাষ্ট্রের। এভাবে ধর্ম রাষ্ট্র বা রাজনীতি থেকে পৃথক হল- যার নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

www.pathagar.com

তবে এরূপ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণাম যে ভয়াবহ তা অত্যাল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হল। এ মতবাদ জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করল। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীক মূলনীতি হিসেবে এ মতাদর্শ ইউরোপ পেরিয়ে সকল উদারনৈতিক, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও অনুপ্রবেশ করল।

মুসলিম বিশ্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা
Muslim world and Secularism

বাস্তবতা এই যে একজন মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে একজন নওমুসলিম চিন্তকের চাইতেও কম জানেন। ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষবাদ ভাল সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। আধুনিকতা কিংবা উদার গণতান্ত্রিকতার অজুহাতে মুসলিম শাসকবর্গ এ মতবাদকে মডেল হিসেবে প্রয়োগ করছেন। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে উন্নত বা আধুনিকীকরণের নামে ইসলামের পরিপন্থী সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন। তিনি শুধু ধর্ম শিক্ষাকেই বন্ধ করেন নি, ইসলামের যত হুকুম আহকাম, আচার, আচরণ, বিধিবিধান সবই তুরস্কে নিষিদ্ধ করেন। আধুনিকীকরণের নামে মুসলিম বিশ্বে তিনিই প্রথম অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সূত্রপাত করেন যার কুফল এখনও তুরস্কের লোকেরা ভোগ করছে। বর্তমানে তুরস্কে কোন আদর্শবান মুসলিম শাসক জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতায় থাকতে পারেন না। কারণ কামাল পাশা এবং পাশ্চাত্যকরণের অভিশাপ এখনও তুরস্কের সামরিক আইনিতে রয়ে গিয়েছে আর সামরিক বাহিনীর সমর্থন ছাড়া এখনও তুরস্কে কোন রাজনৈতিক নেতা দেশ শাসন করতে পারেন না। তুরস্কে ইসলামিক পার্টির উপর এখনও নানা প্রকারের বাধা-নিষেধ আছে। তারা অন্য সেকুলার পার্টির মত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, যদিও তুরস্কের জনগণ দিন দিন ইসলামের দিকে বেশি বেশি ধাবিত হচ্ছে। কামাল পাশা আধুনিকীকরণের নামে সেখানকার মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের লোকদের থেকেও বেশি পাশ্চাত্যকরণ করে গিয়েছেন যার জের এখনও চলছে। মেয়েদেরকে তিনি শুধু পর্দার আড়াল থেকেই বের করেন নি তাদেরকে মিনি স্কার্ট পরিধান করতেও বাধ্য করেছিলেন, যার জন্য তার শাসন ব্যবস্থায় মেয়েরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ১৯২০ এর দশকে কামাল আতাতুর্ক এ মতবাদের নামে তুরস্কে মূলত পাশ্চাত্যকরণনীতিরই প্রয়োগ করেন। ইসলামকে শুধু ব্যক্তিক জীবনে আবদ্ধ রেখে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীক জীবনকে কোরআন-সন্নাহর নির্দেশ থেকে মুক্ত রাখার যে ব্যবস্থা কামাল পাশা গ্রহণ করেন তা সফল হয়নি। মূলত ইসলামের সাথে যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ চলছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতার পথ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষতার বেদীমূলে নির্বাসন দিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আরবি অক্ষর ও ভাষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য পোশাক ও রোমান বর্ণমালা বাধ্যতামূলক করেন। এককথায় ইসলামকে খ্রিস্ট ধর্মের ন্যায় বাস্তব জীবন থেকে উচ্ছেদের মহাপরিকল্পনা নেন। কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ বছরে তুরস্কে আরবি ও ইসলামী শিক্ষার

www.pathagar.com

যে নতুন ধারা সূচিত হয়, তাতে কামাল পাশার মহাপরিকল্পনা ব্যর্থতায় পতিত হয়। অপরদিকে তিউনিশিয়ার হাবিব বরগুইবা কিছুটা নমনীয় পন্থা অবলম্বন করে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মহিলাদের পর্দাপ্রথা নিষিদ্ধ করেন। অতঃপর ১৯৬১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে তিউনিশীয় জনগণকে রমযান মাসে রোজা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয়ের পথে শাশ্বত ও সর্বজনীন ইসলাম এক অনতিক্রম্য বাধা স্বরূপ।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা
Secularism in Bangladesh

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। পাকিস্তান আমলে '৭০ এর নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। '৭২ সালে গণপরিষদের উপর সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মুসলমান; এছাড়া হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকের বসবাস রয়েছে এদেশে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাত পরিহার করে কোন ধর্মকে বিশেষ প্রাধান্য বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহারের পথ রুদ্ধ করে সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্যতম হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় সরকারি দলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

মূল সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' এর ব্যাখ্যায় বলা হয় 'সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে'। [বর্তমানে ১২ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত]

রাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর নাগরিককে পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা দান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব; যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচারণা কার্য করতে পারে। অর্থাৎ সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা এবং কোন ধর্মের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে ধর্মচর্চার অধিকারকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও নির্বিঘ্ন করাই এ নীতির লক্ষ্য।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রূপের পরিবর্তন :

মূল সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' বিলুপ্ত করে ৮(১) অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। সেই সাথে ৮ (১) (ক) তে ব্যাখ্যায় বলা হয়, *সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি।*

মূলত দুটি কারণে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ কারণে এবং দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক নীতির কারণে।

www.pathagar.com

দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান (তৎকালীন সময়ে ৮২% এবং বর্তমান সময়ে ৮৮%) ও ধর্মভীরু। মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করেছিলেন বাংলাদেশের ৮২% মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় তৎকালীন সরকার বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করালেও কোন ফল হয়নি। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করায় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জিয়া সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তন আনেন এবং মুসলিম বিশ্বের আস্থা অর্জনে সমর্থ হন এবং তার ফলে মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে সাউদি আরবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবর্তিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযোজনের যুক্তি দেখানো হয় যে, রাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না বা ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে বরং রাজনীতির বাইরে রাখা হবে। বাংলাদেশের ৮২% জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ইসলাম মহান আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষণা করে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিশেষত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প হতে মানুষের মূল্যবান জীবন-সম্পদ ও সম্পর্ককে রক্ষণের প্রয়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব দূর করে সকল ধর্মের প্রতি উদারনীতি প্রদর্শনপূর্বক জিয়াউর রহমান সরকার সংবিধান সংশোধন করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্যই এই সংশোধনী আনয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ মুসলমানদের আরো সন্তুষ্ট করার জন্য সংবিধানের সংশোধনী এনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সংবিধানের প্রথম ভাগে ২(গ)তে উল্লেখ করা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে'। উক্ত সংশোধনীর পর থেকে বর্তমান অবধি ধর্মনিরপেক্ষতার উপরিউক্ত পরিবর্তনই বহাল আছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হলেও কোন পর্যায়েই ইসলামী আইন কানুন পালনের বাধ্যবাধকতা করা হয়নি। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোথাও শরীয়াহ আইন বাংলাদেশে চালু হয়নি। এ দুটিকেই পূর্ণ সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছিল ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে তা করা সম্ভব হয়নি।

উপরিউক্ত সারবান, বস্তুনিষ্ঠ, যৌক্তিক আলোচনার নিরিখে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীনতা। এটি মানব বিধ্বংসী এক মতবাদ। এ মতবাদের যে তিনটি বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠে যথা-ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদারনৈতিকতা তা সবই ইসলামে আছে, বরং ইসলাম এর চেয়ে আরো বেশি কিছু। মানুষের ব্যক্তিক জীবন থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক মোটকথা ইহজাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের সর্বব্যাপী বিচরণ একান্তই যৌক্তিক। কারণ ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, বরং ইহা বিশ্ব মানবের শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা তথা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি উৎসাহ দেয়। চূড়ান্ত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ শুধু ধর্মহীনতা নয়, ইহা ধর্মের শত্রুও বটে। মানুষের মনগড়া মতাদর্শ পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিশ্ব মানবতাকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামই একমাত্র শাশ্বত ও সর্বজনীন জীবনাদর্শ যা স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন। আর শেষ বিচারে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষবাদ
Islam and Secularism

ইসলাম আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এর সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত এক সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছে সমাজে সর্বজনীন শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্ব মানবের মুক্তির লক্ষ্যে; বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতার জন্য নয়। ইসলাম এমনি জীবনাদর্শ যেখানে অপরিসীম মানবিক সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামের গৌরবময় অতীত থেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ইসলামের এই আদর্শ অবিকৃতই আছে। বিচ্যুতি ঘটেছে মুসলমানদের আদর্শের, যার পরিণাম দুনিয়ায় অবহেলিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে। ধর্মনিরপেক্ষতা এমনি এক লাঞ্ছনাকর মতবাদ যা মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। মুসলমানরা ইসলামের সেই গৌরবময় আদর্শকে ভুলে গিয়ে মানব রচিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীক মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে অধঃপতিত হচ্ছে। ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিবেচনা না করার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রেও এ মতবাদের প্রবেশ ঘটেছে গভীরভাবে। কিন্তু ইসলাম দৃঢ়তার সাথে ধর্মনিরপেক্ষবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এ মতবাদ মানুষের মনগড়া, ঐশ্বরিক নয়। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে, ফলে স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের ছেদ ঘটে। অর্থাৎ এ মতবাদ ইহজাগতিক বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে, এতে পারলৌকিক জীবন উপেক্ষিত। বিপরীতে ইসলাম সর্বজনীন জীবনাদর্শ যা মানুষের ব্যক্তিক জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ইসলামের আহবান শুধু আখিরাত ও পরলৌকিক নয় ইসলাম বিশ্ব মানবের ইহলৌকিক জীবনের সকল পর্যায়ে কাজ করার ও চলার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে যাতে রয়েছে ইহলৌকিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। ইসলাম সত্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে। প্রাজ্ঞজনদের ইজতিহাদ বা গবেষণার তাগিদ দিয়েছে। ঈমানদার তথা বিশ্বাসীরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ইসলামের মৌলভিত্তি। আর এই তাওহীদভিত্তিক ইসলামের প্রতিষ্ঠা, প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ঈমানদারদের উপর বর্তায়।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদ শুধু ইহজাগতিক বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিক জীবনে আবদ্ধ রেখে মানব রচিত বিধান দিয়ে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। আর ইসলাম এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে। ইসলাম মানুষকে যে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান করে, ধর্মনিরপেক্ষতা সেটা পিছে ফেলে অনৈতিক পথের সন্ধান দেয়। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা গোটা সমাজ জীবনকে ধর্মের হস্তক্ষেপ মুক্ত দেখতে চায়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সাথে ইসলামের এবং ইসলামের প্রকৃত অনুসারী মুসলমানদের কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে না। এবং থাকা উচিৎ নয় এ কারণে যে ধর্ম নিরপেক্ষবাদ মানুষের শুধু বস্তুগত জাগতিক দিকেই বেশী গুরুত্ব দেয় যার কুফল আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষবাদ

Abdur Rashid Moten তাঁর "Political Science : An Islamic Perspective" ('p-7) গ্রন্থে ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে তুলনা করেছেন।

Secularism	Islam
i. Man made in origin. ধর্মনিরপেক্ষতার উৎসমূল হল এটা মানব রচিত।	i. Divine in origin. ইসলামের উৎসমূল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ।
ii. This is worldly orient. ইহজগতমুখী।	ii. Emphasizes this world and the hereafter. ইসলাম ইহজগত ও পরজগতের উপর গুরুত্বারোপ করে।
iii. Emphasizes reason, observation, experiment. যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ।	iii. Emphasizes revelation, reason, observation and experiment. ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্বারোপ।
iv. Believes in humanism. মানবতাবাদে বিশ্বাসী।	iv. Believes in humanism but within the framework of Shariah. শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে মানবতাবাদে বিশ্বাসী।
v. Separates religion and politics. ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ।	v. Integrates religion and politics. ধর্ম ও রাজনীতির একত্রীকরণ।
vi. Relegates religion to personal sphere. ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ রাখে।	vi. Islam governs all aspects of a believer's life. ইসলাম বিশ্বাসীদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণারোপ করে।

www.pathagar.com

মৌলবাদ
Fundamentalism

[প্রাক-কথা, মৌলবাদী ধারণার উৎপত্তি]

প্রাক-কথা
Introduction

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আরেকটি বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে মৌলবাদ (Fundamentalism)। এটাও পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষত বিশ্বের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মুসলিম বিশ্বকে নিঃশেষিত করার কৌশল হিসেবে এঁটে দেয়া লেবেল। আর একারণেই মুসলমানদের পদে পদে চরম নাজেহালের শিকার হতে হচ্ছে। অথচ মৌলবাদের প্রকৃত ইতিহাস এবং মৌলবাদী আচরণ বা কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত বিষয় বিশ্লেষণ করলে মুসলমানদের কোন যুক্তিতেই মৌলবাদী অপবাদে আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ যে মুসলমান ইসলামের মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে ঈমান আকীদা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তাকে মৌলবাদী বা উগ্রপন্থী বলে আখ্যা দেয়া যায় না। মৌলবাদের আক্ষরিক অর্থ অন্ধ বা গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন যে মতবাদে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গন্য করা হয় এবং রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, আবার যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করে না। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ ধর্মান্ধ নয় ধর্মপরায়ন এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল।

Encyclopaedia of Social Science এ Fundamentalism এর বর্ণনানুযায়ী— "মৌলবাদ বলতে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদকে বুঝানো হয়েছে। আর Encyclopaedia Britanica এর ভাষ্যানুযায়ী সনাতন প্রোটেস্টান্ট গোড়ামীর অপর নাম হচ্ছে মৌলবাদ।

মৌলবাদী ধারণার উৎপত্তি
Origin of the Concept of Fundamentalism

উপরিউক্ত সংজ্ঞানুযায়ী খ্রিস্টানদের একটি গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদ বা সনাতন প্রটেস্ট্যান্ট গোঁড়ামির নামই হল মৌলবাদ। সংজ্ঞার সাথে এর উৎপত্তির যথেষ্ট মিল রয়েছে। ১৮৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স এর সোয়াম্পস্কট শহরে অনুষ্ঠিত বাইবেল সম্মেলনের (Conference of Bible) মাধ্যমেই মৌলবাদী তৎপরতার যাত্রা শুরু হয়। খ্রিস্ট পাদরী জেমস ইঙ্গলিস (James Inglish) মৌলবাদের ভিত্তিতে মিলেনারিয়ান আন্দোলন শুরু

www.pathagar.com

করেন। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা "Fundamentals : A Testimony of Truth" নামে বার খণ্ড বিশিষ্ট একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৌলবাদের পাঁচটি ভিত্তি উল্লেখ করা হয়। যথা –

(i) বাইবেলের নিঃশর্ত অনুপ্রেরণা ও অভ্রান্ততা (Plenary inspiration and inerrancy of scripture)

(ii) যিশু খ্রিস্টের দেবত্ব (Diety of Jesus)

(iii) কুমারীর গর্ভে যিশুর জন্ম (Virgin birth of Jesus)

(iv) মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু যিশুর রক্তক্ষরণ হয় (Substitutionary blood atonement) এবং

(v) যিশুর সশরীরে পুনরুত্থান ও রাজত্ব (Bodily insurrection and premillenial second coming of church)

বর্তমানে মৌলবাদের চারটি দিক পরিলক্ষিত হয়: যেমন–ব্যাপটিস্ট, প্রেস বাইটেবিয়ান, ম্যাথডিস্ট এবং ইভাঞ্জেলিস্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনয় রাজ্যের হোয়েটন শহরে মৌলবাদীদের হেড কোয়ার্টার অবস্থিত। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে গোঁড়া প্রটেস্ট্যান্টপন্থী খ্রিস্টান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের মৌলবাদের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। (হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ পৃষ্ঠা-৩৩৩)

আবার অনেকেই মনে করেন মৌলবাদ ও জাতীয়তাবাদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন-ভারতে BJP নিজেদেরকে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী মনে করে প্রকৃত দেশপ্রেমিক দাবি করে। এ ধরনের জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় মৌলবাদের জন্ম দেয়। BJP একদিকে নিজেদের জাতীয়তাবাদী মনে করে, সে সাথে ধর্মীয় বিভক্তি সৃষ্টি করে। ১৯৬০ এর দশকে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইরানে ধর্মীয় মৌলবাদের আবির্ভাব ঘটলেও ইসরাইলেই সর্বপ্রথম এর বিকাশ ঘটে। কিন্তু পশ্চিমারা নিজেদেরকে মৌলবাদহীন দাবি করে মুসলিম বিশ্বকে এর জন্য দায়ী করলেও আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ মৌলবাদমুক্ত নয়।

পশ্চিমা বিশ্ব নেতিবাচক দৃষ্টিতে মৌলবাদের ব্যাখ্যা করে শুধু মুসলমানদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকে। তারা ইরানকে প্রথমে সম্প্রসারণবাদী বলে আখ্যা দেয়। তাদের ভাষ্যানুযায়ী-সংগ্রামী রাষ্ট্র মৌলবাদী এবং এরূপ রাষ্ট্র পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আর ক্ষমতাসীন মৌলবাদীরা আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা পশ্চিমা সভ্যতার ঘোর বিরোধী। কিছু কিছু উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তিকে (লিবিয়া, সিরিয়া) স্নায়ুযুদ্ধকালীন (Cold war) পশ্চিমা বিশ্বকে মোকাবেলার জন্য সাম্যবাদকে অনুকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এটা শুধু ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এর কোন কার্যকরী Global dimension ছিল না। অন্যদিকে কুয়েত, সৌদি আরব যারা নিজেদেরকে Moderate হিসেবে বিবেচনা করে সাম্যবাদ প্রত্যাখ্যান করে, তারা মৌলবাদ সম্পর্কে পশ্চিমাদের সাথে একমত নয়। পশ্চিমারা মনে করে যারা মৌলবাদের দিকে ঝুঁকছে তারা সামাজিক হতাশাগ্রস্ত। অর্থাৎ সামাজিক হতাশা তাদের উগ্রবাদী করে তুলছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে অনেকেই উগ্রবাদী না হয়েও মৌলবাদী এবং তারা বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বস্তুত মৌলবাদ

www.pathagar.com

সম্পর্কে মার্কিন মনোভাব অনেকটা জার্মানির নাৎসীবাদের প্রবক্তা একনায়ক হিটলারের দম্ভোক্তিকেই মনে করিয়ে দেয়। আর তা হল "জার্মান জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারাও নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হিসেবে প্রচার করে কেবল মুসলমানদেরকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী তথা নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। তাঁরা ইহুদি খ্রিস্টান মৌলবাদীদের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে মুসলমান মৌলবাদীদের কটাক্ষ করে তাদের দমনের জন্য যাবতীয় হীন অপতৎপরতায় লিপ্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশকেও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দেয়ার অপতৎপরতা চলছে। মূলত দেশের অভ্যন্তর থেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্বের বুকে দেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরূপ প্রচারণা চালান হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও মৌলবাদী বা আল-কায়েদার মত কোন উগ্রধর্মীয় তৎপরতার প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সুতরাং মিথ্যা প্রচারণার ভিত্তিতে পাশ্চিমাদের এই অভিযোগকে গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কোন ধরনের উগ্রমৌলবাদী গোষ্ঠী বা তৎপরতার সাথে জড়িত নেই। বাংলাদেশের মুসলমান ধর্মানুরাগী বা ধর্মপরায়ন তারা কখনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি, তা যদি করত তাহলে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ফলে বাংলাদেশে অনেক সহিংস ঘটনা ঘটতে পারত কিন্তু তা ঘটেনি যা ইসলাম বিদ্বেষীরাও স্বীকার করতে বাধ্য।

উগ্র জাতীয়তাবাদ যেমন বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ- যার পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তেমনি উগ্রমৌলবাদও বিশ্বশান্তির অন্তরায়। তবে ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মে যে গোঁড়ামি (orthodox) বিদ্যমান ইসলামে অনুরূপ গোঁড়ামির কোন স্থান নেই।

এই দৃষ্টিকোণে সিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া অঞ্চলের মৌলবাদীরা উগ্র নয়। তারা Catholic Opus Die সংস্থা ইসরাইলী একত্রিকরণপন্থীগণ নিউইর্য়ক এর Mair Kahane এর অনুসারীগণ, South Iraland এর Catholic ও Catholic liberation theolologists এর ন্যায় উগ্র মৌলবদী নয়। অথচ পশ্চিমারা এদেরকে মৌলবাদী আখ্যা দেয় না। একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম কখনো ধর্মের নামে কোন উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠতে পারে না।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ
Terrorism

[প্রাক-কথা, সন্ত্রাসবাদের ধারণা, সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম বিশ্ব]

প্রাক-কথা
Introduction

বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)। সন্ত্রাস এখন বিশ্বময় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার হয়ে অসংখ্য প্রাণ ঝরছে, সম্পদের অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে পৃথিবীর সহস্র বছরের পুরাকীর্তিসমূহ, ক্রমশ উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী, শংকাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠছে মানব জীবন। আবার সন্ত্রাসের অভিযোগকে পুঁজি করে শক্তিধর পশ্চিমারা অবলীলায় অন্যায়-অযৌক্তিক ও অনৈতিকভাবে বিশেষত মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন-আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের এই নগ্ন থাবা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও বিষিয়ে তুলছে। অর্থাৎ পশ্চিমারা সন্ত্রাসের জন্য মুসলিম বিশ্বকে দায়ী করলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে বেশি। যদিও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে যে মহাসত্য প্রতিভাত হয়, তা হল পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া সন্ত্রাসবাদের সাথে মুসলমানদের কোনরকম সম্পৃক্ততা নেই, থাকতে পারে না। কারণ ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। ইসলামের অবস্থান প্রবলভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। কেননা ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। আর ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা শান্তিপ্রিয় এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু পশ্চিমারা মৌলবাদের সুর ধরে মুসলিম বিশ্বের উপর সন্ত্রাসবাদের যে অভিযোগ দিয়েছে তা ইসলামী যুক্তির মানদণ্ডে খণ্ডনের জন্য বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা একান্তই সময়োপযোগী।

সন্ত্রাসবাদের ধারণা
Concept of Terrorism

সাধারণভাবে আক্ষরিক দৃষ্টিতে বলা যায় সন্ত্রাস হল কোন উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শংকা বা ভীতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচার, লুণ্ঠন ইত্যাকার কার্যের আনুষ্ঠানিক রূপ। আরেকটু সুপরিসরে বলা যায়, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মনে ভীতি সঞ্চার করার প্রয়াসই হল

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ। তবে সন্ত্রাসবাদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে নানা ধারণার সূত্রপাত হয়েছে। বিশ্ব সংঘ তাদের ইচ্ছামত ও অনুকূলে সন্ত্রাসবাদের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারে নি। তবে বিশ্বরাজনীতির মোড়ল, সন্ত্রাসবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের সংজ্ঞা প্রচার করে থাকে। সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য হল কোন জাতি, সম্প্রদায়, সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণ জনগণ। যেমন- হারুনুর রশীদ এর 'রাজনীতিকোষ' এর ব্যাখ্যানুযায়ী, সাধারণত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যখন গণতান্ত্রিক বা আইনসঙ্গত পন্থায় দাবি আদায়ের বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ করে দেয়, তখনই আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার দেশকে সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়া হয়। সমাজবাদী কিংবা গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবীরা উভয়েই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অস্ত্রধারণ করে। তবে সন্ত্রাসীদের পিছনে জনগণের কোন সম্পৃক্ততা বা সমর্থন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা যায়। তেমনি ভারতে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন এবং পাক-শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধকেও উল্লেখ করা যায় যেখানে আন্দোলনকারীরা জনগণকে সাথে নিয়ে অস্ত্রধারণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। সন্ত্রাসবাদ বলতে বুঝায় কোন মানবগোষ্ঠী এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক কৌশলগত ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সহিংস কর্মকাণ্ড অথবা অনুরূপ কর্মকাণ্ড করার হুমকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক দেয় সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ বলতে সাধারণভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে উপজাতীয় অথবা গুপ্ত দালালদের দ্বারা পরিচালিত নিরস্ত্র লক্ষ্যসমূহের উপর পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সহিংসতাকে বুঝায়। (The term terrorism means premediated politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational or clandestine agents, usually intended to influence an audience). যুক্তরাষ্ট্রের Department of Justice প্রদেয় সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। যথা – (i) বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে ত্রাস প্রদর্শন বা বাধ্য করা। (ii) ত্রাস বা বাধ্য করার মাধ্যমে সরকারের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করা। এবং (iii) সরকারের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার জন্য হত্যাকাণ্ড বা অপহরণ করা।

সন্ত্রাসবাদের গোড়ার কথা

সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনায় যতদূর জানা যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে ইহুদি ধর্মালম্বীদের একটি উগ্র গোষ্ঠী Zealots (জিলটস) বর্তমান ইসরাইলের উপর রোমান আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে ইরানে Assasins (অ্যাসাসিনস) নামক শিয়া সম্প্রদায়ের একটি সংগঠন সুন্নী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনে স্বৈরতন্ত্রীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

মূলত বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সন্ত্রাস ভয়াবহরূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্য প্রযুক্তির অতি উৎকর্ষের যুগে সন্ত্রাস মারাত্মক আকার ধারণ করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বিশেষত ১১ সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে স্তম্ভিত করে তুলেছে। তাছাড়া উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনার প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে যে কোন স্থানে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই এর দায়ভার একতরফা ও অযৌক্তিকভাবে মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমারা ধর্মীয় বিষয়কে সন্ত্রাসবাদের সাথে জুড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য আল-কায়েদা, উসামা বিন লাদেনসহ মুসলমানদের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার বুলি আওড়িয়ে শান্তিপ্রিয় শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের কোণঠাসা করার যাবতীয় কূটকৌশল আটছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে যেখানে মুসলমানরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে লিপ্ত, যেমন– আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ইরাক -এর জনগণকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়ে তাদের উপর অমানবিক, পৈশাচিক জাহেলি যুগের কায়দায় নির্যাতন-নিষ্পেশন চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমনের জন্য বিশ্বমোড়লরা রাষ্ট্রগুলোর উপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিদেশী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর (Foreign Terrorist Organisation – FTO) একটি তালিকাও প্রকাশ করছে। এই FTO এর তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা কয়েকটি শর্তও আরোপ করেছে এবং নিম্নের সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আবু নিদাল অর্গানাইজেশন, আবু সায়াফ গ্রুপ, আমর্ড ইসলামিক্ গ্রুপ, জেমাহ ইসলামিয়া, হামাস, হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল মুজাহিদিন, হিজবুল্লাহ, আল-জিহাদ, কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টি, ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, আল কায়েদা, প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট, শাইনিং পাথ, এলটিটিই ইত্যাদি। অথচ এর প্রায় সবকয়টি সংগঠনই তাদের আত্মরক্ষা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকের উপর মার্কিন আগ্রাসনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়ে বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ইরাকীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয় বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিদ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অমানবিক পাশবিক অত্যাচার চলছে ইরাকী জনগণের উপর।

সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম বিশ্ব
Terrorism and Muslim World

স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আর এই মানুষের মধ্যে স্রষ্টার ভাষায় সর্বোত্তম জাতি হল মুসলিম জাতি, যারা সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সুতরাং স্বয়ং স্রষ্টা মুসলিম জাতিকে আল কোরআনে শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, অথচ সেই জাতিকে পশ্চিমারা সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের

www.pathagar.com

শিকার হয়ে মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে, নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র টার্গেটে পরিণত হয়েছে মুসলমান ও মুসলিম বিশ্ব। যেখানে মুসলমানরা নিজেদের স্বাধীনসত্তা, মুক্তি কিংবা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে রত, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত এই অভিযোগ তুলে বিভিন্ন কৌশলে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুসলমানরা প্রতিনিয়ত ভারতীয় সৈন্য ও জনগণের হাতে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ঢালাওভাবে স্বাধীনতাকামী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়ার মনোভাব পোষণ করে, তখন কাশ্মীরের মুসলমানদের ভারতীয় নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। আর ফিলিস্তিন যেন এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে প্রতিদিন ইহুদিদের হাতে নিহত হচ্ছে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনী জনগণ। অন্যায়ভাবে অকাতরে মানুষ হত্যার এই মহাযজ্ঞ বিশ্ব মানবতা এর পূর্বে আর প্রত্যক্ষ করেনি। চেচনিয়ার মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। আফগানিস্তানে যে তালেবান সরকার মার্কিন মদদেই ক্ষমতাসীন হয়েছিল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাদেরকে হটিয়ে আবার সেখানে মার্কিন তাবেদার সরকারকে বসিয়েছে। সেখানে এখনো মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। ইরাক এখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তাণ্ডবে অশান্ত। মার্কিন তাবেদার সরকার ও মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইরাকী গেরিলাদের অবিরাম আক্রমণে ইরাক যেন এক মৃত্যুপুরীতে রূপ নিয়েছে। স্বজাতির শাসককে তথাকথিত জীবাণুঅস্ত্র রাখার অযৌক্তিক অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎখাত করে এখন ইরাককে শোষণ করে চলছে। এভাবে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও নির্বিচারে মার্কিন আগ্রাসন চলছে। ইরাকে মার্কিনীদের আক্রমণ ও অত্যাচারে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ জাতি. ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে আমেরিকাকে ধিক্কার দিয়েছে এবং দিচ্ছে কিন্তু এতে তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একক পরাশক্তি অন্য কারো মতামতের তোয়াক্কা এরা করে না।

সন্ত্রাস সর্ম্পকে ইসলামের সুস্পষ্ট ভাষ্য হল ইসলাম শান্তি ও সহনশীলতার ধর্ম। যে ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের মৌলভিত্তি তথা ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম হজ্জসহ ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, যে আসমানীগ্রন্থসমূহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতাকুল, জীবন-মৃত্যু, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তার দ্বারা কোনক্রমেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া অপবাদ ভ্রান্ত, অসার ও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার ও সাম্যবাদের পতনের পর মার্কিনীদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে ইসলাম। ইসলামকে তারা challenge বা হুমকি হিসেবে দেখছে, কারণ ইসলামের যে মূলমন্ত্র, শিক্ষা ও আহবান তা বিশ্বমানবতার ইহলৌকিক ও পরকালের কল্যাণের জন্য, কোন বিশেষ-জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নয় তাই একে বলা হয় সর্বজনীন ধর্ম। ইসলামের সহজ, সরল ও মানবতাবাদী আহবান তাদেরকে শঙ্কিত করছে এ জন্য তারা সারা বিশ্বের নিকট তাদের প্রচার মাধ্যমে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম আর মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বলে প্রমাণ করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের এ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত হাসিল হবে না, হতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ও শাসকবৃন্দের অনেক করণীয় আছে, তাদেরকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ও সকল প্রকার বৈষম্য ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে রাষ্ট্রশাসন করতে হবে এবং নেতৃত্ব দিতে হবে। মুসলমানদের অনৈক্য বিভেদ পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করছে।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ধর্মনিরপেক্ষবাদ কি? এর উৎপত্তি ও বিকাশধারা বর্ণনা কর।
[What is secularism? Discuss its origin and development.]

২. ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে কি বুঝায়? মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব আলোচনা কর।
[What is meant by Secularism? Discuss it impacts in the muslim world.]

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা কি? ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে তুলনা কর।
[What is Secularism? Compare between Islam and Secularism.]

৪. মৌলবাদ কি? মৌলবাদের উৎস ও প্রকৃতি বর্ণনা কর।
[What is Fundamentalism? Describe the sources and nature of fundamentalism.]

৫. সন্ত্রাসবাদ কি? সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বর্ণনা কর।
[What is Terrorism? Describe the origin and nature of Terrorism.]

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যয়গুলো বিশ্লেষণ কর : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সেকুলার রাষ্ট্রদর্শন, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ।
[Analyse the following cencepts from Islamic Stand point : Secularism, Secular political philosophy, Fundamentalism, Terrorism.]

www.pathagar.com

শান্তি, নিরাপত্তা ও যুদ্ধ
Peace, Security & War

[প্রাক-কথা, শান্তি ও নিরাপত্তা, ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স), যুদ্ধ/জিহাদ]

প্রাক-কথা
Introduction

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার মৌল ধারণাগুলোর (Fundamental Concepts) মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা, যুদ্ধ (জিহাদ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক তাৎপর্যবহ। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা, সুচারুরূপে পরিচালনা এবং ইসলামের অপরাপর মৌলনীতির সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শান্তি, নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়। প্রথম ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (The First Islamic Democratic State) যা রাসূল (স) কর্তৃক পবিত্র মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে রাষ্ট্রের সংবিধানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইসলামের এ শান্তি ও নিরাপত্তা বিশ্বজনীন - কোন বিশেষ ধর্মের, বিশেষ বর্ণের বা গোত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব ও প্রাধান্য পাচ্ছে। কারণ বিশ্ব মানবসমাজ পরপর দুটি প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫) প্রত্যক্ষ করেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বনেতৃবৃন্দ বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে গড়ে তোলে বিশ্বমানবের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা লীগ অব নেশন্স। কিন্তু এই সংস্থা যখন বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তখন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আবার বিশ্বনেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে জাতিপুঞ্জকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নাম পরিবর্তন করে জন্ম দেয় সম্মিলিত জাতিসংঘ (UNO). ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ অবধি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারে নি। পরাশক্তিগুলোর অন্যায় আগ্রাসনে বিশ্বের আনাচে-কানাচে অবলীলায় মানবাধিকার বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম শান্তির ধর্ম। আর এই শান্তি সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বকে অন্যায় আগ্রাসন-যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে ইসলামই সর্বশেষ পন্থা। ইসলামে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের পরিবর্তে জিহাদ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।

শান্তি ও নিরাপত্তা
Peace and Security

শান্তি বলতে অনেকেই 'absence of conflict' কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ শান্তি এমন একটি বিশেষ পরিবেশ যেখানে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লেশমাত্র নেই, যেখানে সব

www.pathagar.com

কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং বিশ্বসংস্থা শান্তি প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

কুইন্সী রাইট "A Dictionary of Social Science' গ্রন্থে শান্তি প্রত্যয়টিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

১. সুনির্দিষ্ট শত্রুতার অবসানের কথা বুঝাতে পারে, যেমন- ওয়েস্টফ্যালিয়া শান্তিচুক্তি, ভার্সাই শান্তিচুক্তি।

২. সাধারণ অর্থে যুদ্ধ-বিরোধের অনুপস্থিতিই হল শান্তি।

৩. সক্রিয় বন্ধুত্ব অর্থেও শান্তি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এবং

৪. দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র বা সাধারণভাবে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সফল হয়েছে এমন কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে বুঝাতে পারে।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক Saint Augustin এর মতে, "সত্যিকারের শান্তি বলতে কেবল শত্রুতা বা দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসানকেই বুঝায় না, বরং প্রচলিত ব্যবস্থায় শান্তভাব বজায় রাখার বিষয়টিকেই বুঝায়।"

কিন্তু T. R. Fox মনে করেন, "সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি বলতে যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ন্যায় হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের হাত থেকে মুক্ত এমন অবস্থাকে বুঝায়।

Oxford Dictionary এর বর্ণনানুযায়ী, Peace means "A situation or a period of time in which there is no war or violence in a country or an area."

Cambridge Advance Learner's Dictionary এর ভাষ্যানুযায়ী Peace means "[no violence] Freedom from war and violence, especially when people live and work together happily without disagreements."

আর 'ইসলাম' আরবি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'সালাম' থেকে যার অর্থ শান্তি। বস্তুত ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে নিরাপত্তা বিষয়টি কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ নিরাপত্তা বিধানকল্পে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পোষণ করে। আবার সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষায়, নিরাপত্তার বিষয়টি বহিঃশক্তির আক্রমণ, চাপ ও প্রভাবমুক্ত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন বহিঃশক্তির আক্রমণ, প্রভাব ও চাপমুক্ত থেকে নিজ ভূখণ্ডের উপর পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। তবে আরনল্ড ওয়েলফেয়ারস মনে করেন, রাষ্ট্র ইতিপূর্বে যে সকল মূল্যবোধ অর্জন করেছে সে সকল মূল্যবোধের সংরক্ষণও জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। তবে নিরাপত্তা প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন অভিধানে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

Oxford Dictionary এর বর্ণনানুযায়ী, Security অর্থ "The activities involved in protecting a country, building or person against attack, danger etc."

Cambridge Advance Learner's Dictionary'র মতে, "Protection of a

www.pathagar.com

person, building, organization or country against threats such as crime or attacks by foreign countries."

ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা
Peace and Security from the Islamic stand-point

ইসলাম অর্থ শান্তি ও আত্মসমর্পণ। মহান স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর সকল বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মান্য করে ব্যক্তিগত, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন; আর এ লক্ষ্যেই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। ইসলামপূর্ব যুগে আরবসমাজে যে সামাজিক অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার বিরাজমান ছিল; গোত্রে গোত্রে হানাহানি, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণ, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রভৃতির মূলোৎপাটন করে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয়লাভের জন্য নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) সকলের প্রতি আহবান জানান। ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার অমোঘ বাণীর প্রতি সাড়া দিয়ে অনেকেই জীবনকে কোরআনের আলোকে পুনর্গঠনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। তাই ইসলামে ইসলাম-পূর্বকালের সকল সামাজিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি নিষিদ্ধ। আল্লাহর ঘোষণা, "আর তোমরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর এতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না" (আল আ'রাফ-৫৬)। "এবং তারা (ইসলামের দুশমনরা) পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে বেড়ায়, আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না" (আল-মায়েদা-৬৪)।

তবে ইসলামে শান্তির কথা আসলেই প্রথমে ব্যক্তির মনের প্রশান্তির বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠে। আগে চাই মানসিক প্রশান্তি; কারণ ব্যক্তির মনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল পরবর্তীতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই ইসলাম সর্বাগ্রে ব্যক্তির মনের শান্তির উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ব্যক্তির নিরাপত্তার বিষয়টি ইসলামে নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে। ব্যক্তিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরই আসে পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়। ইসলামের নির্দেশ আগে নিজে বাঁচ এবং তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও। এরপর সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের আলোকে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে রাসূল (স) এর অনুসৃত নীতিমালার পর্যালোচনা করা একান্তই যৌক্তিক।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স)

বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)কে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণ করে বলেন, "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি" (আম্বিয়া-১০৭)। সুতরাং রাসূল (স) হলেন বিশ্বশান্তির দূত। তৎকালীন সময়ের আরবদের জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সামাজিক অনাচার-অবিচারের মূলে কুঠারাঘাত হেনে হযরত মুহাম্মদ (স) মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশের

www.pathagar.com

জন্য সমাজের প্রতিটি নাগরিককে ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত করে তোলেন। সেই সাথে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে যারা সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার পথ পরিহার করে আল্লাহর পথে ধাবমান তাদের আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ ভীতির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত করেন। পবিত্র কোরআন তথা আল্লাহর বাণীর সংস্পর্শে সমাজের প্রতিটি নাগরিক ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নীতি তথা সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, শান্তি ও নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি গুণে বলীয়ান হতে থাকে। এবং এই সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য রাসূল (স) ঘোষণা করেন, "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে" (বুখারী ও মুসলিম)। তবে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাসূল (স) এর অনুসৃত বলিষ্ঠ পদক্ষেপগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হিলফুল ফুযুল : ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরব সমাজ নানা জঘন্য অপরাধে নিমজ্জিত ছিল। সুদ প্রথা, ঘুষ গ্রহণ, মদ্য পান, জুয়া খেলা, ব্যভিচার, চুরি ডাকাতি, হত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গোত্রে গোত্রে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে হিংসা-বিদ্বেষ, অসহায়-দুর্বলের উপর বর্বর নির্যাতন চলছিল। এহেন এক ক্রান্তিকালে রাসূল (স) এসব অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে উৎপীড়িতদের রক্ষার জন্য এবং গোত্রে গোত্রে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমাজের স্বেচ্ছাব্রতী যুবকদের নিয়ে তিনি গঠন করেন 'হিলফুল ফুযুল' (প্রতিষ্ঠাকাল ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ) নামের শান্তিসংঘ যা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর স্থায়ী ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূল (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে সমাজের মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন এবং সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাসূল (স) বলেন, "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয় তাহলে তাকে থামিয়ে দাও। আর যদি অত্যাচারিত হয় তাহলে তাকে সাহায্য কর" (দারেমি)।

মদিনার সনদ : রাসূল (স) কর্তৃক সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আরেক অনুসৃত পদক্ষেপ ঐতিহাসিক মদিনার সনদ। মদিনার সনদকে বলা হয় The first written constitution of the world (পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান)। ইসলামের প্রাথমিক শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)ও বারবার এই ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার হয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামের অনুসারীদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়ন পর্যন্ত করেছে। কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় সামাজিক শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার বাণী প্রচার করেছে। রাসূল (স) মক্কা থেকে আল্লাহর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে কোরআনের আলোকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদিনার বিখ্যাত বংশ বনু নজির, বনু কুরাইজা এবং বনু কাইনুকা গোত্রের পৌত্তলিক ও ইহুদি নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে খ্যাত। এ সনদ আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মৌলভিত্তিস্বরূপ। মদিনার সনদে ইহুদি, খ্রিস্টান,

www.pathagar.com

পৌত্তলিক ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে শক্তিশালী জাতি গঠনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে - যেখানে প্রতিটি নাগরিক সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার ভোগ করবে। এরূপ ঐক্যবদ্ধ জাতির কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

মদিনার সনদ রাসূল (স) এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সুদূরপ্রসারী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমাজ সংস্কার, সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুদীর্ঘকালব্যাপী আরব সমাজে যে গোত্রযুদ্ধ বিরাজমান ছিল রাসূল (স) প্রদত্ত সংবিধান মদিনার সনদ অনুযায়ী যুদ্ধ ও অনৈক্যের স্থলে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূল (স) মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রতিটি মানুষের জীবন সম্পত্তি ও মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হন। সকল মানুষ সমানাধিকারের সুযোগ লাভ করে মুসলিম-অমুসলিম এক অভূতপূর্ব সৌভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "মদিনার সনদে হযরতের অসাধারণ মহত্ত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেই নয়, বরং সর্বযুগের সর্বকালের মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।" আবার হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও এরূপ সর্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিধৃত ছিল।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ : দশম হিজরি সনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) পবিত্র মক্কায় তাঁর জীবনের শেষ হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে বিস্তীর্ণ আরাফাতের ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা যেমন সর্বজনীন মানবাধিকারের গ্যারান্টিস্বরূপ তেমনি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার মৌল উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মদিনা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে তিনি আরব সমাজের সকল অনৈক্য দূর করে গোত্রে গোত্রে, মানুষে মানুষে যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন তা বজায় রাখার মানসে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন. "নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের নিকট এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র আজকের দিন ও মাস।"

সুতরাং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স) এক অনন্য ও অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা জাতি ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। কেবল ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যুদ্ধ/জিহাদ
War/Jihad

"যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা
যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা"

বাংলাদেশের কোন এক বিদগ্ধ কবির এই বেদনা বিধুর উচ্চারণ থেকেই যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে যুদ্ধ (War) ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ-বিশেষজ্ঞমহল যুদ্ধ প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে

www.pathagar.com

সংজ্ঞায়িত করেছেন। New English Dictionary'র বর্ণনানুযায়ী যুদ্ধ হল, "বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র বা শাসকবর্গের মধ্যে অথবা একই দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন পক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শত্রুতামূলক সংঘর্ষ বিশেষ; কোন বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত কোন বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার।

Oxford Dictionary অনুযায়ী যুদ্ধ হল, "A Situation in which two or more countries or groups of people fight against each other ever a period of time."

Cambridge Learner's Dictionary'র ভাষ্যানুযায়ী যুদ্ধ বলতে বুঝায়, "Armed fighting between two or more countries or groups."

আবার Encyclopaedia Britanica'য় বলা হয়েছে, "পরস্পর বিরোধী নীতি অনুসরণ করছে এবং একে অপরের উপর এ নীতি চাপিয়ে দিতে চাইছে এমন দু'জন মানুষের মধ্যে সংগঠিত শক্তির ব্যবহারের নামই যুদ্ধ।"

কিন্তু কুইন্সী রাইট মনে করেন, "সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ বলতে দুই বা ততোধিক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষকে বুঝায়, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে সার্বভৌম ও আইনত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সমান মর্যাদার অধিকারী বলে দাবি করে।'

বর্তমানকালে যুদ্ধ বলতে আমরা বিশ্বব্যাপী যা প্রত্যক্ষ করছি তাহল বৃহৎ পরাশক্তি কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে অন্যায় আক্রমণের মাধ্যমে পরাভূত করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা; কিংবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সরকারি বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম। মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের একাধিপত্য কায়েমের জন্য বিভিন্ন অজুহাতে শান্তিপ্রিয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর আঘাত হানছে। পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীমহল এরূপ অন্যায় আগ্রাসনকে যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু ইসলামে যুদ্ধ কথাটি 'জিহাদ' হিসেবে পরিচিত। মুসলিম অমুসলিম অনেকের দৃষ্টিতে জিহাদ হল একটি ধর্মযুদ্ধ। তবে যুদ্ধ ও জিহাদ এক নয়; উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

জিহাদ আরবি শব্দ যা মূল 'জুহদুন' থেকে এসেছে। এর অর্থ কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করা বা সর্বাত্মক সংগ্রাম। তবে ইংরেজিতে জিহাদকে Holy War বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড বলে থাকেন। আসলে ধর্মের উদ্দেশ্য প্রচার এবং তার বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে যাবতীয় শক্তিকে নিয়োজিত করাই হল জিহাদ। সুতরাং ধর্ম যুদ্ধ ও জিহাদ সমার্থবোধক নয়। ধর্মযুদ্ধ বিষয়টি মূলত পাশ্চাত্যের ইতিহাসের একটি অংশ বা ঐতিহ্য।

আল কোরআনে জিহাদ ও তার সমার্থ শব্দ (কেতাল) ৩৬ বার উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে যা ক্বালব, জিহ্বা, কলম, নৈতিকতা, ঈমান ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জিহাদ কি এবং কেন, জিহাদের উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

মহান আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা "তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। তোমাদের কাছে যা পছন্দনীয় নয়, অথচ তাই তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য কল্যাণকর। আর তোমাদের কাছে যা পছন্দনীয় অথচ তাই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ যা জানেন, তোমরা জান না।" জিহাদের লক্ষ্য ইসলাম প্রচার কিংবা ইসলামের সম্প্রসারণ বা রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে অমুসলিম অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার নয়। বরং ইসলামে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন দূর করা। যেখানে ইসলামী নিয়ম-কানুন চালু আছে, মুসলিম উম্মাহের ঈমানী দায়িত্ব হল সেখানে ইসলামের প্রসার ঘটানো। আর এ কাজটি অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে করা উচিত। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আর জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করা জিহাদের লক্ষ্য। তবে ইসলামে পাঁচটি স্তরে জিহাদ সংগঠিত হতে পারে।

প্রথমত, নির্যাতনের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের উপর এটা অবশ্য পালনীয় যে, কোন রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা যারা রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইসলাম প্রচার ও পালনে বিঘ্ন ঘটায়। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছ না অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে? যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসী জালেম, তার থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দান কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ কর" (নিসা-৭৫)। "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর-যে পর্যন্ত না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।"(বাক্বারা-১৯৩)। রাসূল (স) বলেন, "স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের জীবন-সম্পত্তি রক্ষায়। ইসলামে জিহাদের দ্বিতীয় স্তর হল মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে; অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে যদি মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন, দমন-পীড়ন চালানো হয়, তাদের হত্যা করা হয়, সম্পত্তি চুরি বা অবৈধভাবে দখল করা হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল ভিকটিমকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা এবং তার অধিকারকে সমুন্নত রাখা। আল্লাহ বলেন, "-------তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর। যেমন জবরদস্তি করেছে তারা তোমাদের উপর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (বাক্বারা-১৯৪)

তৃতীয়ত, বিদেশী অপশক্তির বিরুদ্ধে। ইসলামী রাষ্ট্র যদি শত্রু রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে মুসলমানদের উচিত আগে ভাগেই শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ করা। তবে ইসলামী রাষ্ট্র তার মিত্র রাষ্ট্রকে প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় সামরিক সহায়তা দিতে পারবে। আবার বিদেশী আগ্রাসনকে প্রতিহত করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

চতুর্থত, আইনের প্রয়োগের জন্য। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কেউ ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, মুরতাদধর্মী কর্মকাণ্ড চলে বা কোন জনগোষ্ঠী যদি ইসলামী আইন পালনে অনীহা প্রকাশ করে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা দমন করা যাবে।

পঞ্চমত, শান্তি ও যুদ্ধাবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্র ও শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করতে

www.pathagar.com

পারে। সে ক্ষেত্রে শত্রুতার বিষয়টি স্পষ্ট হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" "আল্লাহ্ তায়ালা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, তোমাদেরকে মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম" (মুমতাহিনা-৮,৯)। এভাবে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। জিহাদ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের জীবনের পাশাপাশি ধন-সম্পদ ব্যয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই জিহাদ এজন্য যে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান তথা জীবনব্যবস্থা যাতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম বিনা কারণে অযৌক্তিকভাবে জিহাদ করার পক্ষে নয়। ইসলামের ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধ - বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বর, মুতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করার নৈতিক বৈধতা রয়েছে এবং সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশেই হয়েছে। সুতরাং অনুরূপ পরিস্থিতিতে কিংবা বাস্তব প্রেক্ষাপটে ইসলামে জিহাদ আইনসঙ্গত। আর এরূপ জিহাদের মাধ্যমেই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। অন্যায় আগ্রাসন কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না; যার দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরাশক্তির তাণ্ডবলীলা।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১। শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[Explain the concept of Islam regarding peace and security]

২। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে রাসূল (স) এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the performance of Prophet (sm) to established the world peace and security]

৩। যুদ্ধ কি? ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যাখ্যা কর।
[What is war? Explain the war and Jihad from the Islamic stand-point]

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর - (ক) শান্তি (খ) নিরাপত্তা (গ) যুদ্ধ (ঘ) জিহাদ।
[Explain from the Islamic stand-point (a) Peace (b) Security (c) War (d) Jihad]

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মানবাধিকার ও ইসলাম
Human Rights and Islam

❒ প্রাক-কথা, অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা, মৌলিক অধিকারের ধারণা, মানবাধিকারের ধারণা, মানবাধিকার ধারণার ভিত্তি ও বিকাশ, UNO ঘোষিত মানবাধিকার, ইসলামে মানবাধিকার, ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ, ইসলামে মানবাধিকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ, মদীনার সনদ, বিদায় হজ্জের ভাষণ, নির্বাচিত প্রশ্নাবলি।

প্রাক-কথা
Introduction

অধিকার, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার কিংবা মৌলিক মানবাধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়ে থাকে। তাই প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই এই নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। ইসলামেও মৌলিক মানবাধিকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। এতে অধিকার সমূহও সর্বজনীন। আর ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যাতে পরিপূর্ণ মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। সুতরাং মানব রচিত মনগড়া বিধিবিধানের আলোকে ঘোষিত অধিকার কিংবা বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়ক নয়। নিম্নের আলোচনা থেকে এ বিষয়ে ইসলামের উদারনীতির বাস্তবতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অধিকারের পাশ্চাত্য ধারণা
Western Concept of Rights

সুখী-সুন্দর-সমৃদ্ধ জীবনবোধের ধারণা থেকেই মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীক সংগঠনের অধীনে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে। মানুষের একান্ত প্রত্যাশা এই যে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সবধরনের আনুকূল্য সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য অধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। কেননা সাধারণ অর্থে অধিকার হল সমাজ জীবনের এমন শর্তাবলি যার অভাবে কোন

www.pathagar.com

মানুষের পক্ষেই নিজস্বতা বা স্বকীয়তার প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অধিকার বলতে ব্যক্তির সেই সকল সুযোগ-সুবিধাকে বুঝায় যা উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্ফুরণ ঘটে। তাই সভ্য জীবনের সাথে অধিকারের স্বীকৃতি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অধিকার কোন রাষ্ট্রের চরিত্র মূল্যায়নের চাবিকাঠি। যেমন- **Prof. Laski** মনে করেন, রাষ্ট্র অধিকার প্রদানের মাধ্যমে মানুষের আত্মবিকাশে সাহায্য করে। এজন্য বলা হয় "Every state is known by the rights that it maintains"। অধিকারের সংজ্ঞায় পাশ্চাত্য দার্শনিকমহল যা বলেছেন তাহল-

প্রফেসর লাস্কির মতে, " যে সকল সামাজিক সুযোগ সুবিধা মানুষকে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধির অবস্থা সৃষ্টি করে তাই অধিকার।" আবার প্রফেসর বার্কার বলেন, "অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সেই সকল সুযোগ-সুবিধা যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।" অর্থাৎ অধিকার হল সমাজসৃষ্ট সেই অনুকূল পরিবেশ যা ব্যতিরেকে একজন মানুষ তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। তাই মানব জীবনের জন্য অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহল মানুষের এরূপ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যেসকল অধিকার উল্লেখ করেন তা মূলত তিন শ্রেণীর। যথা- Civil rights, Social and cultural rights, Political rights. এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-জীবনের অধিকার, অবাধে চলাফেরা করার অধিকার, মতামত প্রকাশ, ধর্মপালন, সম্পত্তির অধিকার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, চুক্তির অধিকার, শিক্ষা ও আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, সংবাদপত্রের অধিকার, ভোটাধিকার; সরকারি চাকুরি, সরকারের সমালোচনা করার কিংবা বিদ্রোহ করার এবং বিদেশে আশ্রয় লাভের অধিকার ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য একান্তই অপরিহার্য। তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ভিত্তি বা উৎসমূল হিসেবে অনেক প্রাজ্ঞজন বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নের Socialist-Marxist Revolution কে উল্লেখ করেছেন।

মৌলিক অধিকারের ধারণা
Concept of Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার বলতে সে সব অধিকারের সমষ্টিকে বুঝায় যা একদিকে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য, অপরদিকে সরকার কিংবা কোন বিশেষ মহলের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার মানুষের মৌল চাহিদার সাথে জড়িত, আর এরূপ অধিকার রাষ্ট্রস্বীকৃত ও সংবিধান বিধিবদ্ধ। মৌলিক অধিকারের লক্ষ্য হল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষের মৌল গুণাবলির স্ফুরণ এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠে। অন্য কথায়, মৌলিক অধিকার দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। মৌলিক অধিকার ভঙ্গের কারণে ভিকটিম দেশের সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে অধিকারগুলো ফিরে পেতে পারে। সাধারণভাবে মানুষের Five basic needs যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর এই মৌলিক অধিকারের উপর ভিত্তি করেই মৌলিক মানবাধিকারের ধারণার উৎপত্তি।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের ধারণা
Concept of Human Rights

প্রাজ্ঞজনেরা মনে করেন মৌলিক অধিকার ও মৌলিক মানবাধিকার এক ও অভিন্ন। অধিকারের ধারণা যেমন সমাজের বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিকাশ লাভ করে তেমনি মৌলিক অধিকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিকোণেই বিশ্বমানবতার সভ্য হিসেবে স্থান, কাল, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা দাবি করে তাই মানবাধিকার (Human Rights)। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে সম্মান, শ্রদ্ধা, অধিকার ও নিরাপত্তা লাভ করে তাই হল মানবাধিকার। মৌলিক অধিকার ভঙ্গের কারণে একজন মানুষ যেমন নিজ রাষ্ট্রের কাছে তার প্রতিকার দাবি করতে পারে তেমনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিকার দাবি করতে পারে। মানবাধিকারের অনুপস্থিতিতে মানবজীবন অর্থহীন। এজন্যই বিংশ্বসংস্থা জাতিসংঘ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে।

মানবাধিকার ধারণার ভিত্তি ও বিকাশ
Base and Evolution of the Concept of Human Rights

মানুষ জন্মগতভাবেই কতগুলো অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আর এসব অধিকার অবশ্যই অলঙ্ঘনীয়। মানবাধিকারের বিভিন্ন দলিল বা ঘোষণা একথাই প্রমাণ করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে সর্বজনীন মানবাধিকার গৃহীত ও ঘোষিত হয় তার ভিত্তি হিসেবে নিম্নোক্ত চুক্তি, দলিল বা আইনগুলো উল্লেখ করা হয়।

(i) Magna Carta, 1215 (King John)
(ii) English Petition of Rights, 1628
(iii) Bill of Rights, 1689
(iv) Virginia Bill of Rights
(v) American Declaration of Independence, 1776
(vi) Bill of Rights, 1791 (American)
(vii) Frence Declaration of the Rights of man, 1789.

তবে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এই বলিষ্ঠ ঘোষণাই সম্ভবত মানবাধিকারের দাবিকে জোরালো করে তোলে। ফরাসি বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রুশো তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ "Social Contract" এর মধ্যে লিখেন, "Man is born free, but everywhere he is in chains"। বস্তুত ইউরোপিয় রেনেসাঁর সময় থেকে মানবাধিকারের ধারণা মানবমনে দানা বাঁধতে শুরু করে এবং রেনেসাঁর স্রোতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রাজশক্তি কিংবা ধর্মীয় রীতি-নীতির একচ্ছত্র প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন। রোমান আইনজ্ঞ মিসেরো, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রগতিমনস্ক

www.pathagar.com

দার্শনিক জন লক, রুশো, ভলটেয়ার, মন্টেস্কু প্রমুখের লেখনিতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভৃতি অধিকারের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে মানুষের স্বভাবজাত এই অধিকার মানবাধিকারের দাবিতে পরিণত হয়।

বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ (UNO) এর সাধারণ পরিষদ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে জারি করেছে এই সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র।

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ

ধারা-১ : বন্ধনহীন অবস্থায় সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তাদেরকে বুদ্ধি ও বিবেক অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব নিয়ে তাদের একে অপরের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা-২ : যে কোন ধরনের পার্থক্য যেমন- জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক বা অপর কোন মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম বা অন্যকোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি যত্নবান।

ধারা-৩ : প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪ : কাউকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখা যাবে না। সকলপ্রকার দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা-৫ : কারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-৬ : আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

ধারা-৭ : আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই সকলেরই আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৮ : মৌলিক অধিকার খর্ব করা হলে আদালতে প্রতিকার লাভের ব্যবস্থা থাকবে।

ধারা-৯ : বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার বা নির্বাসিত করা যাবে না।

ধারা-১০ : প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী।

ধারা-১১ : কেউ দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা থাকবে এবং আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে দাবি করার অধিকার থাকবে।

ধারা-১২ : সকল গৃহের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।

ধারা-১৩ : প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বত্র চলাচল, নিজ দেশ ত্যাগ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার পাবে।

ধারা-১৪ : প্রত্যেকেই নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্য দেশে আশ্রয় নিতে পারবে।

ধারা-১৫ : প্রত্যেকেরই জাতীয়তার অধিকার থাকবে।

ধারা-১৬ : সকলেরই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার থাকবে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার থাকবে।

ধারা-১৭ : সকলেরই সম্পত্তির অধিকার থাকবে, কাউকে জোরপূর্বক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা-১৮ : প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।

www.pathagar.com

ধারা-১৯ : প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকবে।

ধারা-২০ : শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার এবং সংগঠনের অধিকার সকলের থাকবে।

ধারা-২১ : প্রত্যেকে প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার পাবে।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ

ধারা-২২ : প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে।

ধারা-২৩ : কাজ করার অধিকার, যে কোন পেশা গ্রহণের এবং পারিশ্রমিক লাভ, কাজের ন্যায্য শর্তাদি লাভের অধিকার প্রত্যেকের থাকবে।

ধারা-২৪ : প্রত্যেকে কর্মজীবনে বিশ্রাম, অবসর বিনোদনের অধিকার পাবে। কাজের সময়ে সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বেতন ও ছুটি ভোগের অধিকারও থাকবে।

ধারা-২৫ : নিজের ও নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য, জীবনমানের উপযোগী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার পাবে। এছাড়া বেকারত্ব, রোগব্যাধি, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা দৈব দুর্বিপাকে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার পাবে। মা ও শিশু বিশেষ যত্নলাভের অধিকার পাবে।

ধারা-২৬ : প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও যে কোন কর্মের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৭ : প্রত্যেকেরই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বিকাশে সুযোগ লাভের অধিকার থাকবে।

ধারা-২৮ : সকলের জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার অধিকার থাকবে।

ধারা-২৯ : কেউ জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না।

ধারা-৩০ : এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে, এ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তিবিশেষের আত্মনিয়োগের প্রমাণ রয়েছে, তাদের প্রতি অধিকারের ঘোষণা আরোপ করা যাবে না।

ইসলামে মানবাধিকার
Human Right in Islam

মানবাধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদার্শনিকদের ধারণা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বজনীন মানবাধিকারের আলোকে বলা যায় মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের ধারণা আরো উদার, কল্যাণময় এবং সর্বজনীন। মানবাধিকার সম্পর্কে অকাট্য সত্য এই যে, বিশ্ব মানব বিংশ শতাব্দীতে এসে যে মানবাধিকারের ধ্বনি শুনছে ইসলাম তা প্রায় দেড় হাজার পূর্বেই ঘোষণা করেছে। বস্তুত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ আল কোরআনে মানবজাতির জন্য যে অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা কোন শ্রেণী, কোন জাতি বা কোন গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং তা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষসহ সকল প্রাণীকুলের জন্য। অর্থাৎ মানুষকে

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করে আল্লাহতায়ালা যে শুধু মানুষের অধিকারের ঘোষণাই দিয়েছেন এমন ধারণা ভুল, বরং আল্লাহর যমীনে যত সৃষ্টি আছে সবার অধিকারের নিশ্চয়তা কোরআনে বিধৃত আছে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকারের জন্য কেবল আল কোরআনের শরণাপন্ন হবে। শুধু মানুষে-মানুষে নয় সৃষ্টিকুলের প্রতি কি আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কেও ইসলামে দিক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু মানব রচিত মানবাধিকারের ঘোষণায় তা নেই। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় জাতিসংঘের ঘোষিত বিশ্বজনীন মানবাধিকার ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত। ইসলামের আলোকে মানবাধিকারের বিশদ বিবরণ থেকে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষসহ বিশ্বচরাচরে ক্রিয়াশীল সকলের যে অধিকার ঘোষিত হয়েছে তাঁর সংক্ষিপ্তসার হিসেবে মদীনার সনদ এবং রাসূল (স) এর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণকে উল্লেখ করা যায়। কেননা এ দুটি দলিলে এমন কোন অধিকার নেই যার উল্লেখ করা হয়নি।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক, ইবাদত, খিলাফত, আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন, দুনিয়ার কাজের জন্য খোদ দুনিয়াতে এবং পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতে জবাবদিহিতা, কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয় থেকে ইসলামে মৌলিক মানবাধিকারের ধারণা সুস্পষ্ট। সাধারণ মানবাধিকারের ন্যায় ইসলামে মানবাধিকারেরও রয়েছে ঐতিহাসিক, আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি যা কোরআনের সূরা বাক্বারা-৩১, আল-ইমরান-৩৩-৩৪, মায়েদা-৩, তওবা-১২২, মায়েদা-৮৭, নাহল-১১৬, নিসা-৪, ২৪, ২০ ইত্যাদি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামে মানবাধিকার মূলত মানব মর্যাদা, ন্যায়বিচার, জাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির মধ্যে নিহিত।

ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ

১. রিযিক তথা জীবন জীবিকার অধিকার : "আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি পরম দয়াশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।" (শূরা-১৯)। রিযিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে রিযিক বা জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার হিসেবে গণ্য। আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, আল্লাহর অসংখ্য গুণবাচক নামের একটি হল রাযযাক। আল্লাহর ঘোষণা – "তোমরা আল্লাহর দেয়া হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি থেকে আহার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যার প্রতি তোমরা ঈমানদার (বিশ্বাসী)" (মায়েদাহ-৮৮)। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা অপরাপর আয়াতে উল্লেখ করেছেন, তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জীবজন্তুর রিযিক দানের দায়িত্ব তাঁরই, তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে যমীনে ফসল উৎপন্নের সুব্যবস্থা করেন ইত্যাদি।

২. জীবনের নিরাপত্তার অধিকার: জীবন এবং জীবনের নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। প্রত্যেকেই আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নিরাপদ, সম্মানজনক জীবন-যাপনের অধিকারী। কোরআনের ঘোষণা "কোন নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে অভিযুক্ত ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করলে, সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন সমগ্র মানুষকে রক্ষা করল।" (মায়েদাহ-৩২)

www.pathagar.com

বিনা কারণে মানুষ হত্যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটা জঘন্যতম অপরাধ (কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত)। আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যৌক্তিক কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কর না।" (বনী ইসরাঈল-৩৩) এবং 'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিন বান্দাকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম।" (নিসা-৯৩)। তবে পাঁচটি কারণে ইসলামে কতল বা হত্যা বৈধ। যথা-

(i) অকারণে হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা।

(ii) সত্য দ্বীনের পথে বাধাদানকারীদেরকে জিহাদের ময়দানে হত্যা করা।

(iii) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে হত্যা করা।

(iv) বিবাহিত নর-নারীকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।

(v) মুরতাদ-তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীকে হত্যা করা।

৩. ধর্মমত বা জীবন বিধান গ্রহণ ও পালন: মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য রিযিকের পাশাপাশি সকল জীবনোপকরণের সুবন্দোবস্তও তিনি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করেছেন এবং একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে দান করেছেন। যেমন- সূরা কাফিরূন এর ঘোষণা। তবে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও এবং আল্লাহ আদেশ দেয়া সত্ত্বেও যারা তাঁর মনোনীত জীবন বিধানকে গ্রহণ করবে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ এরশাদ করেছেন – "দ্বীনের (ধর্মমত গ্রহণের) ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। কেননা প্রকৃত হেদায়েত ও সত্য গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে---।" (বাক্বারা-২৬৫)। কিন্তু আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেন, "আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হল ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।"

৪. মান-সম্ভ্রমের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নাগরিকদের ইজ্জত-আবরুর গ্যারান্টি দেয়া। বর্তমানকালে প্রতিটি রাষ্ট্রেই নাগরিকদের এই বিষয়টি পদদলিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রই নাগরিকদের মান-সম্ভ্রম রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। কিন্তু ইসলামই পারে এ ব্যাপারে যথার্থ নিশ্চয়তা বিধান করতে। কাউকে উপহাস করা, মন্দ নামে ডাকা, নিন্দা করা এবং অসদাচরণ প্রভৃতি গর্হিত কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে কোরআনে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে সূরা হুজরাতের-১২, নিসা-১৪৮, নূর ২৩-২৫, ৩০-৩১ আয়াতে। রাসূল (স) বলেন, কোন মুসলমানের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম অত্যাচার - (আবু দাউদ)।

৫. ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা : ইসলামে ব্যক্তিগত জীবনেরও গ্যারান্টি রয়েছে। কারও ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ ইসলামে নিষিদ্ধ। এমনকি কারও গোপনীয় বিষয়েও অন্যের মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, "এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বরং তোমরা একে ঘৃণাই করবে।" (হুজরাত-১২)। অর্থাৎ অন্যের গোপন বিষয় অন্বেষণ, পরনিন্দা, গুপ্তচরবৃত্তি নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

৬. মালিকানার নিরাপত্তা : বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের মালিকানা ইসলামে স্বীকৃত একটি মৌল অধিকার। সেই সাথে সম্পদকে সংরক্ষণের জন্যও রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি। তবে এই সম্পদ থেকে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় যাকাত, দান-খয়রাত, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ, রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা যে কোন সংকটময় মুহূর্তে ব্যয় এবং রাষ্ট্র ধার্যকৃত যে কোন কর (Tax) পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয় অবৈধ খাতে ব্যয় থেকে বিরত থেকে সম্পদের মালিকানা নিরাপদ করতেও ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদে মালিকের যে সকল অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে তাহল – নিজের ভোগ-ব্যবহার, অধিক মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা এবং মালিকানাস্বত্ব রক্ষার ব্যবস্থা। আল্লাহর ঘোষণা "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" (বাক্বারা–১৮৮)

রাসূল (স) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়া অবধি তোমাদের কাছে এমনি পবিত্র, যেমন পবিত্র আজকের এই দিন মাস (৯ জিলহজ্ব) এই শহর (মক্কা শরীফ)।" সম্পদের মালিকানা সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" (বুখারী)

৭. প্রত্যেকেই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী : ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিক অন্যের কৃতকর্ম বা অপরাধের কারণে দোষী সাব্যস্ত হবে না বা অন্যের অপরাধের কারণে নিরপরাধকে গ্রেফতার করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে উহার ফল প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে উহার ফল ভোগ করবে।" "রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "এখন থেকে অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী থাকবে। পিতার পরিবর্তে পুত্র কিংবা পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে গ্রেফতার করা যাবে না।"

৮. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের অবশ্যই যে কোন অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। এমনকি জালেম শাসকের নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বিদ্রোহ করাও বৈধ। কারণ ইসলামে অন্যায়ের কাছে মস্তক অবনত করার কোন অবকাশ নেই। সমাজের এ সকল অনাচার-অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা, জালেম শাসকের আনুগত্য থেকে বিরত থাকা একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জালেম শাসকের সামনে ন্যায় কথা বলে তার জিহাদই সর্বোত্তম।" (আবু দাউদ, ইবনে মাযা, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদ)।

৯. স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্র ও সরকারের যে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ ইসলাম সকল মানুষকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার কোরআনিক রাষ্ট্র (Quranic State) এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের সত্যাশ্রয়ী চার খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ পূর্ণমাত্রায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেছে। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শকে

www.pathagar.com

অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কোরআনের ঘোষণা, "মুসলমানদের সকল কর্মকাণ্ড পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হবে।" (শূরা-৩৮)

১০. আইনের দৃষ্টিতে সাম্য : ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার লাভ করবে। কারণ মানুষ এক আদম (আ) থেকে সৃষ্ট। অতঃপর মানুষকে বিভিন্ন গোত্র-বংশে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। অতএব আইন সকলের জন্য সমান, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে ফুটপথের একজন নিগৃহীত ব্যক্তি পর্যন্ত এক ও অভিন্ন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। সুতরাং ইসলামে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বৈষম্যের সুযোগ নেই।

১১. ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার : মানবাধিকারের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার লাভের অধিকারী। যুগে যুগে বিভিন্ন গোত্রে বা জাতির নিকট নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে" (হাদীদ-২৫)। "আমি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হয়েছি" (শূরা-১৫)। "বলুন আমার প্রতিপালক আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন" (আরাফ-২৯)। "তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার কার্যপরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে" (নিসা-৫৮)। রাসূল (স) বলেন – "ন্যায়পরায়ণ বিচারকের একদিন ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে সর্বোত্তম।" (আল হাদীস)

এমনিভাবে আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় সাক্ষ্যদানের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুদৃঢ় থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, যদিও তা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায় তবুও। সে ধনী হোক কিংবা গরিব হোক, আল্লাহ তাদের চেয়ে উত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না। আর তোমরা যদি উল্টা-পাল্টা কথা বল এবং পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত" (নিসা-১৩৫)। অতএব আল্লাহর অমোঘ নির্দেশ - ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সত্য সাক্ষ্য দেয়া, সত্য সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করা একজন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

১২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার : ইসলাম মানব জাতিকে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে, তা অন্য কোন আদর্শে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়া, সমাজের অনগ্রসর ও নিঃস্বদের সাবলম্বী করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং সমাজকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা প্রত্যেকের দায়িত্ব। অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করে সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ করে রাখা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহর ঘোষণা, "তাদের (মুসলমানদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্ধারিত হক রয়েছে।" (মা'আরিজ-২৪-২৫), "আর তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (যারিয়া-১৯), এবং "তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর।" (মুযাম্মিল-২০)

www.pathagar.com

"ধনসম্পদ যেন তোমাদের বিত্তবানদের মাঝে কুক্ষিগত না হয়।" (হাশর-৭), "সৎকর্ম শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে নেই, বরং বড় সৎকর্ম এই যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাকূলের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, ভিক্ষুক, মুসাফির ও মুক্তিকামী দাসদের জন্য।" (বাক্বারা-১৭৭)। এভাবে যারা সৎ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে ইসলামের শর্তানুযায়ী প্রয়োজনমত সঠিক পন্থায় ও যথার্থ ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে উভয় জীবনে মহাপুরস্কারের সুব্যবস্থা।

১৩. শিক্ষার অধিকার : ইসলাম মানুষকে শিক্ষাগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। রাসূল (স) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত করে রাসূল (স) বলেন, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা কর।" বিদ্যার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়ারও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য শিক্ষা পূর্বশর্ত। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তিক, সামাজিক, পরিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। ইসলামে শিক্ষার অধিকার সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত।

১৪. শ্রম, শ্রমিক ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের অধিকার : ইসলামে শ্রমের অধিকার স্বীকৃত। মজুরি ও কাজের শর্তাবলির ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। শ্রমিক নিয়োগ এবং তাঁর ন্যায্য পারিশ্রমিক যথাসময়ে পরিশোধ করার তাগিদও ইসলাম দিয়েছে। বলা হয়, শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা উচিত। মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে শ্রম বিনিয়োগ। শ্রমিকের অধিকার ও ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার উপর ইসলাম অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে শ্রমিকের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

১৫. সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে প্রত্যেক নাগরিকের সভা-সমাবেশ বা সংগঠন করার অধিকার রয়েছে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পরিচালন ও রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য অবশ্যই সুসংগঠিত সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে। যেই সংগঠনের দায়িত্ব মূলত ইসলামের শাশ্বত নীতির বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (ইমরান-১১০)। এটা হল মুসলমানদের সামষ্টিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে কেউ অব্যাহতি পাবে না। আল্লাহর নির্দেশ – "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে আকঁড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (বাক্বারা)। এবং যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে এ গুরুদায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছিল। যেহেতু নবী আর আসবে না সেহেতু শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স) তাঁরই উম্মত তথা প্রতিটি মুসলমানকে এ দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতে হবে। সুতরাং ইসলামে সভা-সংগঠনের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে।" (ইমরান-১০৪)

www.pathagar.com

১৬. পাপাচার থেকে বিরত থাকার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সকল প্রকার গর্হিত কাজ তথা পাপাচার-অনাচার, অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। শাসকের এমন আদেশ অমান্য করাও বৈধ যা পালন করলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে সকল প্রকার পাপাচার থেকে দূরে অবস্থান করে সমাজ ও রাষ্ট্রকেও এ ধরনের কাজ থেকে মুক্ত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ইসলামে মানবাধিকারের কোন সীমা নেই। কারণ আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল সকল কিছুর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের অধিকার রয়েছে। আবার জীবজন্তুর সকল অধিকারও ইসলামে স্বীকৃত। উপরে উল্লিখিত অধিকারগুলো ছাড়াও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি বিশেষত শিশুকন্যার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, অমুসলিম ও জিম্মীদের সুনির্দিষ্ট অধিকার ইত্যাকার অধিকারসমূহ ইসলামে স্বীকৃত।

ইসলামে মানবাধিকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ত্রুটিপূর্ণ এবং এ কারণেই এর বাস্তবায়নও সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মানব রচিত মানবাধিকার সনদ নিয়ে বিশ্বময় চলছে দ্বন্দ্ব সংঘাত। ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যেখানে মানবাধিকারের প্রশ্নে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ইসলামে মানবাধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির দয়ার দান নয়। বরং এটা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক পরিসীমা নির্বিশেষে সকলের জন্য মহান আল্লাহর এক পরম আর্শীবাদস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শ বা ব্যবস্থা-পদ্ধতি মানবাধিকারকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। তাই ইসলাম মানুষের অধিকারগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এর সঠিক বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনাও দিয়েছে। ইসলামে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কোরআনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অতঃপর যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ একান্তই আবশ্যক সেগুলো হল –

১. মানব রচিত মতবাদসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ইসলামী রাষ্ট্রে এক, অদ্বিতীয় আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে মেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সার্বভৌমত্বকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার হবে আমানতদার। সরকার সম্পর্কে এই ধারণা মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকের অধিকার তার কর্তব্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য কর্তব্যও যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

৪. মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন যেমন অভিন্ন তেমনি রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও অভিন্ন। এই অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে সকলকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে মানবাধিকার বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ, দক্ষ ও সুদূরপ্রসারী সুনেতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বস্তুত নেতৃত্ব হতে হবে কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত গুণাবলিসম্পন্ন যেখানে থাকবে গণজবাবদিহিতা, আদালত, আইনসভা (শূরা) শেষত আখেরাতে মহান স্রষ্টার

www.pathagar.com

সমীপে জবাবদিহিতা। থাকবে খোদভীরুতা, আদল, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা। সেই সাথে স্থায়ী সংবিধান, প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব, বিচার বিভাগের প্রাধান্য। এভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপগুলো অনুসৃত হলে এর সুফল ভোগ সম্ভব হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর বাণী "তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রতিটি বস্তুর কার্যনির্বাহী।" (আন'আম-১০২)

শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজে নাগরিকের অধিকার ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা অর্জন করতে পারে। আর ইসলাম চায় শ্রেণী-শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ, যেখানে সকল নাগরিক পূর্ণমাত্রায় সকল অধিকার উপভোগের সুযোগ পায়।

মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান
Modina Chartar : The first written constitution of the world

মুহাজির, আনসার, ও ইহুদীদের সঙ্গে রাসূল (স) এর চুক্তির বিষয়বস্তু

ধারা :

(১) এটি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে একটি লিখিত ফরমান যা মক্কা থেকে হিজরতকারী কুরাইশ ও ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন, যারা এই উভয়পক্ষের অনুবর্তী রয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে শরীক হবেন ও একসঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন, তাদের জন্য।

(২) তাদের সকলে একটি মিল্লাত বা জাতিসত্তা রূপে (উম্মাহ) বিবেচিত হবে এবং তাদের বাইরে যারা আছে তারাও অন্য একটি একক জাতিসত্তা রূপে বিবেচিত হবে।

(৩) কুরাইশ মুহাজিরগণ বর্তমান রীতি অনুযায়ী রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাদের মুক্ত করার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করবে, যেন ঈমানদারগণের পারস্পরিক আচরণ ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(৪) বনী আওয়াফ তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন ঈমানদারদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

(৫) বনী আল হারিস (ইবনে আল খাজরাজ) তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং সবাই মিলে তাঁদের বন্দীদের মুক্ত করবে, পারস্পরিক আচরণ যেন সদয় ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

(৬) বনী সাঈদা তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

(৭) বনী জুশাম তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফপূর্ণ হয়।

www.pathagar.com

(৮) বনী আল নাজ্জার তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে তাদের রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফভিত্তিক হওয়া নিশ্চিত হয়।

(৯) বনী আল আমর ইবনে আওয়াফ তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়।

(১০) বনী আল নাবীত তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ ও তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পারিক আচরণ ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

(১১) বনী আল আওয়াস তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ ও তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন ঈমানদারদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ইনসাফভিত্তিক হয়।

(১২.ক) ঈমানদারগণ বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তির অর্থ অথবা রক্তমূল্য পরিশোধের অভাবে তাদের মধ্যকার কাউকে দুঃস্থ অবস্থায় নিপতিত হতে দেবে না।

(১২.খ) কোন ঈমানদার ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের মুক্ত করা দাসকে তার মিস হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।

(১৩) ঈমানদার খোদাভীরুগণ সর্বক্ষণ ঐ সমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত থাকবে, যারা যুলুম, অনাচার ও পাপ চর্চার বিস্তার করার জন্য নিয়োজিত হয় এবং ঈমানদারদের মধ্যে ভাঙ্গন, অনৈক্য ও ফিতনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়, এসব দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সকল মুমিনদের হাত একটিমাত্র প্রতিবাদী হাত হয়ে উত্তোলিত হবে, যদি অপশক্তির কেউ তাদের সন্তানও হয়।

(১৪) কোন ঈমানদার ব্যক্তি একজন কাফেরের বদলা হিসেবে কোন মুসলমান কে হত্যা করতে অথবা একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফের কে সাহায্য করতে পারবে না।

(১৫) আল্লাহর নিরাপত্তা সর্বব্যাপী। ঈমানদারদের মধ্য থেকে অতি সাধারণ ব্যক্তি তাদের পক্ষে কাউকে আশ্রয় প্রদান করতে পারবে না। ঈমানদারগণ পরস্পরের বন্ধু ও একে অপরের হেফাজতকারী এবং প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় তারা সকলে পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য।

(১৬) ইহুদিদের মধ্য হতে যারা আমাদের অনুগত থাকবে তারা সকল ক্ষেত্রে আমাদের সমান অধিকার ভোগ করবে। তাদের কারো ওপর জুলুম করা চলবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা যাবে না।

(১৭) ঈমানদারগণের শান্তি অবিভাজ্য। ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কোন শান্তি স্থাপিত হবে না। শান্তির শর্তাবলী অবশ্যই সকলের জন্য ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক হতে হবে।

(১৮) প্রতিটি অভিযানের সময় একজন অশ্বারোহীর পেছনে আরেকজন অশ্বারোহী থাকবে।

(১৯) আল্লাহর পথে জিহাদের সময় যারা নিহত হয়েছেন, ঈমানদারগণ এক এক করে তাদের রক্তের বদলা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

(২০.ক) সর্বাবস্থায়ই ঈমানদার ও পরহেজগারগণ সর্বাধিক মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

(২০.খ) কোন অংশীবাদী পৌত্তলিক তার আশ্রয়াধীন কুরাইশদের সম্পত্তি বা কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে না অথবা একজন মুসলমান তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হলে তাকে বাধা দান করতে পারবে না।

(২১) কোন সঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যার জন্য দায়ী হলে, অতঃপর নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য পরিশোধ করে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ঈমানদারগণ তার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানে বাধ্য হবে।

(২২) এই নীতিমালার শর্তাবলীর স্বীকৃতি প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কোন অবস্থায় একজন দুর্বৃত্ত পাপীকে আশ্রয় দেয়া বা তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হবে না। কেউ এরূপ করলে সে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের অনলে দগ্ধ হবে এবং তার কোন তওবা বা দান কবুল হবে না।

(২৩) চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর কিতাব অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (স) তার চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

(২৪) ইহুদীরা মুমিনদের সঙ্গে শরীক হয়ে যুদ্ধ করতে চাইলে তাদের সকল ব্যয়ভার নিজেদেরকেই বহন করতে হবে।

(২৫) চুক্তিবদ্ধ বনু আওয়াফ গোত্রের ইহুদীরা মদীনায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং মুসলমানদের সঙ্গে একই রাজনৈতিক সত্তারূপে বিবেচিত হবে। ইহুদীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে এবং মুসলমানগণ ও স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে। এর মধ্যে যারাই সীমা লঙ্ঘন করবে তারা কেবলমাত্র নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করবে।

(২৬) বনু আল নাজ্জারের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের অনুরূপ।

(২৭) বনু আল হারিসের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত।

(২৮) বনু জুশামের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত।

(২৯) বনু সাঈদার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত।

(৩০) বনু আওয়াসের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত।

(৩১) বনু আল সালাবার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত, তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে অন্যায়কারী ও পাপীরা তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করছে।

(৩২) সীলাবার অন্তর্গত জাফনা গোত্রের ইহুদীরা তাদেরই মত।

(৩৩) বনু শুতাইবার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মত।

(৩৪) বনু সালাবার চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাদের মত বিবেচিত হবে।

(৩৫) ইহুদীদের ঘনিষ্ট বন্ধুরা তাদের মত বিবেচিত হবে।

(৩৬.ক) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অনুমতি ছাড়া কেউ যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না।

(৩৬.খ) তবে একে অন্যকে আহত করলে তার বদলা গ্রহণ করা থেকে কাউকে বাধা দেয়া হবে না। কোন ব্যক্তি জুলুমের শিকার না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব হুঁশিয়ারী ছাড়াই কাউকে হত্যা করবে, সে তার নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনকে হত্যা করবে, আল্লাহ মজলুমের সহায়তাকারী।

www.pathagar.com

(৩৭.ক) ইহুদীরা অবশ্যই তাদের ব্যয়ভার এবং মুসলমানরা তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। এই চুক্তির আওতাধীন কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে তারা পরস্পরকে অবশ্যই সাহায্য করবে। তারা অবশ্যই পারস্পরিক পরামর্শ প্রদান ও পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাই পাপ থেকে উত্তম হেফাজতকারী।

(৩৭.খ) চুক্তিবদ্ধদের কেউ সীমালঙ্ঘন বা আনাচারে লিপ্ত হলে সেজন্য চুক্তির জন্য শরীককে দায়ী করা হবে না। কারো উপর যুলুম করা হলে সর্বাবস্থাতেই তাকে সাহায্য করা হবে।

(৩৮) যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে ততদিন পর্যন্ত ইহুদীদেরকে ও মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধের ব্যয়ভার অবশ্যই বহন করতে হবে।

(৩৯) এই চুক্তির আওতাধীন ব্যক্তিবর্গের জন্য মদীনা হবে নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

(৪০) কোন ব্যক্তির আশ্রয়াধীন বাইরের লোক তার মেহমান হিসেবে গণ্য হবে এবং তার কোন ক্ষতিসাধন অথবা তার উপর কোন জুলুম করা হবে না।

(৪১) কোন মহিলাকে তার পরিবারের সদস্যদের সম্মতিছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

(৪২) কোন মতবিরোধ বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ দেখা দিলে তার চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এর দ্বারা করতে হবে, আল্লাহ এই চুক্তির ধার্মিকতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততাকে কবুল করবেন।

(৪৩) কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

(৪৪) ইয়াসরীবের উপর কোন বহিঃশক্তি হামলা চালালে চুক্তির শরীক পক্ষগুলো অবশ্য একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

(৪৫.ক) তাদেরকে যদি সন্ধি করতে ও তা বজায় রাখতে বলা হয়, তাহলে তারা অবশ্যই তা করবে এবং তারা যদি ঈমানদারদের কাছে অনুরূপ দাবি জানায় তাহলে ঈমানদরগণও অবশ্যই তা পালন করবে তবে নিজেদের ধর্মীয় বিরোধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে এই শর্ত কার্যকর হবে না।

(৪৫.খ) প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায়ের উপর মদীনার সেই এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে যে এলাকায় তারা বসবাস করে।

(৪৬) বনু আওয়াস গোত্রের ইহুদীরা ও তাদের মিত্ররা তাদেরই মত তারা উভয়ে চুক্তিবদ্ধ অন্যান্যদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী হবে এবং চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে দায়-দায়িত্ব ও সুবিধা ভোগ করে, তারাও তা ভোগ করবে। সত্যনিষ্ঠতাই পাপ থেকে হেফাজত করে; প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ এই দলিল অনুমোদন করেছেন।

(৪৭) এই চুক্তিপত্র কোন জালেম, দাঙ্গাবাজ অপরাধীর জন্য আত্মরক্ষার স্বার্থে কোন অবস্থাতেই ব্যবহৃত হবে না। যারা যুদ্ধে শরীক হয় কিংবা নগরীতে গৃহস্থালীর কাজের নিয়োজিত থাকে, সবাই নিরাপদ থাকবে। শুধু তারাই এই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে যাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হবে। আল্লাহ চুক্তির প্রতি নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্তব্যক্তিদের প্রতি সাহায্যকারী ও নেকবান হবেন এবং তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) ও সে ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক ও দায়িত্বশীল থাকবেন।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের ভাষণ : মানবতার মুক্তির মহাসনদ

মানবতার মুক্তির দিশারী, সৃষ্টিকুলের রহমতস্বরূপ নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স) এর দীর্ঘ জীবন সায়াহ্নে আল্লাহর দেয়া গুরুদায়িত্ব পালনের শেষ অধ্যায়ে এবং জীবনের শেষ হজ্জব্রত পালনে উপস্থিত হয়ে পবিত্র আরাফাতের ময়দানে ১০ হিজরীর ৯ জিলহজ্জ, ৬ মার্চ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ সমবেত প্রায় দু'লক্ষ মুসলমানের জনসমুদ্রে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা সর্বকালের, সর্বজাতির তথা মানবতার মুক্তির মহাসনদ এবং সর্বজনীন মানবাধিকারের গ্যারান্টিস্বরূপ। এটি মানব রচিত সকল মানবাধিকার সনদের তুলনায় সর্বোত্তম, কল্যাণময় এবং শ্রেষ্ঠ। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যার উল্লেখ করা হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (স) সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন –

উপস্থিত মানবমণ্ডলী আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। হয়ত আমি এ বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সাথে সমবেত হতে পারব না। আল্লাহ বলেন, হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেজগার।

সুতরাং কোন অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনাররের; কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের, অথবা কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের তাকওয়া ছাড়া কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সমস্ত মানুষ আদমের (আ) সন্তান। আর আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্ট।

জেনে রাখ,.পদমর্যাদার দাবি, হত্যা ও সম্পত্তির সমস্ত প্রতিশোধ রহিত করা হল। শুধু কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান ও হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ব্যতীত।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর সম্মুখে তোমরা দুনিয়ার বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে আর অন্যান্য মানুষ আখিরাতের পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হবে। অন্যথায় আমি আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জন্য কোন উপকার করতে পারব না। অতঃপর বললেন-

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে অন্ধকার (জাহেলিয়া) যুগের অহংকার এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে পারস্পরিক গৌরববোধ রহিত করেছেন।

হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের পরস্পরের জীবন-সম্পত্তি ও মান-সম্ভ্রম তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ তথা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত এমনি পুতঃপবিত্র, যেমন পবিত্র অদ্যকার এই (জুমার) দিন এই মাস (জিলহজ্ব) এবং এই শহর (মক্কা)।

তোমাদের সকলকেই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে, তিনি তোমাদের নিজ নিজ কৃতকর্ম (আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

সাবধান! আমার মৃত্যুর পর তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরের হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত না হও।

তোমাদের কারও কাছে কোন আমানত থাকলে সে যেন তা যথার্থ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়।

হে জনমণ্ডলী! আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোন এবং অনুধাবন কর। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই (One Brotherhood)।

তোমাদের অধীন গোলামদের (দাস) প্রতি যত্নবান হবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খাওয়াবে। তোমরা যে ধরনের পোশাক পরিধান করবে, তাদেরকেও অনুরূপ পরতে

www.pathagar.com

দিবে। তারা যদি এমন কোন অন্যায় করে বসে যা তোমরা ক্ষমা করতে চাওনা তাহলে তাদেরকে বিক্রি করে দাও, তাদেরকে শাস্তি দিও না।

জেনে রাখ জাহেলিয়াত যুগের সমস্ত বিষয় বিলুপ্ত ঘোষিত হল এবং অন্ধকার যুগের প্রতি হত্যার বিধান রহিত করা হল। সর্বপ্রথম আমি আমর বিন বরীয়া বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের প্রতি হত্যার দাবি রহিত করছি যিনি বরীয়ার দুধ ছেলে ছিলেন, যাকে হোযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল।

জাহেলিয়াতের সকল প্রকার সুদ রহিত করা হল। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ রহিত করছি।

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক প্রাপকের (উত্তরাধিকারীর) জন্য তার ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন আর উত্তরাধিকারীর জন্য কোন প্রকার অসিয়তের সুযোগ নেই।

জেনে রাখ! যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা (পিতা) ছাড়া অন্যের সাথে নিজের জন্মসূত্র স্থাপন করে এবং যে নিজ মনিব (মালিক) ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলে মানে, তার উপর আল্লাহতায়ালার লানৎ বা অভিসম্পাত।

ঋণ পরিশোধযোগ্য হক, ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা যে কোন বস্তু ফেরতযোগ্য, উপঢৌকনের বিনিময় প্রদান করা উচিত। আর জামিনদার তার জরিমানা আদায় করতে বাধ্য থাকবে। কারও জন্য তার অন্য ভাইয়ের কোন কিছুই বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট চিত্তে তা দান করে। তোমরা কখনো একে অপরের উপর জুলুম করবে না।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি তোমাদের স্ত্রীদের যেরূপ অধিকার রয়েছে তদ্রূপ তাদের প্রতিও তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল স্ত্রীরা নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে বিছানায় আনবে না এবং প্রকাশ্যে অপকর্মে লিপ্ত হবে না। যদি তারা এরূপ করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আছে, সংশোধনের জন্য তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে এবং মৃদু শারীরিক শাস্তি দিবে। এতে যদি তারা বিরত থাকে তাহলে সাধ্যমত তাদের ভরণ-পোষণ চালিয়ে যাবে, তাদের সাথে ভাল আচরণ করবে।

নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর। কারণ তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তারা নিজেরা কোন কিছুর উপর অধিকার রাখে না। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় ইজাব-কবুলের মাধ্যমে আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর নামেই তারা তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে। কোন নারী তাঁর স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ধন-সম্পত্তি থেকে বিন্দুমাত্র কাউকে দিতে পারবে না।

হে মানবমণ্ডলী! শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, এই আরব উপদ্বীপে সে আর পূজা পাবে না। তবে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। অতএব তোমরা তার কবল থেকে দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত কর।

আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা তোমরা দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি হল আল্লাহর কিতাব কোরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা একারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।

www.pathagar.com

হে লোক সকল! আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত নেই। তোমরা আপন প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসের রোজা রাখবে, সন্তুষ্টচিত্তে সম্পদের যাকাত আদায় করবে। বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ্ব করবে। শাসকের আনুগত্য করবে, এভাবে আপন প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হে শ্রোতা মণ্ডলী! যদি কোন হাবসী (কাফ্রী) ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়, যে আল্লাহর কোরআন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহলে তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর।

তোমরা ভাল করে শোন। এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বার্তাগুলো যথাযথভাবে পৌঁছে দিবে। হতে পারে অনুপস্থিতরা উপস্থিতদের চেয়ে আমার বার্তা অধিকতর হেফাজত করবে।

আমি কি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি? সমবেত জনসমুদ্র থেকে সমন্বয়ে উচ্চারিত হল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অতঃপর রাসূল (স) বললেন "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক"। কিয়ামত দিবসে তোমরা আল্লাহর দরবারে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? উপস্থিত সকলেই উত্তর দিলেন, "আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। রিসালাত, নবুয়্যত ও উম্মতকে নসীহতের হক আদায় করেছেন।"

একথা শুনে রাসূল (স) নিজের শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের পানে উঠিয়ে উপস্থিত জনস্রোতের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, তুমি সাক্ষী থাক, তুমি সাক্ষী থাক।

অতঃপর কোরআনের আয়াত নাযিল হল- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য আমার পছন্দনীয় দ্বীন করলাম।" (মায়েদাহ–৩)

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. অধিকার কি? মৌলিক অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is Right? Explain the concept of Fundamental rights.]

২. মানবাধিকার কি? মানবাধিকার ধারণার বিকাশধারা আলোচনা কর।
[What is Human Rights? Discuss the development of Human Rights.]

৩. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ পর্যালোচনা কর।
[Review The Human Rights charter decleration of UNO.]

৪. ইসলামে মানবাধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
[Explain the concept of Human Rights in Islam.]

৫. ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারসমূহ আলোচনা কর।
[Discuss The Human Rights which give Islam.]

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী আইন : উৎস ও বৈশিষ্ট্য
Islamic Law : Sources and Features

❒ প্রাক-কথা, আইনের প্রচলিত ধারণা, আইনের অর্থ ও সংজ্ঞা, আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, আইনের উৎস, ইসলামী আইনের উৎস, ইসলামী আইনের (শরীয়া) বৈশিষ্ট্যবলি

প্রাক কথা
Introduction

মানুষ একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন কতিপয় বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। মানুষের নিজের প্রয়োজনেই এসকল বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছে বা গড়ে উঠেছে। সুন্দর ও সুসংহত জীবনের জন্য বিধি-বিধান বা আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু আইন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ভিন্নতর। ইসলাম অর্থ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, রাসূল (স) এর সুন্নাহর অনুসরণে পরিচারিত এক সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম যা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বজনীন জীবনদর্শন। আর বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান প্রভু আল্লাহর কাছে এক ইসলামই গ্রহণযোগ্য অন্য কিছু নয়। ইসলামে বিধান দাতা, সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই সব কিছু পরিচালিত হবে। তাই ইসলামী আইন বা শরীয়াহ্ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা একান্তই শ্রেয়। তবে আইনের প্রচলিত তথা পাশ্চাত্য ধারণা সম্পর্কেও অবগত হওয়া প্রয়োজন।

আইনের প্রচলিত ধারণা
Traditional Concept of Law

সমাজ বা রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কতকগুলো বিধি-নিষেধের আলোকে পরিচালিত হত। আদিম বর্বর কিংবা বন্যদশা থেকে কালক্রমে সভ্যতার সোপান রচনার পশ্চাতে আইন বা বিধি-বিধান এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। সমাজের মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন মেনে চলার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও সুসংহত করার পক্ষে

www.pathagar.com

বদ্ধপরিকর। মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য আইন অপরিহার্য। তবে এ আইন তৈরি হওয়ার পশ্চাতে কতকগুলো Reason বা যুক্তি/ উৎস কাজ করে এবং আইনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে যা এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

আইনের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definition of Law

'আইন' ফারসি ভাষার একটি অতি পরিচিত শব্দ, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Law. এটি Teuntonic word 'Lag' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। বাংলা ভাষায় Lag- এর অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আইন হল কতকগুলো নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী। আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ মাধ্যম।

আইনের সংজ্ঞা সম্পর্কে দার্শনিকগণ ঐকমত্যে পৌছতে সক্ষম হন নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

(i) প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **Holland** আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "A law is a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority." (মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত কতকগুলো সাধারণ নিয়মই হল আইন।)

(ii) চরমপন্থী রাষ্ট্রদার্শনিক **Thomas Hobbes**-এর মতে, "The civil law is the command of him which indowed with supreme power in the state concerning the future actions of his subjects."(প্রজাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশই আইন।)

(iii) **John Austin** আইনের একটি ছোট অথচ সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "Law is the command of the sovereign." (আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ।)

(iv) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু **Aristotle**-এর মতে, " Law is the passionless reason." (আইন হল আবেগবর্জিত যুক্তি।)

(v) আইনের সুন্দর ও জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **Woodrow Wilson**. তিনি বলেন, "Law is that portion of the estableshed thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government."(আইন হল সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসের সেই অংশ যা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে, নিয়মিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন রয়েছে।)

উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আইন হল কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধিমালা যার আলোকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সুসংহত হয়।

www.pathagar.com

আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
Nature and Features of Law

১. আইন সমাজ ও মানবীয় সংস্থায় প্রযোজ্য। অতএব উন্মাদ, শিশু কিংবা সন্ন্যাসীর কাছে আইন অর্থহীন।
২. আইন সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য।
৩. আইন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক।
৪. আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত যা গণঅধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে পরিগণিত হয়।
৬. সর্বোপরি আইন বিধিবদ্ধ, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনীন।

আইনের উৎস
Sources of Law

আইন বিশেষজ্ঞমহল বলে থাকেন, "Law has been made, it has grown also." সমাজ বিকাশের ক্রমধারায় আইন গড়ে উঠেছে। তবে Prof. Holland -এর মতে, আইন গড়ে উঠার পশ্চাতে ছয়টি উৎস নিহিত রয়েছে। যথা :

ক) প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি (Customs)
খ) ধর্মবিশ্বাস (Religion)
গ) বিচারকের রায় (Adjudication)
ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা (Scientific commentaries)
ঙ) ন্যায়বোধ (Equity)
চ) আইনসভা (Legislature)

নিম্নে উৎসগুলো সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

প্রচলিত প্রথা (Customs) : প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতি আইনের প্রাচীন উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম। সমাজের অভ্যন্তরে সুদীর্ঘকাল প্রচলিত লোকাচার, দেশাচার এবং রীতিনীতিই হলো প্রথা। মানবসমাজের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব প্রথাগত বিধান বা রীতিনীতি দ্বারা সমাজের সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেগুলো নীতিগতভাবেই মেনে চলত। ফলে প্রাচীন সমাজে মানুষের জীবন হয়ে উঠে প্রথানির্ভর। কালক্রমে ঐসব রীতিনীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে আইনের মর্যাদা লাভ করে। যেমন– ব্রিটেনের সংবিধানের সিংহভাগ দখল করে আছে বিভিন্ন ধরনের দেশাচার। ব্রিটিশ জনগণ ঐসব দেশাচারকে শ্রদ্ধার

www.pathagar.com

সাথে মেনে চলে। আমাদের দেশে মুসলিম আইন কিংবা হিন্দু সমাজে হিন্দু আইন প্রবর্তনের পশ্চাতে প্রথার প্রভাব বিদ্যমান।

ধর্ম (Religion) : একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ধর্মের একচেটিয়া প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং মানুষের জীবন অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। আদিম মনুষ্য সমাজে যখন সভ্যতার আলো পৌছায় নি তখন মানুষের আচার-আচরণ ও বিশৃঙ্খল জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে ধর্মীয় অনুশাসনের সৃষ্টি হয়। সেই সূত্র ধরে যুগে যুগে ধর্মীয় রীতিনীতি মানুষের জীবনের সার্বিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এমনকি মধ্যযুগের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যধিক। আর এরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণেই হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান সমাজের অনেক আইনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের বিধান মেনে চলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের অধিকাংশ আইন ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসনগুলো কালক্রমে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রেসিডেন্ট **Woodrow Wilson** বলেন, 'Indeed early law of Rome was little more than a body of technical religious rules, a system of means for obtaining religious rights through the proper carrying out of certain religious formulas.'

বিচারকের রায় (Adjudication) : আদিম সমাজব্যবস্থায় বিশেষকরে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গই যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করতেন। পরবর্তীকালে রাজা-বাদশা, দলপতি বা জ্ঞানীগণ এরূপ বিবাদ মীমাংসায় এগিয়ে আসেন। প্রথাগত বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর অসম্পূর্ণতার দরুন রাজা-বাদশা বা দলপতিগণ অনেক সময় নিজস্ব বুদ্ধির ভিত্তিতে বিবাদের বিচার করতেন। পরবর্তীতে ঐসব বিচারের রায় আইন হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমানকালেও কোন কোন জটিল মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে ঐ প্রক্রিয়ায় বিচারের রায় প্রদান করা হয়। বিচারকগণ শুধু যে আইনের প্রয়োগ ঘটান তাই নয়; বরং তারা জটিল ও অস্পষ্ট আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন। ফলে আইনের অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূর হয়।

ন্যায়বোধ (Equity) : বিচারকার্য সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করা একটি দুরূহ কাজ। বিচারকদের দায়িত্ব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কোন মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারক যদি লক্ষ্য করেন যে, মামলাটির জন্য প্রচলিত আইন প্রযোজ্য নয় তখন সততা, ন্যায় ও নীতিবোধের আলোকে নতুন আইন তৈরি করে মামলার রায় প্রদান করেন। পরবর্তীকালে অনুরূপ মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকগণ উক্ত রায় অনুসরণ করে থাকেন। সুতরাং ন্যায়বোধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ন্যায়বোধ সম্পর্কে **Heanry Maine** বলেন, "Equity is any of body of rules existing by the side of the original civil law, founded on distinct principles and claiming incidentally to supersede the civil law in virtue of a superior sanctity inherent of those principles."

আইনসভা (Lagislature) : আধুনিক সমাজে আইনসভাকে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **Gilchrist**- এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি

www.pathagar.com

বলেন, "It is chief source of law and is tending to supplant the other sources." আইনসভার সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং জনগণের অধিকার ও দাবির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আইন তৈরি করেন। এছাড়া আইনসভা প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে পুরাতন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনবোধে নতুন আইন তৈরি করেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা (Scientific Commentaries) : বিখ্যাত আইন বিশারদগণের ভাষ্য অনেক সময় আইনের সৃষ্টি করে। সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাদের বিবেক-বুদ্ধির আলোকে আইন তৈরি করেন যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। আইনসংক্রান্ত এরূপ গ্রন্থাবলি আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন– মুসলিম আইনের সম্পাদনায় 'হেদায়া' ও 'ফুতুহায়ে আলমগীরী'র অবদান অন্যতম। এছাড়া আইনজ্ঞ Cocke লিখিত 'Institute', Blackstone- এর 'Commentaties on the Laws of England', A. V. Dicey- এর 'Law of the Constitution' গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের 'মুন' এবং মুসলমানদের আবু হানিফা প্রমুখ আইন বিশারদদের গ্রন্থাবলি যুগ যুগ ধরে আইনের উৎস হিসেবে কাজ করছে।

জনমত (Public Opinion) : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন পরিষদের সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এজন্য জনমতকে উপেক্ষা করে আইনসভা আইন পাস করতে পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা সংবিধানের কোন বিধান সংশোধনীর ব্যাপারে আইনসভা অনেক সময় জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, আইন হল ব্যক্তিক ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুসংহত করার বিশেষ পদ্ধতি। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব। আইন নিছক কোন ধারণা নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উৎসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

ইসলামী আইনের উৎস
Sources of Islamic Law

ইসলামী আইনবিদদের মত অনুসারে, ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) মুখ্য উৎস : এগুলো হচ্ছে, আল-কোরআন এবং আল-সুন্নাহ। (খ) মাধ্যমিক উৎস : আল-ইজমা (ইসলামী মুজতাহিদদের/ফকীহদের ঐকমত্য) ও কিয়াস (আইন ও স্ববিবেচনাপ্রসূত রায়/সিদ্ধান্ত) এবং (গ) সম্পূরক উৎস : আল-ইস্‌তিহ্‌সান, আল-ইস্‌তিসলাহ্‌, আল-উরফ্‌ এবং ইজতিহাদ। নিম্নে উৎসগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হল :

www.pathagar.com

(ক) মুখ্য উৎসসমূহ :

১. আল-কোরআন : ইসলামী দর্শন ও জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর ঐশী বাণীসমূহের সংকলন হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। এটি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি অলৌকিক মু'জিযা। আল-কোরআন-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'যা পড়া হয়েছে' বা 'যা আবৃত্তি করা হয়েছে'। এটা হচ্ছে উম্মী বা নিরক্ষর নবীর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী যা হুবহু মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর কাছ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে মক্কায় ইসলাম প্রচার এবং পরবর্তীতে মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। মক্কা ও মদীনায় তাঁর তেইশ বৎসরব্যাপী কর্ম ও সংগ্রামমুখর জীবনের বিভিন্ন সময়, প্রেক্ষাপট ও ঘটনার প্রয়োজনে তিনি আল্লাহর কাছ হতে ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘটনায় রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ করলে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত ঐশী বাণীটি নাজিল হয়।

যখন রাসূল (স) জিব্রাইল (আ)-এর কাছ থেকে কোন ঐশী বাণী গ্রহণ করতেন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা তাঁর সাহাবীদের কাছে প্রকাশ করতেন। তাঁরা সাথে সাথে গাছের ছাল, চ্যাপ্টা হাড়, খেজুরপাতা এবং সে সময়ে লেখার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের উপর আয়াত লিখে নিতেন। আবার রাসূল (স)-এর বহু সাহাবী আয়াতসমূহ সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে রাসূল (স) নিজেই আল্লাহর ঐশী তত্ত্বাবধানে পুরো কোরআনকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে বিভক্ত করে সংগঠিত করেন। পরবর্তীকালে খলিফা আবু বকরের (রা) শাসনামলে ধর্মদ্রোহীদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে রাসূল (স)-এর বেশ কিছু সাহাবী যাঁরা কোরআনের আয়াত মুখস্থ করেছিলেন তাঁরা শাহাদাতকরণ করলে ভবিষ্যতের জন্য কোরআনকে হেফাজত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোরআনের আয়াতসমূহ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সংকলন ও সত্যায়নপূর্বক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থকারে হেফাজত ও প্রচারের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই কোরআন সম্পর্কে মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন : "এই কোরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা হিদায়াত ও রহমত।" (আ'রাফ-২০৩)

এই আল কোরআন হচ্ছে ইসলামের একটি অলৌকিক বিষয়। আজ অবধি এতে কোন ভুল চিহ্নিত করাতো দূরের কথা, এর আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াতও মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু, কোরআনের সর্বজনীন নীতিসমূহ সততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের চিন্তাকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে।

আল-কোরআন ইসলামী আইনের প্রাথমিক উৎস হলেও আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিন্তু এতে নেই। বিস্তারিত এবং সম্পূরক প্রশ্নাবলী স্থান-কাল, অবস্থান এবং সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনে ব্যক্তির স্ববিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। আল্লাহর এই বিধান বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও সময়ের বৈষম্য ডিঙ্গিয়ে গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কোরআন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কতিপয় করণীয় বিষয় যেমন- বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসায়,

www.pathagar.com

ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়। অপরদিকে, এর নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কিত বিধিমালা যেমন- মদ্যপান, সুদ ও জুয়াখেলা, খুন, চুরি ও ব্যভিচার, মিথ্যাচার ও প্রতারণা এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও উপাসনা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনীয় নয়। সংক্ষেপে, আল কোরআনের চারটি মৌলিক বিষয় হল :

(১) আল-কোরআন একসাথে নয়, বরং ক্ষুদ্র আয়াত আকারে নাযিল হয়েছে। এই আয়াতসমূহ মুসলিম উম্মাহর পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ও দিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত;

(২) আল-কোরআন কতিপয় সাধারণ নীতিমালা ও বৃহত্তর দিক নির্দেশনা মাত্র, এতে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই;

(৩) আল-কোরআনের আইনগত আয়াতসমূহের পরিধি সীমিত এবং এসবের সংখ্যাও খুব কম (৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে ২০০টি শরীয়া সম্পর্কিত); এবং

(৪) আল-কোরআন প্রধানত বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ্।

২. সুন্নাহ্ বা হাদিস : সুন্নাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ। নবী মুহাম্মদ (স)-এর প্রদর্শিত পথ। সুন্নাহ্ ইসলামী আইনের অন্যতম মুখ্য উৎস যা কোরআনের সম্পূরক। N. P. Aghnides-এর মতে, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) শুধু ঐশী কোরআনই মানুষের কাছে পৌঁছাননি, এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কোরআনে মু'মিনদেরকে বারবার সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ সবের নিয়ম-পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। রাসূল (স)-এর সুন্নাতে কোন্ ওয়াক্তে কত রাকায়াত সালাত কোন্ নিয়মে আদায় করতে হবে, ওজুর নিয়ম-কানুন কি এবং যাকাত কাকে দিতে হবে এর পরিমাণ কত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এভাবে সুন্নাহ্ কোরআনে বর্ণিত ইসলামী আইন ও নীতিমালা সমূহকে প্রশস্ততর করে এবং এর সাথে নতুন আইন ও রাসূল (স)-এর বিবেচনায় নতুন অনুমোদন প্রদান করে। মহানবী (স)-এর বাণী, নির্দেশনা, আচরণ, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, অনুমোদন ও উচ্চারণ (কোরআন ব্যতীত) প্রভৃতি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নাহ্ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। এক, আল-সুন্নাহ্ আল-কাওলিয়াহ বা আল-হাদিস। রাসূল (স)-এর কথা, বক্তব্য এবং উচ্চারণ (কোরআন ব্যতীত) সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। দুই, আল-সুন্নাহ্ আল ফি'লিয়াহ। রাসূল (স)-এর কর্ম ও আচরণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি এর আওতায় পড়ে। তিন, আল-সুন্নাহ্আল-তাকরিরিয়াহ। রাসূল (স)-এর সম্মতিমূলক আচরণ (যা রাসূল (স)-এর পূর্বে সংঘটিত অথবা তাঁর জানামতে সংঘটিত) যা তাঁর নীরবতার কারণে অনুমোদিত বলে ধরা হয়। সুন্নাহ্র আওতায় শ্রেণীবিন্যাসকৃত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে ঐশীবাণী, বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চা, পরিচ্ছন্নতা ও ওজু, প্রার্থনা, মৃতের সৎকার, খাত্না, হজ্জ্ব, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, সামাজিক আচরণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, আত্মরক্ষা ও জিহাদ, মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠন, বিবাহ, তালাক, সম্পদের বিতরণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য, রাজস্ব ব্যবস্থা, নির্বাহী দায়িত্ব পালন ও প্রশাসনিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

রাসূলের (স) কর্ম ও বাণী যা নিয়ে সুন্নাহ্‌র অধিকাংশ অঙ্গ সংগঠিত, তাঁর জীবদ্দশায় কখনও লিখা হয়নি। রাসূলের (স) নির্দেশেই তা করা হয়েছে ঐশী বাণীর সাথে সংমিশ্রিত হবার আশংকায়। তৃতীয় হিজরী শতকে হাদিসের বিখ্যাত সংকলনসমূহ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি সংকলন করেন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৬৯); দ্বিতীয়টি আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল নিশাপুরী (২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৫)। মূল ও শুদ্ধ হাদিস নির্বাচনের ব্যাপারে সংস্করণকারীদের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের কারণে এ দুটি হাদিস গ্রন্থকে বলা হয় সবচেয়ে সহীহ্ বা নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। অপর চারটি হাদিস সংকলনও সহীহ্ বা নির্ভরযোগ্য বলে সুপরিচিত।

সংক্ষেপে, সুন্নাহ হচ্ছে সেই জ্ঞানভাণ্ডার (Body of knowledge) যা বিচারক হিসেবে রাসূল (স)-এর সিদ্ধান্তসমূহকে ধারণ করে। ব্যক্তিগত আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি, অভ্যাস, বক্তৃতা, তাঁর জীবদ্দশায় অনুমোদিত আরবের সাধারণ ও প্রচলিত প্রথা এবং অনুসারীদের প্রতি উপদেশ সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে হাদিসের সংকলন। এটা এমন এক সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক জ্ঞান ভাণ্ডার যা আজও বিশ্বব্যাপী প্রায় দেড়শ কোটি মুসলিমের জীবনকে প্রভাবিত করে। সকল মুসলিম সুন্নাহ্‌কে কোরআনের পরপরই ইসলামের পবিত্র সংকলন বা পথ নির্দেশিকা হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সকল মুসলমান বিশেষত ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছতে রাসূল (স)-এর সুন্নাহ্‌কে গ্রহণ ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন -

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের।" (নিসা-৫৯)

"রাসূলকে (স) কে যে মান্য করল সে আমাকে মান্য করল।" (নিসা-৮০)

"রাসূল (স) যা দিয়াছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (হাশর-৭)

একই সাথে যুক্ত হয়েছে রাসূল (স) এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের আহ্বান : "হে মানবজাতি! আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি মহারত্ন রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তবে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব (কোরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।"

(খ) মাধ্যমিক উৎসসমূহ :

১. আল-ইজমা : শাব্দিক অর্থে ইজমা হচ্ছে ঐকমত্য। একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ প্রশ্নে মুসলিম আইনজ্ঞদের ঐকমত্যকে আইনের পরিভাষায় ইজ্‌মা বলে। কোরআন ও সুন্নাহর পর এটাই হচ্ছে ইসলামী আইনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইজ্‌মার সমর্থনে কোরআন ও হাদিসে বেশ কিছু উক্তি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ :

"আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি অনুগত হও এবং অনুগত হও তাঁদের প্রতি, যাঁদের কর্তৃত্ব আছে।" (আল-কোরআন)

"মুসলিমগণ যা ভাল মনে করে, আল্লাহ্ তাকে ভাল মনে করেন।" (আল-হাদিস)

www.pathagar.com

"আমার উম্মতগণ কখনও ভুল সিদ্ধান্তে একমত হবে না।" (আল-হাদিস)

"সংখ্যাগুরুর অনুসরণ করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।" (আল-হাদিস)

রাসূলুল্লাহ্‌র (স) ইন্তেকালের পরমুহূর্তে সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য একজন নেতা নির্বাচন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্‌র (স) সাহাবীগণ মিলে ইজ্‌মার ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা)-কে খলিফা মনোনীত করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র (স) জীবদ্দশায় তিনি একবার হযরত আবু বকরকে (রা) নামাজে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ঘটনা হতে সাহাবীগণ কিয়াসের মাধ্যমে ইজমায় পৌঁছলেন যে, নামাজে ইমামতি করার জন্য যিনি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন, তিনিই মুসলিমদের সকল ব্যাপারে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য।

ইজমা একজনের অভিমত নয়। এটা একাধিক আইনতত্ত্ববিদদের ঐকমত্যভিত্তিক সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। ইজ্‌মার মাধ্যমে যে আইন ঘোষিত হয়, তা তর্কাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে সময় ও পরিস্থিতির কারণে পরবর্তী মুজাহিদ্‌গণ পূর্ববতী মুজাহিদ্‌গণের সিদ্ধান্তকে রদ করতে পারেন। সুন্নী জামাতের সকল সম্প্রদায়ের (হানাফী, মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহারের অনুসারীগণ) মতে, ইজ্‌মা কোন দেশ বা যুগের মধ্যে সীমিত নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি দ্বীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। ইসলাম চিরস্থায়ী জীবন বিধান এবং হযরত মুহাম্মদ (স) হচ্ছে সর্বশেষ পয়গাম্বর। কিন্তু আল-কোরআনে যে সমস্ত আইনের বিধি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে তার সংখ্যা খুবই অল্প। মানবজাতির জীবনযাত্রায় যে অসংখ্য আইনের প্রশ্ন নিয়ত উত্থিত হচ্ছে, তার সমাধান আল-কোরআনের ঐ স্বল্পসংখ্যক বিধি দ্বারা পূর্ণভাবে হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স) ও দুনিয়াতে নেই। অতএব, কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছেও যাবার উপায় নেই। এমতাবস্থায়, কোরআন ও হাদিস হতে সূত্র গ্রহণ করে বিভিন্ন সমস্যার/প্রশ্নের সমাধান দেয়া জরুরি। ইসলামী আইনতত্ত্ব তাই ইজ্‌মার মাধ্যমে মুজতাহিদ্‌দের উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ও অধিকার দেয়। নামাজ, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাত—ইসলামের এই স্তম্ভগুলো সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম সমাজে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মান্য করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। হানাফীদের মতে, ধর্মীয় ব্যাপারে ইজ্‌মাকে চূড়ান্ত গণ্য করা যায়। এগুলোর বাইরের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সাধারণ মুসলিমগণ আইনতত্ত্ববিদ্‌দের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে—এটাই ইসলামের নীতি। আল-কোরআন, আল-হাদিস ও ইজ্‌মাকে একত্রে ইসলামী আইনের পরিভাষায় উসূল বা নস বলা হয়।

২. আল-কিয়াস : কিয়াস হচ্ছে যৌক্তিক ও স্ববিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। এটা হচ্ছে মানুষের যৌক্তিক বিবেচনা যার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এমন এক পরিস্থিতির সাথে যে ব্যাপারে আইন নির্ধারিত রয়েছে। যে প্রশ্নে আল-কোরআন নীরব, আল-হাদিস নিশ্চুপ এবং ইজমা মূক, সেই প্রশ্ন যখন সমাধান চায় তখন কোথায় তা পাওয়া যাবে? সুন্নী সম্প্রদায়ের সকল মাযহাব একস্বরে বলেন, এই সময়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আল-কোরআন, আল-হাদিস এবং ইজমা হতে আলোক গ্রহণ করে। এতে আইনের

www.pathagar.com

যে বিস্তৃতি ঘটে, তাই কিয়াস। সহজ কথায়, মূল আইন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে যুক্তির আলোকে নতুন প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে কিয়াস বলে। উদাহরণস্বরূপ মাতাল হবার অপরাধে আশি বার বেত্রাঘাতের আইনের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস। অপরাধকারীর শাস্তি যেহেতু এরূপ, সেহেতু মাতালের শাস্তিও এরূপ হওয়া উচিত। কারণ মাতাল হলে মানুষ তার সংযম হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও কিয়াসের ব্যবহার করতেন। একদা একজন লোক এসে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন : "হুজুর! আমার আব্বাজান সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ্ব করতে পারেন নাই। তাঁর আত্মার সদ্‌গতির জন্য আমার পক্ষে হজ্জ্ব করা কি প্রয়োজন?" রাসূল (স) উত্তরে বলেন "তোমার আব্বা দেনা রেখে মারা গেলে তা শোধ করা কি তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হত?" এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) কিয়াসের মাধ্যমে লোকটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, দেনা পরিশোধ করা যেমন পুত্রের জন্য প্রয়োজন, পিতার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করাও তেমনি প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কর্মনীতি এমন ছিল যে যখন তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হত, তখন তিনি সর্বপ্রথম কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক ফয়সালা করতেন। আর যদি সে বিষয়ে ঐশী প্রত্যাদেশ পাওয়া না যেত, তবে তিনি নিজস্ব ইজ্‌তিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন। তিনি সাহাবীদেরকেও এই কর্মনীতি অনুসরণের নির্দেশ দেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?" উত্তরে মু'আয (রা) বলেছিলেন, "আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে।" অতঃপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, "যদি তাতে কোন বিষয়ে সমাধান না পাও?" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র রাসূলের (স) সুন্নাহ্ অনুযায়ী।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "যদি তাতেও সমাধান না পাও?" "সে অবস্থায় আমি ইজ্‌তিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করব," মু'আযের জবাব। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর এই উত্তর শুনে আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এই হাদিসে কিয়াসের স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।

ইজমার ন্যায় কিয়াসকেও ইসলামী আইনের জীবন্ত উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্‌তিকালের পর, সাহাবা কেরাম বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের প্রাদেশিক গভর্নর ও বিচারকগণ সুদৃঢ়ভাবে তাঁর এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। স্মরণীয় যে, আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের স্থান আল-কোরআন, আল-হাদিস এবং ইজমার পরে। কিন্তু কোন একটি কিয়াসের উপর যদি সকল মুজ্‌তাহিদ্ একমত হন, তবে সেই কিয়াস ইজ্‌মার পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিয়াস কোন অবস্থাতেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। আবার মূল আইনে যা স্পষ্ট তাতে কিয়াসের অবকাশ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিয়াসভিত্তিক আইন প্রতিষ্ঠিত আইনের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র।

(গ) সম্পূরক উৎসসমূহ :

১. আল-ইস্‌তিহ্‌সান : জনকল্যাণ ও সুবিচারের স্বার্থে আইনবিদ যদি কিয়াসভিত্তিক আইনকে উপেক্ষা করে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে ইস্‌তিহ্‌সান বলা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অসুবিধা, ক্ষতি কিংবা দুরবস্থা পরিহার এবং মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে যা ভাল মনে করা যায় তাই ইস্‌তিহ্‌সান। এই কল্যাণকামী নীতির বলে আইনবিদ তাঁর ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারেন। হানাফী মতাবলম্বীদের মতে, কিয়াসভিত্তিক আইন অভ্রান্ত নয়। এমনকি ইজমাকেও অভ্রান্ত বলা যায় না। প্রয়োজনবোধে এগুলোর পরিবর্তে স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করাই ইস্‌তিহ্‌সানের মূল মর্ম। ইমাম আবু হানিফা এই নীতির প্রবর্তক। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুবিচার করতে হলে শুধু অনুকরণ এবং সদৃশ বিধান করলেই চলবে না, আইনকে উপযোগী এবং স্থিতিস্থাপক করা প্রয়োজন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানকে বুঝে নেয়া যেতে পারে। ইসলামী আইনে বিক্রয় চুক্তি সিদ্ধ হতে হলে চুক্তির সময় তার বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই ইসলামী আইনের পুরাতন নীতিতে সেই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ। সুতরাং স্বর্ণকার কর্তৃক অলঙ্কার প্রস্তুত করে দেয়ার নামে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ অলঙ্কারের অবিদ্যমানতার কারণে অসিদ্ধ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা প্রবর্তিত ইস্‌তিহ্‌সানের সূত্রে এ জাতীয় চুক্তিকে সিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনুরূপভাবে, আমাদের দেশে সালামী বা অগ্রিম ভাড়া গ্রহণপূর্বক দোকান বরাদ্দ দেওয়াও বৈধ।

যতই দিন যাচ্ছে, সামাজিক জটিলতা ততই বাড়ছে এবং জটিলতা যতই বেড়ে যাচ্ছে ততই কিয়াস দ্বারা সবকিছু সামলিয়ে উঠা সম্ভবপর হচ্ছে না। এ কারণে ইস্‌তিহ্‌সানকে অবলম্বন করতে হচ্ছে। ইসলামী আইনের পুস্তকাদিতে ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

২. আল-ইস্‌তিস্‌লাহ : কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও কোন বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা জনগণের কল্যাণ বা জনস্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এটাই ইস্‌তিস্‌লাহের মূল বক্তব্য। ইমাম মালিক এই নীতির প্রবর্তক। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ইস্‌তিহ্‌সান বা আইনগত ন্যায়পরায়ণতার নীতির প্রবর্তক ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতে, অবস্থাবিশেষে যে সিদ্ধান্ত আইনগত এবং ন্যায়সঙ্গত, তাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই ইস্‌তিহ্‌সানের মূল কথা। অপরদিকে, ইস্‌তিস্‌লাহ অনুযায়ী যা অকল্যাণমূলক তাই অগ্রাহ্য। মালিকী ফকীহ্‌গণ ইস্‌তিসলাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন। এক, এটি শরীয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন বা দ্বীনের কোন অকাট্য মূলনীতির বিপরীত হবে না। দুই, এটি দ্বীনের জরুরি বিষয় সংরক্ষণের সাথে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তিন, ইস্‌তিস্‌লাহ যুক্তিগ্রাহ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে বিজিত অঞ্চলের ভূমি মালিকানা জনস্বার্থ বিবেচনা করে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বহাল রাখেন। দুর্ভিক্ষের বছর তিনি জনস্বার্থ বিচেনা করে চোরের উপর হাত কাটার শাস্তি কার্যকর করা হতে বিরত থাকেন; এবং একজন ব্যক্তির হত্যার সাথে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকলে জনস্বার্থ বিবেচনা করে তিনি সকলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

৩. ইস্‌তিদ্‌লাল : ইস্‌তিদ্‌লাল শব্দের অর্থ হচ্ছে এক বস্তু হতে অন্য বস্তু অনুমান করা। তফ্‌সিরের ক্ষেত্রে হানাফি পণ্ডিতগণ এই শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। একে যুক্তির মাধ্যমে

www.pathagar.com

নির্ণীত সিদ্ধান্তও বলা যায়। কিয়াসের বাইরে সকল প্রকার অনুসিদ্ধান্তকে ইস্‌তিদ্‌লাল বলা যায়। কারো কারো মতে, ইস্‌তিদ্‌লালের মধ্যেই ইস্‌তিহসান ও ইস্‌তিস্‌লাহ বর্তমান।

উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধরত পক্ষগুলোর নিকট অস্ত্র বিক্রি না করা, মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর ও মদ প্রস্তুত করার উপাদান বিক্রি না করা এবং বিশেষত আমাদের দেশে তরুণদের মাঝে 'ফেনসিডিল' বিক্রি না করা সহ এমন সব কাজ করা হতে বিরত থাকা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপাত্রে ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে।

৪. আল-উর্‌ফ : উর্‌ফ অর্থ দেশাচার বা প্রচলিত প্রথা। স্থানীয় প্রথা বা রীতি-নীতিকে আইনের পরিভাষায় উর্‌ফ বলা হয়। ইসলামী শরীয়ার বিকাশে আইনের অনেক সিদ্ধান্ত প্রথা ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এগুলো আইনের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবকালে আরব দেশে অনেক ধরনের প্রথা ও রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। ঐসব প্রচলিত প্রথা এবং রীতি-নীতির একটি বৃহৎ অংশ আল-কোরআন বা আল-হাদিসের স্পষ্ট অনুজ্ঞা বা আদেশ দ্বারা রদ করা হয়নি। আইনদাতা তাঁর নীরবতার দ্বারা ঐগুলোকে অনুমোদন করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের খাইবার অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে রোমকদের প্রবর্তিত বর্গাচাষ (অর্থাৎ জমির মালিক ও চাষীর মাঝে ফসল ভাগাভাগি) প্রথার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌র (স) সময়ে খাইবার বিজয় (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) ও তদ্‌অঞ্চলে ইসলামী শাসন প্রবর্তিত হলেও বর্গাচাষ প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। খাইবারের বর্গাচাষ প্রথা পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী আইনের বিকাশে উর্‌ফ-এর প্রভাব সম্পর্কিত অপর একটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত (পুরুষদের জন্য) খাত্‌না ব্যবস্থা। এটি মুসলমানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলেও এর কোন উল্লেখ পবিত্র কোরআনে নেই। ইসলাম-পূর্ব যুগ হতে আরবে মরুবাসীদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (স) খাত্‌নার কল্যাণকর দিক বিবেচনা করে এটিকে গ্রহণ করেন। শাফেয়ীরা খাত্‌নাকে ওয়াজিব বলে থাকেন। আর মালেকিরা একে সুন্নাহ মনে করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা এটাকে ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। কারো কারো মতে, খাত্‌না প্রথা হযরত ইব্রাহীমের (রা) ধর্মের একটি অনুষ্ঠান। অতএব, ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার পবিত্র কোরআনে খুনের বদলে রক্তপণ অথবা কিসাসের (অর্থাৎ খুনের বদলা/শাস্তি খুন) বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে একটি রীতি প্রচলিত ছিল যে, কোন জনপল্লীতে যদি কেউ খুন হয়, এবং খুনী অজ্ঞাত থাকে, তাহলে উক্ত জনপল্লীর সবাইকে কাসামা অর্থাৎ সমভাবে উক্ত খুনের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে বসতির সবাই মিলে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে প্রয়োজনীয় রক্তপণ (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করবে। রাসূল (স) উক্ত কাসামা রীতি মুসলমানদের জন্যও অব্যাহত রেখেছিলেন।

কোরআন ও হাদিস বিরোধী না হলে প্রথাভিত্তিক (ইসলাম স্বীকৃত/অনুমোদিত) আইন সকলে মানতে বাধ্য। ইসলামী আইনের বিকাশে প্রথার অবদান সুবিস্তৃত। সাহাবী এবং তাবেঈন যুগে যে সকল প্রথা সম্মানের সাথে প্রতিপালিত হত, সেগুলো পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

www.pathagar.com

৫. আল-হিয়াল বা কৌশল : আইনের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণে রেখে ক্ষতি পরিহারের লক্ষ্যে সময়মত কৌশল অবলম্বন ইসলামী আইনে সিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী যদি কারো কাছে এক বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমমূল্যের অর্থ/সম্পদ জমা থাকে, তাহলে তার উপর পুরো সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ হারে যাকাত দেয়া ফরজ। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি বছর পূর্তির পূর্বেই সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের কিছু অংশ বিক্রি বা কাউকে দান করে দেয়, তাহলে তিনি যাকাত দেয়ার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন। যাকাত দেয়ার দায় হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় কৌশল অবলম্বনকে আল-হিয়াল বলা হয়।

৬. সাদ্ আল-যারায়ি বা প্রতিরোধমূলক আইন : প্রতিরোধমূলক আইন হল শরীয়া কর্তৃক অনুমোদিত কোন কাজকে বৃহত্তর স্বার্থে বাধাগ্রস্ত করা। সমাজ বা দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি বা দুর্নীতি প্রতিহত করার নিমিত্তে এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজনে গাছ কাটা বা হরিণ বা পাখি ইত্যাদি শিকার বৈধ; কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় অনুমোদিত কার্যক্রমও নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

৭. ইজ্তিহাদ ও তাকলিদ : ইজ্তিহাদ বলতে প্রচেষ্টা বা প্রয়াসকে বুঝায়। আল-কোরআন, হাদিস এবং ইজমায় যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই সে বিষয়ে সঠিক আইন নির্ণয়ের জন্য ইসলামী আলেম ও আইনজ্ঞগণ যখন সর্বোতভাবে সচেষ্ট হন, তখন তাঁদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে ইজ্তিহাদ বলা হয়। অন্য কথায়, যে ক্ষেত্রে আল-কোরআন, হাদিস বা ইজ্মার মধ্যে কোন স্পষ্ট আইন পাওয়া না যায়, তখন সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলে। এভাবে আল-কোরআন, হাদিস বা ইজমাতে যার কোন স্পষ্ট ফয়সালা নেই, তৎসম্পর্কে আইনবিদ (ইজতিহাদের মাধ্যমে) যে অভিমত প্রদান করেন, তা গ্রহণ করার নাম তকলিদ। ইসলামী পরিভাষায়, যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়। স্মর্তব্য যে, শুধু আইনবিদ হলেই মুজ্তাহিদ হওয়া যায় না। ইজ্তিহাদকারীকে মুজতাহিদ পর্যায়ে উপনীত হতে হলে আল-কোরআন, আল-হাদিস এবং আইনতত্ত্বে তাঁর পরিমিত জ্ঞান থাকতে হবে। কোরআনের ঘোষণা, "তুমি যদি কোন বিষয়ে না জান, তবে যে জানে তাঁকে জিজ্ঞাস কর"। কোরআনের এই নির্দেশ এবং ইজমা ও কিয়াসের প্রয়োজনে সর্বকালে মুজতাহিদ থাকা প্রয়োজন।

ইসলামী আইনের (শরীয়া) বৈশিষ্ট্যাবলী
Feature of Islamic Law

কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে, কতগুলো ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিমালা সম্বলিত ইসলামী শরীয়া মুসলমানদেরকে শুধু নামাজ, রোযা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিক্ষাদান ছাড়া পার্থিব জীবনকে অবজ্ঞা করে তাঁদের কেউ কেউ এমন দাবিও করেন যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেমন- রাজনৈতিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়ার তেমন ভূমিকা নেই। নিম্নে মুসলমানদের জীবনে ইসলামী শরীয়ার গুরুত্ব এবং এর কয়েকটি অনুপম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল, যা শরীয়াকে অপরাপর (মানব রচিত) আইন হতে বিশেষ স্বীকয়তা প্রদান করে।

১. ব্যাপকতা ও নির্ভুলতা : ইসলামী শরীয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য যা আইন সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণা হতে পৃথক, তা হচ্ছে এর বৃহত্তর প্রয়োগ ক্ষেত্র। জন্মের পূর্ব হতে মৃত্যুর সৎকার পর্যন্ত মানুষের জীবনের খুঁটি-নাটি সকল দিক এর আওতাভুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়ার নীতিমালা, তত্ত্ব, উপাদান, মতবাদ ও বিধিমালা ইত্যাদি মানুষের জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয়দিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এটা মানুষের অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে এবং একইসাথে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। মুসলমানদের বিশ্বাস, এ সকল নীতিমালা ও তত্ত্বসমূহ ব্যক্তি ও সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম।

এছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ত বলে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইসলামী শরীয়ায় বিশুদ্ধতা আজ অবধি অক্ষুণ্ন এবং মানুষের জীবনে সমভাবে প্রযোজ্য। অপরদিকে, মানুষের তৈরি আইন সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় বলে সময় ও অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবহার উপযোগিতাও হারায়। The Encyclopedia Britannica শরীয়ার আওতায় মানুষের আচরণের শ্রেণীবিন্যাসকে সমর্থন করে বলে-

"...... (মানুষের) প্রতিটি কর্ম অথবা বর্জন নিম্নের যে কোন একটিতে পড়ে, হয় তা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে অথবা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের দৃষ্টিতে শরীয়া সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করে যাকে একজন পশ্চিমা আইন বলবেন .... সরকারি ও ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং (শরীয়ার) একটি বড় অংশ যাকে তিনি মোটেই আইন বলবেন না। যেমন- ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে নৈতিকতা।"

২. আধ্যাত্মিক চমৎকারিত্ব : ইসলামী শরীয়ার অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক চমৎকারিত্ব। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য কোন পাশ্চাত্য বা ধর্মনিরপেক্ষ আইনে পাওয়া যায় না। চমৎকার এ অর্থে যে, ঐশী উদ্ভূত হিসেবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা ও তত্ত্বসমূহ গুণ ও মানে সংকীর্ণ দলীয় বা জাতীয় আইনের উর্ধ্বে। বিশ্বাস করা হয় যে, এ ধরনের চমৎকার আদর্শ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, বরং মানুষকে যতদূর সম্ভব চমৎকার আদর্শের কাছাকাছি ব্যক্তিত্ববান ও আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে শরীয়া সব সময়ের জন্য মানবজাতির সম্ভাব্য অগ্রগতি ও উন্নয়নের দুয়ার উন্মুক্ত রাখে।

৩. অপরিবর্তনীয় ও নমনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি : ইসলামী শরীয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অপরিবর্তনীয় ও নমনীয় দিক। এই অপরিবর্তনীয়তা বিশেষ আইনের উপর নির্ভর করে যা সুস্পষ্টভাবে ঐশী প্রদত্ত। অপরদিকে, এর নমনীয় বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ইসলামী আইনের উৎস ও পদ্ধতিসমূহের উপর। যেমন—ইজ্‌তিহাদ, ইজ্‌মা, কিয়াস, ইস্‌তিস্‌লাহ এবং ইস্‌তিহ্‌সান যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শরীয়া মানুষের জন্য একটি স্থায়ী পবিত্র পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয় যার বাইরে কোন মুসলিম যেতে পারে না। কিন্তু একই

www.pathagar.com

সাথে, এই পরিসীমার মধ্যেও পরিমিত ভিন্নতা অনুমোদন করে। উপরন্তু, প্রয়োগ প্রতিযোগিতা এবং অব্যাহত সম্প্রসারণ শরীয়াকে বিভিন্ন অবস্থানে ও বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রয়োজনের (কল্যাণে) অনুকূলে সাড়া দিতে আরও দায়িত্বশীল হতে সহায়তা করে।

ইসলামী মানবতার মূল কথা হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে শুধু স্বভাবতাড়িত জীব হিসেবে মনে করে না, যার প্রধান চিন্তা (Concern) হচ্ছে দৈহিক চাহিদা নিবৃত্ত করা। অপরদিকে, মানুষ একজন ফেরেশতাও নয় যে, যার চিন্তা ও কর্ম শুধু আত্মাকে ঘিরে আবর্তিত। ইসলাম জীবন সম্পর্কে বাস্তব ও উদারনৈতিক (Moderate) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে যা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, পার্থিব বা পারলৌকিক উভয় প্রয়োজনকে সমন্বিত করে। এ সকল প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণে ইসলাম কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত কতিপয় শাশ্বত নীতিমালা ঘোষণা করে। আবার এর অধীন বিস্তারিত বিষয়সমূহ পরিবর্তনেরও সুযোগ দেয় যাতে তা সময়ের প্রয়োজনে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এর ফলে একথা বলা যায় যে, শরীয়া একই সাথে স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল; অন্য কথায়, শরীয়া স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন (Elastic in character)।

সুষ্ঠু প্রশাসন সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে শরীয়ার নির্দেশনা ও নীতিমালা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের ন্যায় আধুনিক যুগেও যে সমভাবে প্রযোজ্য সে ব্যাপারে দু'জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিম্নোক্ত বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Luther Gulick এবং James Pollock আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন : "Islamic Culture is one of the best bases for a strong and successful government and strong and efficient bureaucracy in modern times." অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী ও সফল সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। তারা আরও লিখেছেন : "The Shariah offers the Egyptians (so to all Muslim nations) the basic principles and elements upon which they can erect their new democracy and use their leadership qualities, citizen's involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery, and private and public wealth in the best interest of the nation as a whole." অর্থাৎ "ইসলামী শরীয়া মিশরীয়দেরকে (অতএব, সকল মুসলিম জাতিকে) তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি সম্পদ জাতির সার্বিক স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ প্রয়োগ ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।" কোন মৌলবাদী মুসলিম গবেষক নয় বরং বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ সকল উক্তি বিশ্বের নবজাগরিত মুসলিম জাতিসমূহকে হীনমন্যতা পরিহার এবং আত্মপ্রত্যয়ী হতে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলামী শরীয়ার অপরাপর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ও নৈতিক সচেতনতা, সাংগঠনিক কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ, পরিমিতিবোধের চেতনা ও চরমপন্থা (Extremism) পরিহার। শরীয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়। ইসলাম মানুষকে পার্থিব জীবনকে উপভোগের অনুমতি দেয় এবং একই সাথে, যা

www.pathagar.com

কিছু ভাল তা গ্রহণ ও যা কিছু মন্দ তা পরিহারের মাধ্যমে মানুষের আত্মাকে উন্নীতকরণের তাগিদ দেয়। Muhammad Al-Bureay-এর মতে, এ ধরনের সাফল্য কেবল একটি ইসলামী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশেই সম্ভব।

পরিশেষে আইনের পাশ্চাত্য ধারণার সাথে ইসলামী শরীয়াহর মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়াহ একই সাথে মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক তথা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সুসমন্বয় ঘটিয়ে ব্যক্তিজীবন, পরিবারিক জীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীক জীবন এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানবের সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. আইন কি? আইনের উৎসসমূহ আলোচনা কর।
[What is Law? Discuss the sources of law.]

২. আইন কি? ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
[What is Law? Discuss the features of Islamic law.]

৩. ইসলামী আইনের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী আইনের উৎসসমূহ আলোচনা কর।
[Define the Islamic law. Discuss the sources of Islamic law.]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতিক ব্যবস্থা
Islamic Economic System

❒ প্রাক-কথা, ইসলামী অর্থনীতির অর্থ ও সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি, ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, ইসলামী অর্থনীতির সাথে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনা

প্রাক-কথা
Introduction

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্ মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির বা গোত্রের কাছে প্রয়োজনানুযায়ী সুনির্দিষ্ট জীবনবিধানসহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী প্রেরণ ও জীবন ব্যবস্থার নির্দেশনার পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে। সেই সাথে বিশ্বমানবের জীবনব্যবস্থার পূর্ণতা সাধন করা হয়েছে ইসলামের মাধ্যমে।

ইসলাম শুধু যে বিশ্বমানবের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে এমন নয়। বরং রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিকনির্দেশনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট অংশ হিসেবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী জীবন দর্শন বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে পার্থিক সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুষ্ঠু নীতিমালা। অর্থাৎ যাবতীয় আর্থিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মূলত পাশ্চাত্যের প্রচলিত ব্যর্থ অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবের মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় রত। আর ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবগ্থা ধনবৈষম্য রোধ করে সুষম ও সমতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো নির্মাণে সচেষ্ট। এ অধ্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী অর্থনীতির অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definitions of Islamic Economics

ইসলামী জীবন দর্শনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। অন্যকথায়

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আর তাই কোরআন ও হাদিসের মূল সূত্রের আলোকে ইসলামী চিন্তকমহল ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। তবে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদদের দেয় প্রচলিত অর্থনীতির সংজ্ঞা বা রূপরেখার সাথে ইসলামী অর্থনীতির বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন-অর্থনীতির জনক হিসেবে খ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) মনে করেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের কারণ অনুসন্ধান করে।" আবার এল. রবিনসের (Lionel Robbins) মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম চাহিদা ও বিকল্প ব্যবহার উপযোগী সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মানব আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।" জে এস মিল সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, "অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবহারিক শাস্ত্র।" আর অর্থনীতিবিদ ববার (Bobber) বলেন, "স্বল্প উপকরণসমূহের বিতরণ, কর্মসংস্থান ও আয়ের নির্ধারকসমূহের আলোচনাই সংক্ষেপে অর্থনীতি।"

এবারে ইসলামী অর্থনীতিবিদ যারা কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল।

ড. এস এম হাসানউজ্জামান এর মতে, "Islamic economics is the knowledge and application of injunction and rules of the shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resource in order to provide satisfaction to human beings and enables them to perform their obligation to Allah and the society."

অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরীয়াহর বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধনীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ, যেন এর ফলে মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. এম উমার চাপরার মতে, "Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro-economic and ecological imbalances."

অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব এবং সামষ্টিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক-অর্থনীতিবিদ ড. এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মত হল , "Islamic economics is the Muslim thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience."অর্থাৎ, সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রয়াসে তারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সহায়তা নিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম পথিকৃৎ ড. এম এ মান্নান তাঁর যুগান্তকারী বই "Islamic Economics : Theory and Practice" এ একটি সরল অথচ কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "Islamic economics is a social science which studies the economic problems of people imbued with the values of Islam." অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি হল একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও বিকাশে অসামান্য অবদানের জন্যে যিনি প্রথম সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কারে' ভূষিত হয়েছেন সেই প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে - "Islamic economics represents a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective."

অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি হল অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঐসব সমস্যার প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হামিদের মতে, "ইসলামী অর্থনীতি হল ইসলামী বিধানের সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সম্মিলিতভাবে অধ্যয়ন করে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের সারবত্তা হিসেবে বলা যায় ইসলামী অর্থনীতি একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান যা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে। ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করাই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি
Principles of Islamic Economics

আল্লাহর ঘোষণা, "হে মানব সমাজ, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে তা থেকে খাও, কখনও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

ইসলামের যেমন পাঁচটি মৌলনীতি বা স্তম্ভ রয়েছে তেমনি ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে বেশ কয়েকটি অনন্যধর্মী ও কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলোর নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সকল স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে এ সকল মূলনীতি তুলে ধরা হল :

১. আইন অনুযায়ী তথা হালাল উপায়ে আয়-ব্যয় :

ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য নীতি হল হালাল উপায়ে আয় বা উপার্জন করতে হবে এবং ব্যয়ও হালাল উপায়ে হতে হবে। অর্থাৎ কোন অকল্যাণমূলক বা অন্যের ক্ষতি হতে পারে সে পথে আয় করা যাবে না।

এ নির্দেশনা আল কোরআন ও রাসূলের (স) পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে যা ইসলামী রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

অধিবাসী সকল মুসলমান অমুসলমান নাগরিককে মান্য করতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল আয়, উপার্জন ও ব্যয়। মানুষকে জীবনধারণ করার জন্য উপার্জন করতে হবে এবং এই উপার্জনের পরিমাণ কিন্তু ইসলাম নির্ধারণ করে সীমিত করে দেয় নি। অর্থাৎ একজন লোক সৎপথে তার মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে যত সম্ভব তা উপার্জন করতে পারে। সম্পদের অধিকারী হওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই সহজাত প্রবৃত্তিকে মানুষ পূর্ণ করতে সদা তৎপর থাকবে এবং এতে ইসলাম কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয় নি। তবে শর্ত হল যে তা হালাল বা সৎ উপায়ে অন্যের অনিষ্ট না করে রাষ্ট্রের ক্ষতি না করে করতে হবে। অদ্রুপ মানুষের উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারেও ইসলামের নির্দেশনা হল যে কারো কোন্ প্রকার ক্ষতি না করে অন্যায় পথে একজনের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে পারবে না।

আজকে সারা বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের দেশে অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের যে ধারা চলছে তা সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী। এই একটি শর্ত সঠিকভাবে মান্য করে চললে বর্তমানে আমাদের দেশে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছে এবং যত অপরাধ ও আইন বিরোধী কাজ হচ্ছে তার অবসান হত। কারণ মানুষ যখন অসৎ উপায়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে তাতে তার কষ্ট হয় না, তাই সে অর্থ ব্যয় করতেও কষ্ট হয় না। যে কোন পথে এমনকি মানুষ হত্যার জন্যও অর্থ ব্যয় করতে পারে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে easy coming easy going অর্থাৎ যেভাবে আসে সেভাবেই যায়। সুতরাং ইসলামের যে নির্দেশনা এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে অনন্য মূলনীতি তা অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পালনের নির্দেশ নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় মানুষ অর্থ উপার্জনে ও সম্পদ আহরণে তার নিজস্ব স্বার্থপর প্রবৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা ধরনের অন্যায় অপরাধ বর্ধিত হারে সংঘটিত হচ্ছে এবং মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

২. যাকাতভিত্তিক ও সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে সুদ (interest)। ব্যাংকের সকল কাজকর্ম, লেনদেন হয় সুদের ভিত্তিতে যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামে Banking ব্যবস্থা চলে Profit and Loss Sharing এর মাধ্যমে। ব্যাংকে টাকা রাখলে অথবা ইসলামী ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজকর্ম করতে হলে কোন পূর্ব নির্ধারিত সুদের মাধ্যমে করা যাবে না, যে টাকা জমা রাখে অথবা যে অন্যজনকে ব্যবসার জন্য টাকা দিচ্ছে তা হবে মুনাফার ভিত্তিতে অর্থাৎ যাকে টাকা দেয়া হয়েছে সে টাকা invest করে যে মুনাফা হবে তার একটি অংশ Capital financier কে দিবে এবং লোকসান হলেও আনুপাতিক হারে লোকসানের বোঝাও বহন করতে হবে। সুতরাং চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় ইসলামী ব্যবস্থা বেশী মানবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কেউ যদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাহলে সে টাকা invest করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা থেকে ব্যাংকের service কিছু অংশ এবং লোকসান পূরণ করার জন্য কিছু অংশ রেখে বাকী টাকা শতকরা হিসাব করে টাকা জমাকারীকে মুনাফা দেয়া হবে। এ নিয়মে প্রতি ৬ মাস অন্তর ব্যাংক মুনাফা বা ক্ষতির হিসাব করে এবং লাভ বা লোকসান জমাদানকারীকে প্রদান করা হয়। ফলে দেখা যায় যে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ একরকম থাকে না যা সুদের বেলায় প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

৩. সম্পদের উত্তরাধিকারী বিধান

ইসলাম সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণ সমর্থন করে না, তাই উত্তরাধিকারী আইন বলবৎ করা হয়েছে যা আল কোরআনের সূরা নেছাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থায় পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে এবং তাদের সকলেরই অংশ নির্ধারণ করা আছে অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, বাকী অংশ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেয়ে ছেলের অর্ধেক হিসেবে পাবে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তি বা কয়েকজনের মধ্যে সম্পদের ভাগ হবে না, রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে আছে তারা সকলেই ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকারী কোন আইন নেই, বাবা যদি উইল করে যায় সে অনুযায়ী সম্পত্তির ভাগ হবে আর উইল না করলে সম্পত্তির মালিক হবে রাষ্ট্র। হিন্দু মেয়ের বিবাহ হয়ে গেলে সে আর পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার থাকবে না। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা বিবাহের পরও পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার থাকবে। এ কারণেই হিন্দু মেয়েদের বিবাহের সময় তার প্রাপ্য অংশের টাকা যৌতুক হিসাবে তাকে দিয়ে দেয়া হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত এ রীতির অন্ধ অনুকরণ হচ্ছে আজ মুসলিম সমাজেও, যা ধর্মীয়ভাবে নিষেধ। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই উত্তরাধিকারী আইন প্রচলন আছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা স্বীকৃত যা ইসলামী ব্যবস্থায়ও স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যবস্থার শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানার ভিত্তিতে একই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করলে ভুল হবে। কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদভিত্তিক আর ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদবিহীন যাকাতভিত্তিক। সুতরাং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও রয়েছে। কারণ ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা একটি জন্মগত ও সহজাত অধিকার। এটি না থাকলে মানুষকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রয়েছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছুই থাকবে না, সম্পত্তির মালিক হবে রাষ্ট্র। ইসলাম এ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করেছে এই যুক্তিতে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে ও ইচ্ছামত অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির পরিপন্থী।

৪. সম্পদের মজুদদারী ও একচেটিয়া ব্যবসা নিষিদ্ধ

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মজুদদারী ও একচেটিয়া ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি খাদ্যসামগ্রী ৩০ দিনের বেশী মজুদ করতে বা রাখতে পারবেনা, তবে তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১২ মাসের খাদ্যসামগ্রী মজুদ রাখতে পারবে, কোন ব্যবসা বা মুনাফার লোভে নয়। খাদ্য, ঔষধ বা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্যসামগ্রী মজুদের উপর কোন নিষেধ নেই, তবে মজুদদাররা মানুষকে বেশী কষ্ট দিয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করবে এ মনোবৃত্তি ইসলাম পছন্দ করে না। ব্যবসাকে ইসলাম উৎসাহিত করছে কিন্তু অতি মুনাফালোভী ব্যক্তিকে ইসলাম ঘৃণা করে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করবে কিন্তু তা জনসাধারণের সহনীয় পর্যায়ে থাকতে হবে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশী মুনাফা অর্জনের হীনবৃত্তিকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। ইসলাম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একচেটিয়া ব্যবসা করার অনুমতি দেয় না যার জন্য free market বা open market competition বা একই পণ্যের একাধিক মিল স্থাপন করে বিভিন্ন মিলে একই

www.pathagar.com

জিনিস তৈরির পক্ষপাতী যাতে করে পণ্য সামগ্রীর সহজলভ্যতা থাকে, দামে কম, গুণেও ভাল থাকে। গুণগত মান রক্ষার জন্য এবং দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য একই জিনিস একাধিক মিলে তৈরি করার ব্যবস্থাকে ইসলাম উৎসাহিত করে যা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও বিদ্যমান।

ইসলাম মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদিকে নিষেধ করেছে এবং এ নিয়ে কোন ব্যবসা করাও অনুমোদন করে না। অনুপার্জিত টাকার উপর মানুষের কোন মায়া থাকে না যা অনেক অনিষ্টকর কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। তাই ইসলাম কষ্টার্জিত বা নিজের শ্রম ও মেধা ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনকে শুধু অনুমোদন করে। কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয়েও মানুষ সতর্ক থাকবে যা বিনা প্রয়োজনে বা অন্যের ক্ষতি করার কাজে ব্যয় করা সম্ভব হবে না। রাসূল (স) এর নিকট যখন একজন লোক সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন তখন তিনি তাকে সরাসরি সাহায্য না করে বলেছিলেন, তোমার ঘরে যা আছে তা বিক্রি করে এমন একটি জিনিস ক্রয় কর যা দিয়ে তুমি নিজে উপার্জন করতে পারবে। লোকটি তাই করেছিল। এ ধরনের বহু নির্দেশ কোরআনেও আছে।

৫. সকল ক্ষেত্রে 'সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ' বাস্তবায়ন

'আমর বিল মা'রূফ' বা সৎ কাজ বা ভাল কাজের আদেশ প্রদান এবং 'নেহী আনিল মুনকার' তথা অসৎ বা মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। আল্লাহ তায়ালার এই দীপ্ত ঘোষণার এক অর্থ সমাজের সর্বস্তরে সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির প্রতিরোধ করা। এই নীতির বাস্তবায়ন নেই বলেই পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে পর্বতসম বৈষম্য আর শোষণ, বঞ্চনা বিদ্যমান। আর এ কারণে এই ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে এই নীতির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

৬. সকল কর্মকাণ্ডে শরীয়াহ বিধি-নিষেধ মান্য করা

আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী সকল মুসলমানের জন্য পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলামী শরীয়াহর নির্দিষ্ট বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে হবে কোরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক। অর্থাৎ ইসলামে কিছু পেশা বা বৃত্তি অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবার কিছু পেশাকে বৈধ বা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়াতের বিধান অনুসরণ করতে হবে। শরীয়াতের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে পেশা গ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না। তেমনিভাবে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও কতগুলো হয়েছে হারাম তথা নিষিদ্ধ খাবার, কতগুলো আছে হালাল তথা বৈধ। কিন্তু বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া আর যত অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে তাতে এ ধরনের হারাম, হালাল, বৈধ-অবৈধ বিধানের বাধ্য-বাধকতা নেই। আধুনিক সরকারগুলো নিজেদের স্বার্থে কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে কোন কাজকে বৈধ-অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের মনগড়া মতবাদেই কেবল এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স) প্রদর্শিত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। যে সকল কর্মকাণ্ড বা পেশা, বৃত্তি, খাদ্য, পানীয়, ইসলামী শরীয়াতে হারাম-হালাল তথা অবৈধ-বৈধ করা হয়েছে তা কেবল জনগণের কল্যাণ তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তিকে সামনে রেখে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ব্যবস্থায় একই আইন

www.pathagar.com

কখনো নিষিদ্ধ আবার কখনো বৈধ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সময় মদ্যপান ও মদ তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা পুনরায় অনুমোদন করা হয়। কিন্তু কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা-"হে নবী! তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলে দিন, এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।" (বাক্বারা-২১৯) অন্যত্র এসেছে-"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনে রাখ, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবই শয়তানী নিকৃষ্ট কাজ। সুতরাং এ সব থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার।" (মায়েদাহ-৯০)

৭. ন্যায়বিচার ও কল্যাণ তথা আদল ও ইহ্সান-এর প্রয়োগ

ইসলামী অর্থনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য মূলনীতি হচ্ছে আদল ও ইহ্সান। পবিত্র কোরআনে বহুবার আদল ও ইহ্সান তথা ন্যায়বিচার ও কল্যাণের তাগিদ এসেছে। কারণ প্রচলিত পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও কল্যাণের বিষয়টি অনুপস্থিত। সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র, বঞ্চিত, নিঃস্ব বা ভাগ্যহারা লোকদের কোন অধিকার ঐ সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য দিক হল আদল এবং ইহ্সান। আল্লাহ্ বলেন,-"তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর, এটা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। (মায়েদাহ-৮) অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তোমরা ইহ্সান (কল্যাণ) কর, আল্লাহ ইহ্সানকারীদের ভালবাসেন।" (বাক্বারা-১৯৫) পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাবশালী আমলাদের অঙ্গুলি নির্দেশে যে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ধনী-গরিবের মধ্যে পর্বতসম বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ধনী শ্রেণী আরো ধনী হচ্ছে বিপরীতে গরিব আরো গরিবে পরিণত হচ্ছে। আর ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিতে যে আদল ও ইহ্সানের কথা বলা হয়েছে এর মাধ্যমে ধনী গরিবের বৈষম্য ঘুচিয়ে বরং সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। কারণ দুর্বল, অসহায়, বঞ্চিতের প্রতি কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম দিক। এ লক্ষ্যে ইসলামে যাকাত-এর মত যুগান্তকারী ও কল্যাণকামী ব্যবস্থাসহ উশর, সাদকাতুল ফিতর, ফরযে হাসানা ইত্যাদি ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

সমাজে ধনী, গরিব, শিল্পপতি, শ্রমিক, নিঃস্ব, অসহায়, বঞ্চিত শ্রেণীর লোকের বসবাস। মহান সৃষ্টিকর্তা কাউকে অগাধ প্রাচুর্য দিয়েছেন, আবার কাউকে একেবারে গরিব, অভাবী করে রেখেছেন। এ সবই আল্লাহর অমোঘ বিধান। কিন্তু এই বিধান অর্থহীন নয়, এর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের নির্দেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের মাঝে বণ্টন করা অর্থাৎ সম্পদশালী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যারা ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয় সামর্থ অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা সম্পদশালী ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।" (জারিয়াহ্-১৯)। "তুমি আত্মীয়-স্বজন, গরিব ও পথের কাঙালদের তোমার নিকট থেকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (বনী ইসরাইল-১৬) সুতরাং সমাজের সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দারিদ্র্য দূরীকরণে এগিয়ে আসতে হবে। আর এভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্যের দুষ্টক্ষত নিরাময় করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

৯. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ

সমাজকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সমাজের গণমানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করা অত্যাবশ্যক। কারণ সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর প্রায় অধিকাংশই জনগণের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রগুলো জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইসলাম মানুষের এই মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে যে তাগিদ দিয়েছে তার নজীর অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পাওয়া দুষ্কর। ইসলাম প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে তাঁর নিজ নিজ এলাকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নির্দেশ দিয়েছে। মূলত বায়তুল মাল থেকে সমাজের অভাবগ্রস্তদের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিধান রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে ইবনে হাযম এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "প্রতি এলাকার ধনী ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও সম্বলহীনদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুত সম্পদ এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারে।"

(আল-মুহাল্লাত)

১০. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুস্পষ্ট জীবন বিধান দিয়ে। মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের আলোকে পরিচালিত হবে। যেহেতু ইসলাম শান্তির ধর্ম, ন্যায়, আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায়ও রয়েছে এক অনুপম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলামে ত্যাগ ও ভোগের সুসমন্বয় ঘটানো হয়েছে। মানুষ লালসাপ্রিয়। ভোগ-বাসনা পূরণের জন্য মানুষ যে কোনউপায়ে সম্পদ অর্জন করতে চায়। কিন্তু ইসলামে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ভোগের কোন সুযোগ নেই। অধিক ব্যয় ও কৃপণতার স্থান ইসলামে নেই। সৎ উপায়ে উপার্জন ও সৎ উপায়ে প্রয়োজনমত ব্যয় করাই এর উদ্দেশ্য। কারণ অমিতব্যয়ী ও কৃপণ সমাজের মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। অমিতব্যয়ী মানুষকে তার ন্যায় আচরণের দিকে প্ররোচিত করে। আবার কৃপণও মানুষকে কৃপণতার দিকে প্ররোচিত করে। সুতরাং বৈরাগ্য সাধন, সংসারধর্মত্যাগ, অমিতব্যয়ীতা, কৃপণতা ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে ইসলাম এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবান জানায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ঐ সমস্ত লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্যদেরকেও কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে।"((নিসা-৩৭)

"নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (বনী ইসরাইল-২৭)

আল্লাহ তায়ালা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, তারাই আল্লাহর নেক বান্দা, যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে অপচয় ও অযথা খরচ করে না এবং কোনরূপ কৃপণতাও করে না।"

www.pathagar.com

১১. ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সকল ধর্মের, সকল আদর্শের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ব্যতীত অপরাপর অর্থ ব্যবস্থায় কেবল ইহকালীন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরকালের জন্য কল্যাণ অর্জন উভয় জীবনকে সমান গুরুত্ব প্রদান করে। আখিরাতের যা কিছু অর্জন তা এই দুনিয়ার জীবন থেকেই সময় থাকতেই করে নিতে হবে। রাসূল (স) বলেন, "দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।" হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাকার ধর্মে পরকালের কোন অর্জনের কথা বলা হয় না। বস্তুত এ তিনটি ধর্মে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকেই জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে–যা সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়। আর ইসলামে পরকালীন জীবন ইহকালীন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং পরকালকে বাদ দিয়ে কেবল ইহকালের জীবনে ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়ার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম দুনিয়াতে হালাল কাজের জন্য সুসংবাদের সাথে সাথে অনন্ত জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টির ও মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, সীমালঙ্ঘন করে, গরিব দুঃখী মানুষের কোন উপকারে আসে না তারা এই দুনিয়াতে যেমন চরম লাঞ্ছনা, গঞ্জনার শিকার হবে তেমনি অনন্ত জীবনেও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে অবর্ণনীয় শাস্তি।

আল্লাহ বলেন, "অতিপীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও সেই সব লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Islamic Economic

ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অপরাপর প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অধিকতর যুগোপযোগী এবং কল্যাণকামী। নিম্নে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

১. হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথে ব্যয়

ইসলামী জীবন বিধানের একটি অপরিহার্য দিক হচ্ছে হালাল ও হারাম তথা বৈধ-অবৈধ পন্থায় আয় ও ব্যয়। ইসলামের নির্দেশ হল উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত হালাল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর হালাল পন্থায় উপার্জিত সব কিছু হালাল বা বৈধ পথেই ব্যয় করতে হবে। এটা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন, বন্টন, উপার্জন, ভোগ ইত্যাকার অর্থনৈতিক বিষয়ে ইসলামের এই বিধান প্রযোজ্য। তাই শরীয়াহর দৃষ্টিতে যা কিছু হালাল বা বৈধ তা উপার্জন ও ভোগের স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) বলেন, "যারা সৎ উপায়ে জীবিকার্জন করে তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র।" (আল-হাদিস) তাছাড়া হালাল ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর ঘোষণা "হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে তোমারা আহার কর। কখনো শয়তানের পথ অনুসরণ করো না।" (আল-বাক্বারা–১৬৮) "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে সব খাদ্যদ্রব্য দান করেছেন, তন্মধ্যে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে তোমরা আহার কর আর

www.pathagar.com

আল্লাহর অনুগ্রহরাজির জন্য কতৃজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (আন-নাহল-১১৪) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করো না।" (নিসা) রাসূল (স) বলেন, "সর্বোত্তম কাজ হল বৈধ উপায়ে উপার্জন করা।"

২. ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন

সুষম তথা ইনসাফভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হালাল উপায়ে অর্জিত আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার উপর একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। জনসাধারণের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এসবই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। সেই সাথে সম্পদ যেন মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় যে দিকেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ধন-সম্পদের সুষম তথা ইনসাফভিত্তিক বন্টন নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনৈতির মৌল ভিত্তি। এখানে স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্যায়ভাবে বৈষম্যমূলক বন্টনের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ বলেন, "সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়।" (হাশর-৭) "অযথা ব্যয় করো না, অযথা ব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" (বনী ইসরাইল-২৬, ২৭) আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" তবে ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তাতে আপত্তি নেই।" (নিসা-২৯) কারণ "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।"

৩. যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থাকে একটি ধর্মীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নগদ অর্থ বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের অধিক বা ৫২ তোলা রূপার অধিক কারো নিকট ১ বৎসরের বেশি সময় জমা থাকলে তাকে আড়াই শতাংশ যাকাত দিতে হবে। যাকাতের এই পরিমাণ নির্ধারিত, ইহা কমবেশি করা যাবে না। এছাড়া বিভিন্ন পণ্য, ঘর বাড়ি, পশুর উপরও যাকাত দিতে হবে যদি তা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হয়। আর উৎপাদিত পণ্যের যাকাত তথা উশর ১০ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত।

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরিব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে গুটিকয়েক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় এবং তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটি দপ্তর ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের। রাসূলে করিমের (স) মৃত্যুর পর বিরাজমান দুঃসময়ে মিথ্যা নবী দাবীকারীদের বিদ্রোহের মুখেও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন "যদি কারও কাছে উট বাঁধার রশি পরিমাণ যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ

www.pathagar.com

ঘোষণা করছি।" এই ঘোষণার সুফল পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই। গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হল সেদিনের আরবে সর্বহারা শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

৪. বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত অর্থসম্পদই বায়তুল মাল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। বায়তুল মালের উৎস ও ব্যবহার বিধির বিচারে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অর্থ সম্পদের উপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-এলাকা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত না হয় সে জন্যে বায়তুল মাল হতেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) একে আরো সুসংহত করেছিলেন।

বায়তুল মালের অর্থ যেসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য নির্দেশ রয়েছে সেগুলো হল :

(ক) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন,

(খ) বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ পোষণ,

(গ) ইয়াতীম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন,

(ঘ) অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান,

(ঙ) করযে হাসানা প্রদান এবং

(চ) দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজকল্যাণ।

৫. ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন

আজকের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। বিশেষকরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দুশো বছরের বেশি সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকাশক্তি। সুদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুদের যেসব অর্থনৈতিক কুফল ইতোমধ্যেই মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেসব রীতিমত ভীতিপ্রদ। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(ক) সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে,

(খ) সামাজিক শোষণ বিস্তৃত, ব্যাপক ও অব্যাহত থাকে,

(গ) ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়,

(ঘ) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়,

(ঙ) সম্পন্ন ও সচ্ছল কৃষকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে পরিণামে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয় এবং

(চ) সুদের হার কখনও স্থির থাকে না, চক্রবৃদ্ধি হারে ক্রমেই বেড়ে যায়, ফলে শোষণের মাত্রাও বাড়ে।

www.pathagar.com

৬. ফরযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে ফরযে হাসানা ও মুদারিবাত অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে এটি ছিল সমকালীন অর্থনীতিতে এক বলিষ্ঠ ও ভিন্নতর পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবারে বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই ফরযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বৈপ্লবিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাসূল (সা) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরে সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশী এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথভাবে চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির সীমানায় ঘেঁষতে পারে নি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য।

৭. ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ

শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই ভাই-এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্য। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" শ্লোগানসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যামূলক শ্রমদান এখানে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মত মনে করবে,

(খ) মৌলিক মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে,

(গ) কাজে নিযুক্তির পূর্বে শ্রমিকের সাথে যথারীতি চুক্তি হবে এবং তা যথাসময়ে পালিত হতে হবে,

(ঘ) শ্রমিকের অসাধ্য কাজ তার উপর চাপানো যাবে না,

(ঙ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নিচে মজুরি নির্ধারিত হবে না।

(চ) পেশা পরিবর্তনের অধিকার শ্রমিকের থাকবে,

(ছ) পরিবার গঠনেরও অধিকার তার থাকবে,

(জ) স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের অধিকার থাকবে,

(ঝ) স্থানান্তরে গমনের অধিকার শ্রমিকের থাকবে এবং

(ঞ) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকে না।

৮. ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্প বিপ্লবের পরে জমির উৎপাদন যখন বহুগুণে বৃদ্ধি পায় তখন বহু বড় শিল্পপতিরাও হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। একই সাথে ব্যারন লর্ড মার্কুইস পীয়র মানসবদার জায়গীরদার তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদের শোষণ বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তিমালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, ব্যক্তিকে জমি থেকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে।

এই উভয় প্রকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইসলাম তার অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছে। আল কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন –

"জমি আল্লাহ্ তাআলার। তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারত্ব দান করে থাকেন।" (আল আরাফ-১২৮)

৯. উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন

রাসূলে করিম (স) আবির্ভাবের পূর্বে সারাবিশ্বে উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করত। বঞ্চিত হত পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা দুটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ছিল হিন্দু, খ্রিষ্টানও ইহুদী ধর্মের। কারণ সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে পুঁজি পুঞ্জিভূত হয়ে উঠবে না। সম্পত্তির বলেই এরা সমাজের প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হবে। এরাই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়।

এরই প্রতিবিধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল কোরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই আইন যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। ছলে-বলে কৌশলে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধূদের, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের, বোনদের, খালা, ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জিভূত হয়ে চলেছে। এই অবস্থা নিরসনের জন্য ইসলামী মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয় তার সঠিক প্রেক্ষিতেই।

১০. ব্যবসায়িক অসাধুতা ও সবধরনের জুয়া উচ্ছেদ

সকল প্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেশের সরকার খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ব্যবসায়ীরা হয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করে অথবা দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোন কোন দেশে তো ব্যবসায়ীরা সরকারকে অবৈধ সুযোগ লাভের জন্য ঘুষ দিয়ে থাকে। ইসলামে মাদক দ্রব্য ও নেশার সামগ্রীর ব্যবসা শুধু নিষিদ্ধ নয় বরং চোরাকারবারী কালোবাজারী মজুদদারী মুনাফাখোরী প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি জঘন্য ধরনের অপরাধ। ব্যবসায়িক অসাধুতার ফলেই জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে নিদারুণ দুর্ভোগ। এমনকি বুলেটের আঘাতে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সরকারের রাজস্ব পর্যন্ত হ্রাস পায়।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন "যারা ওজনে কম দেয়, পরের জিনিস ওজন করে নিলে পুরো গ্রহণ করে কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয় তখন পরিমাণে কম দেয় এরা

www.pathagar.com

নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।" (আল মুতাফফিফীন : আয়াত ১-৩)। রাসূল (স) বলেন, "বাজারে খাদ্য আমদানিকারকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত আর মজুতকারীগণ আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)। তিনি আরো বলেন, "পাপী লোক ছাড়া কেউ মজুদ করে না। সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে থাকবে।" (ইবনে মাজাহ)।

১১. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুবিচার তথা আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার এবং আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার আলোকেই বিচার বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারুফ' বা সুনীতি প্রতিষ্ঠার ও 'মুনাফা' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুনাফা প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুনীতিমূলক কাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং একই সাথে আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা।

১২. সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

যে কোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সমাজকল্যাণ ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই ইসলামী অর্থনীতির সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বাত্মক জোর এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধা প্রদানও সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আল কোরআন ও হাদিস শরীফে যে নির্দেশ রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজদেহে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন,

"তাদের (বিত্তশালীদের) ধনসম্পদে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্থদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।" (আল জারিয়াহ-১৯)। "তুমি আত্মীয়স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙালদেরকে তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (বনী ইসরাইল-২৬)

রাসূল (স) এর বাণী, "তোমাদের ধন সম্পদে (যাকাত-ছাড়াও) সমাজের অধিকার রয়েছে।" (তিরমিযী)

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি জানার জন্য উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই যথেষ্ট নয়। এছাড়া সম্পদের উপর কোরআনিক মালিকানা নীতি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি, গনিমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যবহার বিধি; জুয়া, লটারি, ঠকবাজি নিষিদ্ধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অপরাপর অর্থব্যবস্থা থেকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে - যার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে একই সাথে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায় তো তারই মধ্যে প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে যে ঘোষণা করে :

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার রোজা, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ তাআলার জন্য।" (আল-আনয়াম-১৬২)

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতির সাথে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনা
Comparative Study of Islamic and Western Economics

পাশ্চাত্যের নীতি নিরপেক্ষ এবং জড়বাদী অর্থনীতি সমাজের সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এই ব্যবস্থার একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদ যেখানে অবাধ ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। যার ফলে সমস্ত সম্পদ ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং শ্রমিক শ্রেণী হয় শোষিত, নির্যাতিত। অন্যদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাস্বত্তকে হরণ করে জোরপূর্বক সমাজের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করা হয়, যার ফলে সমাজের বণিক শ্রেণী হয় অত্যাচারিত। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা হল এক নির্ভুল ও কালজয়ী অর্থব্যবস্থা যেখানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সত্যিকার অর্থে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এই উভয় ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অনন্য। প্রফেসর Gibb এর মতে,

"This is the fact that is only Islam which has been successful in bringing about a happy co-ordination between the western capitalism and the Roussian socialism."

পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা : অ্যাডাম স্মিথ ও অনুবর্তীদের নিরপেক্ষ জড়বাদী অর্থনীতি ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে সমাদৃত হয়নি। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পাশ্চাত্যের অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করা হল :

সাদৃশ্যসমূহ :

১. ইসলামী অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য অর্থনীতি উভয়েই মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করে।

২. ইসলামী অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য অর্থনীতি উভয়েই সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও তার বন্টন এবং ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে।

৩. উভয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত এবং প্রণীত হয়েছে।

৪. ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আয়ে উভয় অর্থনীতিই সঞ্চয়ে বিশ্বাসী।

৫. ইসলামী ও পাশ্চাত্যের এই উভয় প্রকার অর্থনীতি দক্ষ শ্রমিক, শ্রমের গতিশীলতা ও উৎপাদনে নতুনত্ব কামনা করে।

৬. উভয় অর্থব্যবস্থার কার্যক্রমে আরো কিছু মিল রয়েছে। যথা : মুদ্রা সমস্যা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সাধারণ ব্যাংক এবং বিনিয়োগ যার মাধ্যমে জনসাধারণকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

বৈসাদৃশ্যসমূহ : পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১. **সম্পদের মালিকানা :** সম্পদের মালিকানার দিক থেকে বিচার করলে বিভিন্ন

www.pathagar.com

অর্থব্যবস্থার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। পুঁজিবাদে সম্পদের মালিক হয় ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী নিজেই। আর সমাজতন্ত্রে উৎপাদন যেই করুক না কেন সম্পদের মালিক হল রাষ্ট্র। আর এক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সম্পদের মালিক হল আল্লাহ নিজেই। মানুষ শুধু তার আমানত মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আছে সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি।" সুতরাং ইসলামে সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, মানুষ সে সম্পদ তার প্রয়োজনে এবং ইসলামের নির্দেশিত পথে ব্যবহার ও ব্যয় করার অধিকার ভোগ করে।

২. **ব্যক্তি মালিকানা :** পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যতদূর সম্ভব সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় রাখা আইনসিদ্ধ। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদ যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখা আইনসিদ্ধ। ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী মানদণ্ডে মানব কল্যাণই চরম লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থান কাল ও অবস্থানভেদে সম্পদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে ব্যক্তি সমাজ বা সরকারের হাতে। এখানে সম্পদের উপর কারও একক আধিপত্য থাকবে না।

৩. **উপার্জনে বৈধতা :** পুঁজিবাদে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ উপার্জনের অধিকারের বৈধতা আছে, যার ফলে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে বলে এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে ন্যায়সঙ্গত উপার্জনের অধিকার সকলেরই আছে। আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। কেবল মাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হয় তা বৈধ" (নিসা-২৯)। ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হল হালাল বা বৈধ উপায়ে উপার্জনের বিধান - অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব দেয়া হয় নি, আর বৈধ উপায়ে উপার্জন করলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হবে না। কারণ সম্পদ বৈধ পথেই শুধু ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে।

৪. **সর্বজনীন অর্থব্যবস্থা :** পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু তাকে সমাজের সার্বিক স্বার্থে কাজ করার পেছনে অনুপ্রেরণা দেয় না। সমাজতন্ত্রে ধনিক শ্রেণীর সম্পদকে ছিনিয়ে নিয়ে সকল মানুষকে বেপরোয়াভাবে রাষ্ট্রের গোলামী জিঞ্জিরায় আবদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা হল একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের সকলের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ ব্যক্তি সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করবে যাতে সমাজের অন্য কারো ক্ষতি না হয় যদিও ব্যক্তির সম্পদের ব্যবহারের মালিক সে নিজেই।

৫. **উত্তরাধিকার আইন :** পুঁজিবাদে সম্পদের মালিক ইচ্ছা করলে যে কাউকে, এমনকি পোষ্য কুকুরকে পর্যন্ত নিজের সম্পদ দান করে যেতে পারে। সমাজতন্ত্রেও উত্তরাধিকার আইন চালু আছে। আর ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে কার কতটুকু সম্পদ প্রাপ্য তা পূর্ণভাবে বিভাজন করে দিয়েছে। কোরআনে ঘোষণা, "পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন নির্দিষ্ট অংশ আছে, তেমনি নারীদেরও নির্দিষ্ট অংশ আছে। প্রত্যেকের জন্য এ অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে তা কম হোক আর বেশি হোক।" (নিসা-৭)। সম্পদের এ ধরনের সুনির্দষ্ট বণ্টন ব্যবস্থা শুধু ইসলামেই আছে যার ব্যতিক্রম করার অধিকার কারো নেই।

www.pathagar.com

মিকের অধিকার : পুঁজিবাদে শ্রমিক শুধু খেটেই মরে, মালিকের উপার্জনে তার ধকার নেই। সমাজতন্ত্রে সকল আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকায় সবাই পর্যায়। তাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ নেই। তারা শুধু যন্ত্রের মত কাজ করে উৎপাদন করে কন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থা মালিকের উপার্জনে শ্রমিকের বৈধ অধিকার সমর্থন করে। বী (স) বলেছেন, "শ্রমিকরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা ও হাঁর অধীন করে দিয়েছে।" শ্রমিকদের মজুরি তাদের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে প্রদানের দেশ আছে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) বলেন, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক হবে ভাই ভাইয়ের সম্পর্কের ন্যায় যাতে মালিকরা শ্রমিকদেরকে মজুরের ন্যায় না দেখে এবং শ্রমিকরাও মালিকদেরকে প্রভুর ন্যায় না দেখে।

৭. সুদ প্রথা : "Higher rate of interest higher level of unemployment and lower rate of interest, lower level of unemployment. এই উক্তি থেকেই সুদের জঘন্যতা প্রমাণিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান উৎস হল সুদ। সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে সুদ চালু না থাকলেও ব্যাংক বীমার মাধ্যমে সুদকে বহাল রাখা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুদের পরিবর্তে এখানে Profit loss sharing system চালু করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমনাদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যে সমস্ত সুদ বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।" (বাক্বারা-২৭৮)। রাসূল (স) বলেন, "মহান আল্লাহ সুদখোর, সুদ দাতা ও উহার লেখক ও স্বাক্ষীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।" (সহীহ বুখারী)

৮. কর-যাকাত : পুঁজিবাদে কঠিন করের বোঝা জনগণের উপর চাপানো হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে ধনী ও গরীবের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যেমন একদিকে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রের আয়ের জন্য করের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি এর মাধ্যমে সেগুলোকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ।" (তাওবা-১০৩)

৯. দুর্নীতি : পুঁজিবাদে অবাধ ব্যক্তিমালিকানা থাকায় দুর্নীতিবাজদের আর্বিভাব ঘটে। সমাজতন্ত্রে অবশ্য এর অবকাশ কম। আর ইসলামী অর্থনীতিতে দুর্নীতির কোন প্রশ্রয় নেই। এখানে ইসলামী আইন মোতাবেক প্রশাসন পরিচালিত হয়। মহানবী (স) বলেন, "ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।" (আবু-দাউদ ও তিরমিযী)

১০. রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব : পুঁজিবাদে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে জোর দেওয়া হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি সেখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে রাজনৈতিক এমনকি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি হল একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে উভয়েরই মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে তার কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই।"

১১. আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : পুঁজিবাদে আয় ব্যয়ের কোন বৈধ ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি না থাকায় অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন, কার্পণ্য ও অপব্যয়ের জন্য অন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। সমাজতন্ত্রে আয় ব্যয়ের নীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, সেখানে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা

www.pathagar.com

নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি রয়ে কার্পণ্য ঘৃণীত এবং অপচয় নিরুৎসাহিত। আল্লাহ বলেন, "তোমরা খাও, পানাহার অপচয় করবে না, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতি প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাঈল-২৬, ২৭)

১২. সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা : পুঁজিবাদে বণ্টন ব্যবস্থা অসমতার কারণে ধনীরা ধনী এবং গরীবরা আরও গরীব হয়। আর সমাজতন্ত্রে চরম বণ্টনের ফলে উৎপাদন হ্রাস প… এখানে ইসলাম একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে সম্পদ কিছু সরকারি আর কিছু ব্যক্তি মালিকান… থাকবে, যাতে করে সম্পদ ধনীদের হাতে গচ্ছিত না হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "সাবধান, সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।" (হাসর-৭)

১৩. ধন সঞ্চয় ও পুঞ্জিভূত করা : পুঁজিবাদে অধিকাংশ ধনসম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে আটক থাকে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র হল সকল সম্পদের স্বত্তাধিকারী। পক্ষান্তরে ইসলামের কথা হল কোন ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ গচ্ছিত রাখতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, "যারা স্বর্ণ, রূপা জমা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (তওবা-৩৪)

১৪. সামাজিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি : পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

১৫. কল্যাণমূলক : পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি শুধু নিজের সুখের চিন্তা করে আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজের সুখ চিন্তা করার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থা হল একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি একই সাথে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি দরিদ্র ও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করতে পারে।

১৬. অসহায় ও বঞ্চিতদের অধিকার : পুঁজিবাদে দরিদ্রদের প্রতি দান খয়রাত দানকারীর পরম কৃপা হিসেবে পরিগণিত হয়। সমাজতন্ত্রে এরূপ কোন দয়া দাক্ষিণ্যের স্থান নেই। ইহা সাম্যের কথা বলে। আর শুধুমাত্র ইসলামেই দরিদ্রদের অধিকার স্বীকৃত আছে। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের ধন সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে"। (জারিয়াহ-১৯)

১৭. উৎসগতদিক থেকে : ইসলামী অর্থনীতির নীতি, তত্ত্ব ও সূত্রসমূহ আল্লাহর দেওয়া কোরআন ও সুন্নাহ স্বীকৃত। আর প্রচলিত পাশ্চাত্য অর্থনীতির নীতিমালা, তত্ত্ব ও সূত্রসমূহ মানব রচিত। তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতিতে শারীরিক কল্যাণের চেয়ে আর্থিক কল্যাণের মূল্য বেশী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য অর্থনীতি নিছক কল্পনাবিলাস মাত্র। এখানে মানুষের মানসিক ও আর্থিক লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা করা হয় না।

১৮. ভোগ ও চাহিদা : পুঁজিবাদ ব্যক্তির ভোগের ধারাকে মোটেই নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে বহুবিকৃত রুচি সৃষ্টিকারী পণ্য উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে ভোগের অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ভোগের সীমাহীন স্বাধীনতা ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কোনটাই সমর্থন করে না। হালাল-হারাম বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

www.pathagar.com

কথা : সুতরাং সর্বশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, ইসলাম দুটি পরস্পর র্থব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা উপস্থাপন এই অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার প্রদানের পাশাপাশি কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করার ব্যবস্থা করেছে, যা অর্থনীতির নীতির প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। সাম্প্রতিককালে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে এখন এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই যা রোপুরিভাবে পৃথিবীর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত পরীক্ষিত হয় নি, যা খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় চালু ছিল। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে চালু করা হয়েছিল, যেমন- আদিযুগে Primitive Communism পরে সামন্তবাদী ব্যবস্থা, পরে Laissez fairer, capitalism এবং Communism ও socialism এবং স্বদেশে মিশ্র অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির, কিন্তু কোন একটিও আজ পর্যন্ত সর্বাধিক ও সর্বকালের জন্য এবং সকল মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত হয় নি। এদের প্রত্যেকটিরই এমন কিছু ত্রুটি বা অভাব রয়েছে যার জন্য সকল মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত হতে পারেনি। একমাত্র ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সকল মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। কারণ এতে রয়েছে এমন কিছু ব্যবস্থা ও আদেশ নিষেধ যা ধনীকে আরো ধনী বানাতে এবং গরীবকে আরো গরীব বানাতে সাহায্য করে না এবং যাতে রয়েছে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে একই রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ হিসেবে বিবেচনা— যেখানে উচু নীচু, ধনী গরীব বংশ মর্যাদা ইত্যাদিতে বিভাজনের কোন অবকাশ নেই। সকল মানুষ একই আদম ও বিবি হাওয়া হতে সৃষ্ট। ইসলামী অর্থনীতির মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের সীমিতকরণ ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অন্য সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ হলেও বর্তমানে বিশ্বে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুরোপুরি বাস্তবায়ন কোথাও হয়নি, এমনকি যে সকল দেশ ইসলামী রাষ্ট্র বলে পরিচিত সেখানেও না। হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিফল হবে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ইনসাফের ভিত্তিতে মিটানোর জন্য তখন ইসলামী ব্যবস্থা experiment হিসাবে চালু করা হবে যা এখন কোন কোন দেশে প্রারম্ভিক পর্যায়ে চালু করা হয়েছে। যেমন-Islamic Banking system যা Traditional baking system হতে ভিন্ন আর এর সুফল যখন মানুষ পেতে থাকবে তখন হয়তো Islamic Ecnomic system একটি স্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হবে। ওমর চাপরা তাঁর বিখ্যাত "ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ" গ্রন্থে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও বর্তমানে প্রচলিত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্য সকল ব্যবস্থা হতে বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ এটি মানবত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ হতে সৃষ্ট। তাই এটি সর্বজনীন ও স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত যাতে লাভ লোকসান বা মুনাফাই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এতে রয়েছে মানুষের কল্যাণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন, সহজ ও মানবতাভিত্তিক অর্থনৈতিক আদান প্রদান।

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা কি? ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ আলোচনা কর।
[What is Islamic Economic system? Discuss its principles.]

২. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
[What is means by Islamic Economic system? Discuss its features.]

৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থা কি? ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।
[What is Islamic Economic system? Discuss and compare between Islamic Economic system and capitalistic Economic system.]

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা
Islamic State System

❑ প্রাক-কথা, রাজনীতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত, রাজনীতি ও নৈতিকতা, রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ও সংজ্ঞা, ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী, ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি, মজলিসে শূরা, রাষ্ট্র পরিচালনা, ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা, ইসলামিক রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রাক-কথা
Introduction

রাষ্ট্র হল এমন একটি জনসমষ্টি অধ্যুষিত ভূ-খণ্ড যার একটি সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। আর ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে যে রাষ্ট্র কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীআতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে "দারুল ইসলাম" বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণও মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের মুসলিম হওয়া, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কোরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনাই এখানে মুখ্য। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দেয়ার জন্য মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদান এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রও কতগুলো উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন—জনগোষ্ঠী, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি। ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং মৌল নীতিমালা। কোরআন, আল-হাদিস, ইজমা, কিয়াস প্রভৃতি মৌলিক উৎসের উপর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

রাজনীতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত
Politics : Oriental and Western Perspective

মূলত রাষ্ট্রসংক্রান্ত নীতি-ই হল রাজনীতি। এককালে রাজার নীতি বা রাজাদের শাসননীতিকেই রাজনীতি বলে মনে করা হত কেননা তখন প্রচলিত ধারণা ছিল The king can do no wrong. মিসরের রাজা ফেরাউনকে, চীনের সম্রাটকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হত, ইংল্যান্ডের রাজা-রাণীকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ধারণা করা হয়, জাপানের সম্রাটকে এখনও দেবতা বলে জ্ঞান করা হয়। যদিও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এসব দৈবতত্ত্ব practically ineffective বা অকার্যকর।

বাংলা শব্দ 'রাজনীতি'র পাশ্চাত্য বা ইউরোপিয় পরিভাষা হলো politics. আর এর প্রাচ্য তথা আরবি বা ইসলামী পরিভাষা হল 'সিয়াসত'। 'সিয়াসত' বলতে কর্মকাণ্ড, নেতৃত্ব ও কৌশল নীতি'র সমন্বয়কে বুঝানো হয়।

ইবনে খালদুন সর্বপ্রথম রাজনীতি'কে একটি বিজ্ঞানে উন্নীত করে এর তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন—

(i) আসাবিয়া বা দলীয় সংহতি

(ii) ধর্ম বা আদর্শের (Ideology) প্রতি আনুগত্য

(iii) কৌশলে অন্যান্যদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেছেন -

রাজনীতি হচ্ছে এমন এক বিধিব্যবস্থা যা রীতিনীতি, কল্যাণকর কার্য এবং সামগ্রিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।

এরিস্টটলের মতে -

Politics is a practical art of doing. (অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে কর্মসাধনের বাস্তব কলা।)

Oxford Dictionary-তে রাজনীতির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে -

(i) Politics means the science and art of government, the science dealing with the form, organization and administration of a state. (অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে সরকার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও কলা, একটি রাষ্ট্রের কাঠামো, রূপ, সংগঠন ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।)

(ii) Politics is the branch of moral philosophy dealing within the state of social organization as a whole. (অর্থাৎ রাজনীতি হল নৈতিক দর্শনের শাখা যা সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয় দেখাশুনা করে।)

রাজনীতি ও নৈতিকতা
Politics and Morality

মানুষের চরিত্র যাচাই করা এবং আচার-আচরণের পদ্ধতি প্রণয়ন করার নামই হচ্ছে নৈতিকতা। মানুষের কাজকর্ম, আচার-আচরণের ভালো-মন্দ, সত্যাসত্য এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের

www.pathagar.com

ন্যায়-অন্যায় (Rightness/Wrongness) প্রভৃতি দিক সম্পর্কে দৃষ্টিপাত রাখাই নৈতিকতার আলোচ্য বিষয়।

ড. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান লিখেছেন, 'রাজনীতি হচ্ছে সর্বাগ্রে নীতি সম্পর্কে, আর নীতি হচ্ছে কোন কিছু পরিবর্তন করার কামনা বা পরিবর্তনের হাত থেকে কোন কিছুকে হেফাজত করার বাসনা।'

Mr. Fox (ফক্স) বলেছেন, 'What is morally wrong can never be politically right, we may say that politics is conditioned by ethics.' অর্থাৎ নৈতিকতার দিক দিয়ে যা ভুল রাজনীতির দৃষ্টিতে তাহা কখনই সমীচীন হতে পারে না। বরং আমরা বলতে পারি যে, রাজনীতি নৈতিকতার শর্তে আবদ্ধ।

ড. আল্লামা ইকবালের মতে, 'জালালে বাদশাহী হো ইয়া জমহুরী তামাশা হো, জুদা হো দ্বীন সিয়াসত সে তো রাহজাতি হ্যায় চেংগিসী'। অর্থাৎ জাহানশাহীর দাপট হোক বা গণতন্ত্রের প্রহসন হোক, রাজনীতি থেকে ধর্ম আলাদা করলে থাকে শুধু চেংগেসী বর্বরতা।

জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর হেলমুট কোহলের মতে, রাজনীতিকে যদি দুর্নীতির কলুষমুক্ত করা যেত, তাহলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণ-বঞ্চনার ৬০ শতাংশ স্বতঃস্ফুর্তভাবেই দূরীভূত হয়ে যেত। তাহলে বুঝা যায় যে, দুর্নীতির উচ্ছেদ এবং সুনীতির প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির প্রধান ইস্যু হওয়া উচিত।

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী
Islamic Views of Politics

একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের বুনিয়াদে ইসলামভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনের শৃঙ্খলা বিধান করাই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির সারকথা। রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী হল - Soverignty and rulership of god. অর্থাৎ প্রভুত্ব যদি কোন ব্যক্তির আছে বলে স্বীকার করা হয়, তবে Individual will পূর্ণ করা হবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। প্রভুত্ব যদি জনসাধারণের বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে General will or National will পূর্ণ করা হবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। আর প্রভুত্ব যদি আল্লাহর হয়, তবে Will of God প্রতিষ্ঠা হবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। আর সেটাই হল হুকুমাতে ইলাহিয়া বা ইসলামী রাষ্ট্র।

রাসূলের রাজনীতি সম্পর্ক কোরআনের ঘোষণা হল -

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি রাসূল (স) কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে করে আর সব তন্ত্রের উপর দ্বীনকে বিজয়ী করেন। এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।'

ড. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ এর মতে—

A concions application of the socio-political tenats of Islam to the life of the nation and by and incorporation of those tents in the basic constitution of the country.

যখন ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের মৌলিক শাসন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদীর মতে, As nothing more then a combination of men working together as servants of Allah to carryout his will and purpose.

রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা
Western Concepts of State

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজের বৃহদায়তন সংগঠনটির নাম রাষ্ট্র। মানুষ কতগুলো নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক। এ সমস্ত নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করে সমাজ জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সৎপথে পরিচালিত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র হল সমাজ জীবনের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। আর এটা মানব সমাজের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনও বটে। ইসলামী নীতি ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র সুষ্ঠু ও কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা। কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলের ধারণা নিম্নরূপ :

রাষ্ট্র মানুষের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে ঐকমত্যে পৌছতে সক্ষম হন নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকপাল **Aristotle** তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ "The Politics" -এ বলেন, "The state is, a union of families and villages having for its and a perfect and self sufficing life by which we mean is happy and honourable." (পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) বলেন, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে। (The state is a people organized for law within a definite territory.)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ব্লুন্টসলী** (Bluntschli) রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, "একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমষ্টিই হল রাষ্ট্র।" (The state is a political organized people of a definite territory)।

আবার অধ্যাপক লাস্কি (Prof H. J. Laski) রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেন, "রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক সমাজ যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভক্ত এবং যা এর এলাকাধীন সকল সংগঠনের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব করে।" (The state is a territorial society devided into government and subjects claiming with in its allotted physical area supremacy overall other institutions)।

অধ্যাপক বার্জেস (Prof. Burgess) -এর মতে, "রাষ্ট্র মানব জাতির এমন এক অংশ যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত।" (Particular portion of mankind viewed as an organised unit.)

ম্যাকাইভার (MacIver) মনে করেন, "রাষ্ট্র একটি সংঘ যা সরকারের ঘোষিত আইনানুযায়ী কাজ করে। সরকার আইন ঘোষণা ও আইন পালন করার শক্তির অধিকারী।

www.pathagar.com

এ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা বাহ্য ও সর্বজনীন অবস্থায় রাখে।"।

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক ড. গার্নার (Dr. Garner)। তিনি বলেন, "রাষ্ট্র হল বিপুল বা স্বল্পাধিক জনসমষ্টি, যারা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে। যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং যাদের একটি সুগঠিত সরকার রয়েছে যার প্রতি সংখ্যাধিক্য জনসাধারণ স্বভাবজাত আনুগত্য স্বীকার করে।" (The state is a community of persons, more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent (or nearly so) of external control and possessing an organized government to which is the great body of inhabitants render habitual obedience.)

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ও সংজ্ঞা
Meaning and Definitions of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে, যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীআতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্যকথায় বলা যায়—যে রাষ্ট্রে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট সকলেই দায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র হল 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রাজ্য'। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনীষী ও ফকীহমহল ইসলামী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলেই উল্লেখ করেছেন। এখানে 'দার' শব্দটি আধুনিক 'রাষ্ট্র' বা এর সমার্থক। ফকীহমহল দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হল এমন ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।"

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়েছে, "দারুল ইসলাম হল এমন দেশ, যেখানে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত।"

কোন কোন ফকীহর মতে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য অধিবাসীদের মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্রের শাসক মুসলিম হওয়া এবং আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকা তথা ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক শাসন সম্পাদন করাই 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ (রা) এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার জন্য অধিবাসীদের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের নেতার হাতে থাকে এবং তারা ইসলামী বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট।" এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, ইমাম শাফেঈর মতে অমুসলিম নাগরিকের ওপরও ইসলামী আইন জারি হবে। তার কথার তাৎপর্য এই যে, একটি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করার জন্য রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এরূপ রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, আল্লাহ সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক চেষ্টা যে রাষ্ট্রে হয় তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

ইবনে খালদুনের মতে, "ইসলামী শরীআতের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই হল ইসলামী রাষ্ট্র।"

ইবনে তাইমিয়া (রা) বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্র হল ধর্মভিত্তিক এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সকল আইন প্রয়োগ করা যায়।"

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শামসুল আলম বলেন, "আল কোরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।" আল্লামা মওদূদী (র) বলেন, "যে রাষ্ট্রের আইন, শাসন, বিচার বিভাগ তথা যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ইসলামী আদর্শ ও কোরআন-সুন্নায় প্রদর্শিত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।" ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, "যে ভূ-খণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং শাসক ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

মুফতি মুহাম্মদ শফি (র) বলেন, "কোরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত নীতিমালার আওতাধীন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।" আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, "যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে - যদি তা কোরআন, সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে তৈরি হয় তাহলে সে রাষ্ট্রকে বলা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।"

মূলত ইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অগ্রগতি ও মর্যাদার প্রসার ও ব্যাপ্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠনটির নাম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র (Islamic State)।

ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী
Formation of Islamic State

সকল রাষ্ট্রেরই একটি গঠন প্রণালী থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী হবে নিম্নরূপ :

আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান : ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে এমন একজন সক্ষম পুরুষকে যিনি যোগ্য, সৎ, খোদাভীরু ও খাঁটি ঈমানদার।

শাসনতন্ত্র : ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হবে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। এ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধি-বিধান প্রণীত ও পরিচালিত হবে কোরআনের আলোকে ও সুন্নাহের নির্দেশানুযায়ী। একক কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা কিংবা স্বার্থের প্রাধান্য থাকবে না।

www.pathagar.com

মজলিসে শূরা : রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতির দ্বারা মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে শরীআতের নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশ—"ওয়া আমরুহুম শূরা বায়নাহুম" (মুসলমানদের) সকল ব্যাপারই পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সুসম্পন্ন হয়। (শূরা-৩৮)

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Purposes of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সকল মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বিধানের একনিষ্ঠ অনুগামী হবে, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। এ বিষয় সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা, "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।" (হাজ্জ-৪১)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামী হুকুমাতের বুনিয়াদী লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকাজ তথা ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা এবং অসৎ কাজে তথা সকল অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হল, রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক ইবাদত আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। অগত্যা কেউ যদি তা পালন না করে তবে তার জন্য প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা। যাকাত প্রদান করার অর্থ আর্থিক ইবাদতের যত দিক রয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন ও কায়েমের সার্বিক ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। আয়াতে উল্লিখিত মা'রুফ এবং মুনকার শব্দ দু'টো ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয়া এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। অনুরূপভাবে সমস্ত পাপ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া এবং তা মূলোৎপাটিত করাও ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ এবং কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান
Elements of Islamic State

যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করার জন্য যেমন কতিপয় উপাদানের প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্যও কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল করিম যায়দান বলেন, রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার জন্য পাঁচটি বিষয় অনিবার্য :

www.pathagar.com

১. সুসংবদ্ধ জনসমাজ;
২. একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপনার অনুসরণ;
৩. একটি সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড;
৪. সার্বভৌম ক্ষমতা;
৫. ভাবগত স্বাতন্ত্র্য।

নবী করিম (স) মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে রাষ্ট্রের এ সব উপদান যথাযথভাবে বর্তমান ছিল। মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক বা জনসমাজ ছিল মুহাজির আনসার ও মদীনার অমুসলিম অধিবাসী ইহুদি ও খ্রিস্টান। তারা যে সামগ্রিক ব্যবস্থা মেনে চলতো তা ছিল ইসলামী শরীআতের আইন, বিধান। আর মদীনা ছিল ঐ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড। সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল একমাত্র আল্লাহর। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবী করিম (স) জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। নবী করিম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যেসব চুক্তি সম্পন্ন করতেন তা পালন ও রক্ষা করে চলা জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ছিল।

জনসমাজ (People) : অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও একটি জনসমাজ থাকা অপরিহার্য। জনসমাজ না থাকলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। তাছাড়া জনসমাজ হতে হবে সুসংবদ্ধ। কোন বিশাল সমবেত জনসমাজ মিলে রাষ্ট্র হয় না। যেমন- হজ্বের সমবেত জনতা মিলে একটি রাষ্ট্র হয় না। অনুরূপভাবে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে কোন জনসমাজ নেই; তাই সেখানে রাষ্ট্রও নেই, অথচ সেখানে ভূ-খণ্ড আছে। একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশকে অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ এবং আদর্শের অনুসারী ও আস্থাশীল হতে হবে। অমুসলিম জনগণও ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে এর নাগরিক হতে পারে।

ভূ-খণ্ড (Territory) : সংঘবদ্ধ জনসমাজই রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন একটি ভূ-খণ্ড। তবে ভূ-খণ্ড নির্দিষ্ট হতে হবে। যে কোন স্থানে যে কোন রাষ্ট্র হতে পারে না। আবার ভূ-খণ্ড স্থায়ী হতে হবে। ভূ-খণ্ড বলতে স্থলভাগকে বুঝায়। ভূ-খণ্ড স্থলভাগ হলেও স্থলভাগ সংলগ্ন নির্দিষ্ট সামুদ্রিক অঞ্চল ও আকাশ সীমা ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের প্রয়োজন। ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। ক্ষুদ্রও হতে পারে আবার বিশাল বিস্তৃতও হতে পারে, তবে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে হবে।

সরকার (Government) : রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকারের মাধ্যমেই দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। আবার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দরকার। আর সে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকার। সরকারই রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। সরকার ব্যতীত আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের জন্য একটি সরকার থাকা অপরিহার্য। একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে শুধু মুসলমান সংখ্যাধিক্য হলেই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। সরকার মুসলমানদের দ্বারাই নির্বাচিত ও গঠিত হতে হবে। রাষ্ট্রের সরকার গঠিত হবে ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু লোকদের সমন্বয়ে। যাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সরকার হবে মুসলমানদের জন্য "উলিল আমর (নির্দেশ দাতা)" আর জনগণকে এ প্রকার সরকারের আনুগত্য করা ফরজ। এটি একটি অপরিহার্য ইবাদতও বটে।

www.pathagar.com

ইসলামী সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করা কঠিন পাপ এবং এজন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে জনগণকে বোঝায়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার বলতে বুঝায় আল্লাহর বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী একটি সংগঠন এবং আল্লাহর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের প্রতীক।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) : সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। অনৈসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোত্র, শ্রেণী অথবা বিশেষ জনগোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র তার অধীন জনগোষ্ঠী ও সংগঠনগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের কারণে একটি রাষ্ট্র অন্য সকল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। অতএব সার্বভৌমত্ব হচ্ছে অহস্তান্তরযোগ্য চরম ক্ষমতা। ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের উক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে। এ মর্মে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "জেনে রাখ, তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নির্দেশ অর্থাৎ তাঁরই সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে।" (আ'রাফ-৫৪)

ইসলামী রাজনীতিতে সার্বভৌম (Sovereignty) একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা আছে সবই তাঁর অনুগত।" (আল ইমরান - ৮৩)

"শাসন ক্ষমতা ও আইন রচনা এবং প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। কোন ব্যক্তি মানুষ, পার্লামেন্ট বা কোন রাজশক্তিও এই দিক দিয়ে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর এই সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এই ব্যাপারে কেউই তাঁর শরীক নয়।" (ফুরকান-২)

কারণ, কোরআনের ঘোষণা, "প্রভুত্ব ও আইন রচনার চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহর।" (ইউসুফ-৪০)

"আল্লাহর এই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকার নিরংকুশ, অন্য কেউই তাঁর অংশীদার হতে পারে না। কাউকে তিনি একাজে তাঁর শরীক করেন না।" (কাহাফ-২৬)

"তিনি নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীন ও নিরংকুশ। যা হচ্ছে তা করার অধিকার তারই। এই স্বাধীনতাকে কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। তাঁর সমীপে সবাই জবাবদিহি করতে বাধ্য।" (বুরূজ-১৫)

তিনি মহান। মহানত্ব তাঁর একটি বিশেষ গুণ। এই গুণ বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সর্বাত্মক ও অবিভাজ্য। এটাই হচ্ছে তাওহীদের মূল কথা। একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের জন্য এক একজনকে সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা শিরক। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশের জন্য কোরআনের ঘোষনা, "মহান পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতে সবকিছুরই সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত।" (ইয়াসিন-৮৩)

এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মেলে।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'মালাকূত'-এর পরিবর্তে 'সুলতান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "প্রবল পরাক্রম সহকারে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।" অন্যত্র লিখেছেন, "জনগণের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের বিধান প্রয়োগ করার প্রশাসনিক ক্ষমতা।"

আল্লামা আলুসীর মতে, সর্বাধিক ক্ষমতাশীল সত্তাই সার্বভৌম। আর 'মালাকূত' অর্থ স্বীয় প্রবল পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত শক্তি।

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আল্লাহার সার্বভৌমত্ব নবীগণের মাধ্যমে প্রয়োগ হত। বর্তমানে কোন নবী আর আসবেন না। এ জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হচ্ছেন খলিফাগণ অর্থাৎ খিলাফতের অধিকারী শাসকবর্গ। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকবে। কিন্তু এ বিভাগগুলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহনকারী পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ তথা শরীআতের বাইরে কোন কাজ করতে পারবে না।

তাই খলিফা ও শাসকবর্গ যদি আল্লাহর শরীআতের বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করে বা তাঁর বিপরীত কোন অর্ডিন্যান্স জারী করে অথবা জাতির প্রতিনিধিরা তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে এ উভয় অবস্থায়ই সে কাজটি শরীআতের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে এবং সার্বভৌমত্বের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জাতির প্রতিনিধিদের বা শাসকদের সার্বভৌমত্ব হল বাস্তবায়নের সার্বভৌমত্ব (Executing sovereignty), তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার মধ্যে। কোন নতুন শরীআত বা শরীআত বিরোধী আইন রচনা করে তা জারী করার তার কোন অধিকার নেই। এটাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
Features of Islamic State

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় পবিত্র মদীনা নগরীতে ইসলামের প্রবর্তক ও প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (স) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। উক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল কোরআনের নির্দেশিত পন্থায়, যার সংবিধান ছিল মদনীনার সনদ (The Charter of Modina)। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাঠামো এবং উক্ত রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হযরত মুহাম্মদ (স) ঘোষিত এবং মদীনার সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের লোকদের স্বাক্ষরিত সর্বজনীন দলিল মদীনার সনদ বিজ্ঞতার সাথে বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রস্ফুটিত হয় তা নিম্নরূপ।

কোরআন সুন্নাহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র : একটি জাতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মহান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে। তার অধীনে কর্তৃত্ব নেতৃত্বের পরিবর্তে তাঁর প্রতিনিধি তথা খলিফার ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং সে সব বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলি কার্যকর করবে যা আল-কোরআন এবং রাসূলের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষ থেকে বুঝে শুনে এহেন ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্য : ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যই

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট। এই রাষ্ট্র ধর্ম যাজকদের কোন বিশেষ শ্রেণীকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার ধারক-বাহক মনে করে না। সমস্ত ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র দেশের মধ্যে বসবাসকারী সকল ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের ধারক-বাহক মনে করে। আর এদের হাতেই শরীআত মোতাবেক রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োগের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে।

ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক : রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন এবং পরিচালনা ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এই নীতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্র একমত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ বলগাহীন নয়। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, জনগণের জীবন-যাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায় উপকরণ সব কিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে, এমন নয়। বরং আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের হাদিস নিজস্ব নিয়ম-নীতি; সীমারেখা, নৈতিক বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলি দ্বারা জনগণের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাষ্ট্র এমন এক সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, যার পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ কারোর নেই। সামাজিকভাবে গোটা জাতিও যদি এর পরিবর্তন সাধন করতে চায় বা করে ফেলে তাহলে মুসলিম জনগণ ঈমানের গন্ডী থেকে দূরে সরে যাবে।

আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র : ইসলামী রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক। তাই এ রাষ্ট্র পরিচালনা স্বভাবতই তাদের কাজ হতে পারে যারা তার মৌলিক দর্শন এবং বিধি-বিধান স্বীকার করে। কিন্তু তা স্বীকার করে না এমন ব্যক্তি সে রাষ্ট্রসীমায় আইনের অনুগত হয়ে বাস করলেও রাষ্ট্র পরিচালনা করার দায়িত্ব পাবে না। তাদেরকে সেসব নাগরিকের অধিকার দেয়া হবে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র : ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানবজাতির যে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে সে মূলনীতি অকপটে স্বীকার করতে পারে। কোন প্রকারভেদ–বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে সে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের যেখানেই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে নিশ্চিতভাবে তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র। এ ধরনের একটি নিরংকুশ আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের বিশ্বরাষ্ট্রে (World State) রূপান্তরিত হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যদি এ ধরনের অনেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে। কোন জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবর্তে সে সব রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা সম্ভব। কোন এক সময় তারা একমত হয়ে বিশ্ব ফেডারেশন (World Federation) প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ইহসান ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র : ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাহভীতি পরহেজগারির সাথে তা পরিচালনা করা সে রাষ্ট্রের মৌল প্রাণশক্তি। নৈতিক, চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বই ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি ও একক মানদণ্ড। সে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী এবং শূরা বা পরামর্শ সভা এর নির্বাচনের ব্যাপারেও শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার সাথে নৈতিক পবিত্রতাও সর্বাধিক লক্ষণীয় ও

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ রাষ্ট্রের সকল অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালিত হবে আমানত, সততা, বিশ্বস্ততা ও পক্ষপাতমুক্ত সুবিচারের ভিত্তিতে। আর তা বৈধ নীতি সম্পূর্ণ সততা, ন্যায়-নিষ্ঠার উপর চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাবান হয়ে, শান্তিপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং সদাচরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ : ইসলামী রাষ্ট্র নিছক পুলিশের দায়িত্ব পা‍ করার জন্য নয়। শুধু আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা তার কাজ ন‍ বরং তা হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ সাধনের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা : ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, রাষ্ট্র লাগামহীন এবং সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে নিরীহ দাসে পরিণত করতে পারে না। আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সামাজিক স্বার্থের শত্রু হতে পারে না। এতে ব্যক্তিকে একদিকে মৌলিক অধিকার দান করা হয়েছে; অন্যদিকে রাষ্ট্রকে উর্ধ্বতন আইন এবং শূরার অনুগত করে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে নৈতিক নীতিমালার বন্ধনে শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তার ওপর এ কর্তব্যও আরোপ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করলে মনে প্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্যের শৃঙ্খলায় ফাটল ধরানো থেকে বিরত থাকতে হবে। তার সংরক্ষণে জানমাল দিয়ে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ইসলামী নীতি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। অপরদিকে অন্য কোন নিয়ম বা আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রকে সাধারণ রাষ্ট্র বা বিশেষ আদর্শের রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক আদর্শগত ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি
Principles of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্মভিত্তিক আদর্শিক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর, যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এ নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান হল কোরআন-সুন্নাহ নির্ভর। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তা কার্যকর করেন মাত্র। ইসলামী রাষ্ট্রে যে পদ চায় সে উক্ত পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সরাসরি মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে কিংবা জনগণের রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হন। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা অবশ্যই মুসলমান হবেন। মুসলমানদের মধ্যে হতে আস্থাভাজন, সৎ, যোগ্য ও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা কোরআন, হাদিস, ইজমা,

www.pathagar.com

কিয়াসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। এখানে নিজস্ব মতামতের কোন অবকাশ নেই। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে এককভাবে মানুষের কোন আইন রচনা করার অধিকার নেই। তবে যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দিয়েছে সেক্ষেত্রে পরামর্শক্রমে আইন রচনা করতে পারবেন। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি সব রকম বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় বিধায় সকলেই ন্যায়বিচারের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি সুনির্দিষ্ট বিধানের অধীনে পরিচালিত হয়। এখানে কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, এর অর্থব্যবস্থা সুদমুক্ত। তাছাড়া পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাকাত, ওশর, খারাজ, জিজিয়া প্রভৃতি বিধান চালু করা হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। জনগণের কল্যাণ ও সেবাদানই এখানে মুখ্য বিষয়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণ নিজেদেরকে জনগণের সেবক হিসেবেই মনে করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নীতি ও নৈতিকতার সুস্পষ্ট বিধানের অনুসরণ করতে বাধ্য। এখানে নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় তরফ থেকেই।

এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরংকুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহার খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়। সরকার নিজস্বভাবে কোন আইন রচনার অধিকারী নন। এ মর্মে আল্লাহার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা -

"জেনে রেখো, তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে।" (আরাফ-৫৪)। "হুকুম দেওয়ার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট।" (ইউসুফ-৪০)

এই রাষ্ট্র একটি খোদায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার উৎস ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে গণ্য করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি ৪টি। কোরআন, সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানই চালু থাকবে, কোন মানুষের নয়। সর্বোত্তম, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধানও সর্বোত্তম, সুন্দর নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ, মানুষের উপযোগী ও কল্যাণধর্মী। এতে পরিবর্তন বা এর পরিপন্থী বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

এ রাষ্ট্র দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে সাথে সবরকম জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চরিত্র সংশোধন এক কথায় সার্বিক সমস্যার সমাধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। অক্ষম, বেকার, বিকলাঙ্গ, ঋণগ্রস্থ এবং যারা সহায়-সম্বলহীন তাদের ভরণ-পোষণের গুরুদায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের।

মজলিসে শূরা

ইসলামী রাষ্ট্রে একটি মজলিসে শূরা (আইনসভা) থাকবে যার প্রধান কাজ হবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন

www.pathagar.com

করা। পরিবর্তনশীল সমাজে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে যা কোরআন বা সুন্নাহ দ্বারা Cover হয় না। সেক্ষেত্রে ইসলামীর রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা সব ব্যপারে আইন প্রণয়ন করতে পারে 'In consonance with principles and guideline laid down in the Holy Quran and Sunna' যা মানুষের নতুন নতুন চাহিদা বা প্রয়োজন মিটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার ক্ষমতা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সীমিত যেমনটি আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও। যেমন- আমেরিকার Congress সেখানকার সংবিধান দ্বারা আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও এমন কোন আইন পাশ করতে পারবে না যা সংবিধানের পরিপন্থি অথবা সংবিধান কর্তৃক প্রকৃত ক্ষমতার বহির্ভূত। ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরা কর্তৃক কোন আইন পাশ করলে তা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ইসলামী আইনে পারদর্শী একটি Highest Judicial Council থাকবে যেমন- ইসলামী রাষ্ট্র ইরানে আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Supreme Court কে দেয়া ক্ষমতা। সংবিধানে প্রদত্ত আছে যে হাইকোর্ট Congress কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধান পরিপন্থি কিনা তা পরীক্ষা করে মতামত দিবে যা হবে চূড়ান্ত।

মজলিশে শূরার গঠন : মজলিসে শূরা গঠিত হবে জনগণের ভোটের মাধ্যমে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বা আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবেন তারাই যাদেরকে জনগণ তাদের চরিত্র, সততা, যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ন ইত্যাদি বিচার করে নির্বাচিত করবে কিন্তু তারা নিজেরা বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চত্যের নিয়ম অনুযায়ী জনগণের নিকট কোন ভোট/সমর্থন কামনা করবে না।

মজলিশে শূরার সদস্যদের গুণাবলি ও দায়িত্ব : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনসভা তথা মজলিসে শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। মজলিসে শূরা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র বা গণতন্ত্র কল্পনাই করা যায় না। কাজেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মজলিসে শূরা এমন একটি সংস্থার নাম, যে সংস্থায় সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একে একটি একাত্মক পার্লামেন্ট (Unitary parliament) বলা হয়। মুসলিম সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ, ইসলামী বিধানে পারদর্শী ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুসংবদ্ধ একাত্মক পার্লামেন্টের সদস্যপদে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এর সদস্যগণের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী এবং মজলিসে শূরার স্বাধীন ও সত্য প্রকাশের অধিকারী। এ ধরনের মজলিসে শূরায় কোন দলাদলি Grouping এর অবকাশ নেই। মেজরিটি আর মাইনেরিটি শূরায় স্বাধীন ও সত্য প্রকাশের কিংবা মজুর-কৃষক ও ধনী-গরিবের কোন ভেদাভেদের অবকাশ এতে নেই। মজলিসে শূরার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সম্মুখে রেখে সকল ব্যাপারে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেন। সত্য মতের সমর্থন এবং ভুল ও অন্যায় মতের প্রতিরোধ ও বিরোধিতা করা হবে প্রত্যেক সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

শূরা সদস্যের যোগ্যতা ও গুণাবলী : কোরআনের আলোকে মজলিসে শূরার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

www.pathagar.com

জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত, আন্তরিক, নিষ্ঠাবান ও কল্যাণকামী হতে হবে। সকল কাজের জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং আমানতদার ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথা তাদের জাতীয় আদর্শ ব্যাহত হবে। ক্ষুণ্ন হবে সার্বিক কল্যাণ, সৃষ্টি হবে ব্যাপক বিপর্যয় এবং সবকিছু ধ্বংসে পতিত হবে।

কোরআনের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক বা কর্মচারীকেও কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্ত হতে হয়। কোরআনের সূরা কাসাস এর মধ্যে শক্তিশালী যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মজলিসে শূরার সদস্যকেও যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়া জরুরি।

মজলিসে শূরার কাজ হচ্ছে জাতীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের সকল বিষয়ে কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা। আর ইসলামী আইনের একমাত্র উৎস যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহ, তাই শূরায় সদস্যকে কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক গবেষণায় যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। রাসূল (স) এর মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছিলেন সাহাবা কিরাম। তারা সকলেই উপরিউক্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

রাসূল (স) কোরআন ও সুন্নাহ-এর শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন বিপুলসংখ্যক লোক তৈরি করেছিলেন। রাসূল (স) এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায়ও এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক লোক অবশ্যই ছিল যারা কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক গভীর জ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয় আইন উদঘাটন করতে সক্ষম। অন্যথায় নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিত্যনতুন সংঘটিত ঘটনা এ বিষয়াবলির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াত সম্মত আইন বিধিবদ্ধ করা মজলিসে শূরার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিশে শূরার ভূমিকা : ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও এর প্রকৃতি পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে ইসলামী গণতন্ত্র সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী গণতন্ত্র এমন যেখানে কোন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না, যেখানে কেউ পদপার্থী হতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে–"যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসাতে হবে।"

ইসলামী গণতন্ত্রের পরিভাষায় সংসদকে বলা হয় মজলিসে শূরা। আর মজলিসে শূরা দু'ভাগে বিভক্ত।

১. মজলিসে আম : এটা সাধারণ পরিষদ বা নিম্ন পরিষদ। এতে অধিকাংশ জনগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. মজলিসে খাস : এটা উচ্চ পরিষদ। এখানে রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনরা থাকেন।

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

পরামর্শ দান : কোরআন ও হাদিসের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শদানই হল মজলিসে শূরার প্রধান কাজ। কারণ উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে 'মজলিশে শূরা'র কাছে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ জাতি প্রত্যাশা করে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনা

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন এবং পরামর্শ প্রদান করাও মজলিসে শূরার কর্তব্য। শূরা একটি নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা - যার উপর রাষ্ট্রপরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব বর্তায়।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ : রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত গুরুদায়িত্ব মজলিশে শূরাকে পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে শূরার প্রতিটি সদস্যকে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে হয়।

আইন প্রণয়ন : ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার উপর দায়িত্ব হচ্ছে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে ইসলামী আইন তৈরি করা। এ জন্য শূরা সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যকেই কোরআন সুন্নায় জ্ঞানী ও পারদর্শী হতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে—"তোমরা নিজেরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের নিকট থেকে জেনে নাও" (নাহল-৪৩)। তাই ইসলামী আইনের উৎস কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের উপর শূরার সদস্যদের ইজতিহাদী (গবেষণার) যোগ্যতা থাকতে হবে। মহানবী (স)-এ সম্পর্কে বলেন, "তোমরা কোরআন সুন্নায় পারদর্শী মুমিন লোকদের একত্র কর। অতঃপর তাদের নিয়ে শূরা গঠন কর। তবে তাদের কোন একজনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিবে না" (সুনানে আবু দাউদ)। এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক গণতন্ত্রে সংসদের মত ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। বরং কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বর্ণিত আইনকে বের করা ও প্রয়োগ করাই মজলিসে শূরার কর্তব্য।

যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ইসলামী গণতন্ত্রে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ, বদলি, যুদ্ধাভিযান পরিচালনা, খলিফা ও সরকারি কর্মকর্তা - কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ, কর-আদায়, শাসন কার্য পরিচালনা ইত্যাকার যাবতীয় কর্মকাণ্ড মজলিসে শূরার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে।

অনুমোদন : রাষ্ট্রপ্রধানের বিভিন্ন কার্যাবলি ও মতামত মজলিসে শূরার অনুমোদন নিয়ে করতে হয়। যেমন - আধুনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কার্য আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ : ইসলামী গণতন্ত্রে সামষ্টিক ও জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে ও কর্মসূচি গ্রহণে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে শূরার অনুমোদন ছাড়া কিছু করা যায় না।

গঠনতন্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যাদান : ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিশে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান ও প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে। অর্থাৎ নতুন আইনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে উপযোগিতা ও প্রয়োগযোগ্যতা বিচার বিশ্লেষণ করা, প্রণীত আইনের অংশবিশেষ পরিবর্তন, সংশোধন পরিমার্জন করা শূরার দায়িত্ব।

এছাড়া বায়তুল মালসহ যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা, মজলিশে শূরার

www.pathagar.com

অধিবেশনের নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করা, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল সৎ কার্জে রাষ্ট্রপ্রধানকে সাহায্য দান এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ প্রতিরোধে পরামর্শ ও সাহায্য করা শূরার সদস্যদের পবিত্র দায়িত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা
Islamic Political System and Modern Political System

ইসলাম একটি চিরন্তন শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার যৌক্তিক সমাধান। ইসলাম মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক পরিচালনায় যে সুন্দরতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তা অনন্যসাধারণ ও সর্বজনীন। এ সকল পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। নিম্নে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হল।

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি : ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একটি অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে বহুবিধ রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি কোন মানুষের চিন্তা বা গবেষণার ফসল নয়। বরং তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দেয়া পদ্ধতি। আল্লাহ যেভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তাই বাস্তবায়ন করা হয়। ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ থাকে। যেমন- আল্লাহ বলেন, "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য" (আল-বাকারা-২০৮)।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যার সাথে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতির মিল ও বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হল।

একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম (Dictatorship and Islam) : আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একনায়কতন্ত্র অন্যতম। এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়কের হাতেই সর্বময় ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকে। জনগণের অধিকার ও বক্তব্য সেখানে অবহেলিত। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একনায়কতন্ত্র নয়। সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে পরামর্শ সভা গঠিত হয়, তার সাথে পরামর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "হে নবী! আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করুন" (আল-ইমরান-১৬৯)। আর এ পদ্ধতিতেই রাজনীতি গণমুখী হবে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করবে।

রাজতন্ত্র ও ইসলাম (Monarchy and Islam) : বর্তমান বিশ্বের বহুদেশে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাষ্ট্রনায়কের পর তার পরবর্তী রাষ্ট্রনায়ক উক্ত পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই

www.pathagar.com

মনোনীত হয়, যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়াই। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রনায়ক না করে রাজপরিবারের বা রাজবংশের কাউকেই রাষ্ট্রনায়ক করা হয়। আর সে রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাজনীতি পরিচালিত হয়। কিন্তু ইসলাম এ পদ্ধতি সমর্থন করে না। যোগ্যতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি উপযুক্ত, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হবে। আর সকলকেই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। সে যদি অতি নগণ্য পরিবারেরও হয়, তবুও যোগ্যতার ভিত্তিতে সে-ই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (স) হাদিসে ঘোষণা করেন–"যদি নাক কাটা হাবশী তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবুও তোমরা কোন বংশ মর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।" তাই দেখা যায়, রাজতন্ত্রের চেয়ে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি অনেক উন্নত এবং কল্যাণমূলক।

ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ইসলাম (Secularism and Islam) : বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করছে। সংখ্যালঘুরা আইনের অধিকারে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাতে বাধা প্রদান করে। ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যেমন- আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের (ভারত) দিকে তাকালেই তা সহজে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইসলামের যে রাজনৈতিক পদ্ধতি রয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের জানমাল ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত স্বরূপ। ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা হরন করার কোন সুযোগ দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকলেরই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সমান। ধর্মনিরপেক্ষতার এক অর্থ ধর্মহীনতা যার স্থান ইসলামে নেই।

সমাজতন্ত্র ও ইসলাম (Socialism and Islam) : সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষের আত্মার বন্দীশালা। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের স্বাধীন সত্তা থাকে না। জনসাধারণকে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। আর কর্তাব্যক্তিরা তাদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে। সেখানে থাকে না কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিমালিকনার সুযোগ। থাকে না ন্যায্য কথা বলার কোন অধিকার। ব্যক্তি মালিকানাা ও পারিবারিক পদ্ধতিকে বাজেয়াপ্ত করে সবকিছুকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং কর্তাব্যক্তিরা তা ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের কেবল শ্রমের অধিকার রয়েছে, স্বাধীনভাবে তা ভোগ করার অধিকার নেই। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবারের স্বীকৃতি দিয়ে সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার সুযোগ ইসলামে রয়েছে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "সমাজতন্ত্র সে তো মানবাত্মার বন্দীশালা।"

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বিশ্ব মানবতা বহু মতবাদ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু অমোঘ সত্য এই যে, মানব রচিত কোন মতবাদই মানবের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে নি। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যা বিশ্ব মানবের সার্বিক মুক্তির গ্যারান্টি দিয়েছে। যুগে যুগে পৃথিবী বিভিন্ন জাতির বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনে নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন যারা সকলেই ইসলামের প্রচার-প্রসারে ঐশী নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলেই মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। তাই পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা

www.pathagar.com

মানবরচিত তা কখনোই মানুষের মুক্তি দিতে পারে না। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে মানব মুক্তির মূলমন্ত্রস্বরূপ। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামিক রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
Islamic State and Western Democratic State

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি আর পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে উভয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। বস্তুত মানুষের চিন্তা-চেতনা প্রসূত যে সকল রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয়। বিশ্বব্যাপী এ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতাও লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র যার মৌল সূত্র ও অনুকরণীয় আদর্শ মদীনায় রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - যা ছিল বিশ্বমানবের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর রাষ্ট্র। নিম্নের আলোচনা থেকে বিষয় দুটি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সংজ্ঞাগত পার্থক্য :

ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রকে বুঝায় যেখানে মানব চিন্তাপ্রসূত মতবাদের কোন সুযোগ থাকে না। আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্র মানুষের চিন্তা চেতনা প্রসূত ব্যবস্থা - যেখানে যোগ্যতার কোনরূপ মাপকাঠি ছাড়াই অনেকটা গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রের শাব্দিক বিশ্লেষণে জনগণের শাসন উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্ঠিমেয় অভিজাত শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্র উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্রভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, সবার স্বার্থ নিয়ে এ রাষ্ট্র কাজ করে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের আধুনিক সরকার নির্দিষ্ট দেশ, জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্রভিত্তিক সরকার। এ সরকার নির্দিষ্ট একটি জাতি, সম্প্রদায় বা গোত্রের স্বার্থ নিয়ে ভাবে।

ক্ষমতার উৎসগত পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতার উৎস কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়। এখানে সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। ইসলামী সরকার আল্লাহর আইনকে কার্যকর করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ। যেমন–সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রমিক–কৃষকদের সংগঠনকে ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়।

নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য প্রার্থী হতে পারে না। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত হন অথবা জনপ্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হবার জন্য যে কোন যোগ্য নাগরিক নিজের যোগ্যতা দাবি করে উক্ত পদের প্রার্থী হতে পারেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য : ইসলামী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও মজলিসে শূরার সদস্যদবৃন্দকে মুসলিম, সৎ, খোদাভীরু, শারীরিক ও জ্ঞানগতভাবে যোগ্য হতে হয়।

www.pathagar.com

অন্যথায় জনগণ তাকে প্রত্যাখান করবে। অপরদিকে আধুনিক সরকারপ্রধান ও আইনসভার সদস্যদের জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ নেই, জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে তিনিই এ পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। জ্ঞান বা শারীরিক যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই।

কাঠামোগত পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের দেশরক্ষা, প্রশাসন ও অন্যান্য কঠিন দায়িত্বে নিয়োগ না করার বিধান আছে। দেশ ও ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষগণ অসমর্থ হলে মহিলাদের কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের আধুনিক সরকারের সকল পর্যায়ে মহিলাদের নিয়োগ দানে কোন বাছ-বিচার নেই। সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে যোগ্য মনে করা হয়। এমনকি ইউরোপ ও এশিয়ার কতিপয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ এবং শীর্ষপদে মহিলারা সমাসীন আছেন।

ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে : ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর আধুনিক রাষ্ট্রে, ধর্ম ও রাজনীতি এক নয়। রাজনীতি থেকে তারা ধর্মকে পৃথক করে রাখে। যেমন- আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রবক্তা মেকিয়াভেলি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে ধর্মকে রাজনীতির সংশ্রব থেকে পৃথক করেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার দেশের অক্ষম, দরিদ্র, অনাথ, বৃদ্ধ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব পালনে বাধ্য। ব্যক্তির পুঁজি বিনিয়োগের স্বাধীনতা থাকলেও এখানে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার সুযোগ নেই। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজির শোষণ বিদ্যমান। এরা খোলাবাজার অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভাত-কাপড়ের কথিত নিশ্চয়তা প্রদান করে কিন্তু স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় কোরআন ও হাদিসের আইন অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার ফয়সালা করা হয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় মানুষের নিজস্ব চিন্তা চেতনা প্রসূত রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা অপরাধের বিচার করা হয়।

জবাবদিহিতা : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে সৎ, ধর্মভীরু ও পরকালে বিশ্বাসী সর্বোপরি আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হয়। কারণ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। আর এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে উভয় জগতে সমানভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কিন্তু আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কেবল জনগণের কাজে জবাবদিহি থাকলেই যথেষ্ট।

সংবিধান পরিবর্তনের দিক থেকে : ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। এমন কি মজলিসে শূরার সকল সদস্য একত্র হয়েও সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা এই সংবিধানের রচয়িতা মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল (স)। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতিতে এমনটি নেই। সেখানে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য ইচ্ছে করলেই সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে।

সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে : ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। এখানে জনগণের ক্ষমতা সীমিত। সরকার প্রধানকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশ

www.pathagar.com

পরিচালনা করতে হয়। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং জনগণই ক্ষমতার একমাত্র উৎস।

আইন সভার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতিতে আইন সভা বা মজলিসে শূরা নতুন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। বরং শরীয়াতের সাথে সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ উপযোগিতা নির্ণয় করতে পারে মাত্র। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতের ভিত্তিতে শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণীত হতে পারে না। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় আইন সভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সরকার প্রধানের ক্ষমতা : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান শরীয়া বিরোধী যে কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন। তবে শরীয়তসম্মত জনকল্যাণমূলক কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান নিজস্ব বিবেচনায় যে কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ কিংবা অনুমোদন করতে পারেন।

আইনের উৎস : ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস হল ইসলামী শরীয়া বা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এখানে মানব রচিত মতবাদের কোন স্থান নেই। সংসদে শূরার সদস্যগণ শরীয়ার ভিত্তিতেই আইন প্রণয়ন করে থাকেন। আর আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সেজন্য তাদের রচিত আইন ও আইনের উৎস হল প্রচলিত প্রথা, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ, আইন বিষয়ক গ্রন্থ, জনমত, আইন সভা ইত্যাদি।

শেষত, বলা যায় ইসলামী রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র যেখানে কোরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধানের আলোকে শুধু মানুষ নয় সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। সুখ-সমৃদ্ধি আর সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিকল্প নেই। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একই সাথে ইহজাগতিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি নিহিত। আর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে কেবল জাগতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হয়। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলামী রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর কল্যাণকামী।

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
Rights and Duties of Citizens in Islamic State

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মহানবী (স) শুধু একটি ধর্মই প্রবর্তন করেন নি। বরং তিনি ধর্মের সাথে একটি রাষ্ট্রেরও গোড়াপত্তন করেছেন। ইসলামই সর্বপ্রথম নাগরিকদেরকে জীবন সম্পত্তি ও ইজ্জত আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের বেঁচে থাকার জন্য যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে; অনুরূপভাবে রয়েছে আত্মসম্মান ও মর্যাদার অধিকার, সম্পদের অধিকার, নেতৃত্বদানের অধিকার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। রাসূল (স) তাঁর হাদিসে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের পরস্পরের জীবন-সম্পত্তি ও মান-সম্ভ্রম তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ তথা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত এমনি পূতঃপবিত্র, যেমন পবিত্র অদ্যকার এই

www.pathagar.com

দিন, এই মাস এবং এই শহর। যে আদর্শ ও মূলনীতির উপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাকে কে মান্য করে আর কে মান্য করে না সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভক্ত করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় উক্ত দু'ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম বলা হয়ে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের গুণাবলী :

খোদাভীরু হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে খোদাভীরু হতে হবে, যেহেতু ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহ্ বলেন : "নিশ্চই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে বেশী সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে বেশী খোদাভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ।" (হুজরাত-১৩)

চরিত্রবান হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে সৎচরিত্রবান হতে হবে। কারণ সৎচরিত্রই কোন জাতির উন্নতির মূল সোপান। রাসূল (স) বলেন : "উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যতবেশী উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারবে, সরকার ততই সফলতা অর্জন করবে।

রাষ্ট্রের আনুগত্য করা : সরকারের আনুগত্য স্বীকার ও বিভিন্ন কর্ম এবং নীতিকে মান্য করার মনোভাব ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে উচ্চ দেখার মানসিকতা, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম নাগরিক জীবনের মহৎগুণ।

সুশিক্ষিত হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে সুশিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (স) বলেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।"

বিবেকবান, কর্তব্যবোধ সম্পন্ন হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে বিবেকবান এবং কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দায়িত্ববোধ যা তাকে সমাজ-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

নাগরিকের শ্রেণী বিভাগ : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে দ্বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ক. মুসলিম নাগরিক ও খ. অমুসলিম নাগরিক। অমুসলিম নাগরিক তিনভাগে বিভক্ত। আনুগত্যকারী অমুসলিম নাগরিক, ২. চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক, ৩. যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক।

মুসলিম নাগরিক : যে সব মুসলিম জন্মগতভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে, অথবা অমুসলিম দেশ হতে হিজরত করে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয় তাদেরকে মুসলিম নাগরিক বলে। মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে –

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জীবন সম্পত্তি দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে যারা (শুধু) ঈমান এনেছে কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে হিজতর করে ইসলামিক রাষ্ট্রে চলে আসেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়-যতক্ষণ না তারা হিজরত করে।" (আনফাল-৭২)

www.pathagar.com

আনুগত্যকারী অমুসলিম নাগরিক : ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যকারী অমুসলিম নাগরিক বলতে সে সব অমুসলিমদেরকে বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে বসবাস করে তার আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অঙ্গীকার করে, চাই তারা ইসলামী রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে থাকুক অথবা বাইরের কোন অনৈসলামিক রাষ্ট্র (দারুল কুফর) থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার আবেদন করে থাকুক। এই দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ইসলাম এই শ্রেণীর নাগরিকদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জীবন-সম্পত্তি ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে। তাদের উপর রাষ্ট্র কেবল গণআইন জারি করতে পারে। এই গণআইনের দৃষ্টিতে তাদেরও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্বপূর্ণ পদ ব্যতীত তারা মুসলমানদের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনরূপ স্বতন্ত্র আচরণ করা হবে না। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যও পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনবিদগণ যে নীতিমালা ঠিক করেছেন তা হল, "আমাদের জন্য যে সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদের উপরও তাই রয়েছে।"

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক : যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী রাষ্ট্রে আনুগত্য করতে সম্মত হয় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে সন্ধিবদ্ধ হয়, তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। বর্তমানকালের সভ্যজাতিগুলো এরূপ রাজনৈতিক ধোকাবাজিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে,শত্রু পক্ষকে স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারণ করে। যেই তারা পুরোপুরি আয়ত্বে এসে যায় তখনই শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। কিন্তু ইসলাম এটাকে হারাম ও মহাপাপ হিসেবে গণ্য করে। কোন জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায় তখন তাতে চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম করা যাবে না, উভয়পক্ষের অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় যতই পরিবর্তন আসুক না কেন। রাসূল (স) বলেন,

"যদি তোমরা কোন জাতির সাথে সন্ধির ভিত্তিতে বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের বিনিময়ে তোমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত করের চেয়ে বিন্দু পরিমাণও বেশী নিও না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।" অপর হাদিসে আছে, রাসূল (স) বলেন,

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর জুলুম করবে কিংবা প্রায় তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে, অথবা তার কাছ থেকে কোন কিছু তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির পক্ষে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হব।"

মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের বাঁচার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন, বহিঃশক্তি অথবা স্বয়ং রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "(শরীআ নির্ধারিত) আইনানুগ কারণ ছাড়া যাদেরকে হত্যা করা অবৈধ তাদেরকে হত্যা করো না।" (বনী-ইসরাইল–৩৩)

মহানবী (স) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের কাছে পুত-পবিত্র" (বুখারী)। মুসলিম মনীষীদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কারণে কারো মৃত্যু হলে তাকে হত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

বস্ত্রের অধিকার : বস্ত্র দ্বারা মানুষ তার আব্রু রক্ষা করে। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এ মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বস্ত্র, পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে দেয়। এ উপকরণটি ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

বাসস্থানের অধিকার : বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের নিরাপদে আপন আপন বাসস্থানে বসবাস করার অধিকার সংরক্ষিত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার রাখে, রাষ্ট্র-এর ব্যবস্থা করবে।

শিক্ষার অধিকার : ইসলাম বিদ্যাশিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছে। শিক্ষা ছাড়া যেমন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া যায় না অনুরূপভাবে কোন উন্নতিও সাধন করা যায় না। ইসলামের দর্শনকে বুঝতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র অশিক্ষিত ও অচেতন নাগরিকের প্রতি আস্থা রাখে না। মুসলমানদেরকে প্রার্থিতা ছাড়াই নেতা নির্বাচন করতে হয়। শিক্ষা ব্যতীত একজন নাগরিকের পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুলভ করবে যাতে ব্যাপক শিক্ষিত নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শকে অনুধাবন করতে পারে। আর-এর ফলে দেশ ও জাতির ভিত মজবুত হবে এবং জ্ঞান গরিমায় মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর ঘোষণামত শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার : ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নয়। সেই সঙ্গে মান মর্যাদা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মুসলিম মানেই সম্মানিত, কেননা পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "মান-ইজ্জত সবই আল্লাহ, রাসূল এবং সকল মুমিনদের জন্য।" অতএব কেউ অপমানিত হোক ইসলামী রাষ্ট্র তা কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা– "একদল যেন অপরদলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করে।"

কোরআনে আরও এসেছে, "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না, একে অন্যকে বিদ্রুপ পদবী দিও না। একে অন্যের গীবত করো না।" (আল-হুজরাত–১১, ১২)

সম্পদ সঞ্চয় ও ভোগ করার অধিকার : মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক তার বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও সংরক্ষণ করার অধিকার রাখে। সম্পদ উপার্জন-ব্যয় ও আল্লাহর বিধান মেনে যে কোন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। নাগরিকের এ বৈধ সম্পদ ভোগ ও

www.pathagar.com

সঞ্চয় কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন, অথবা অন্য কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করলে অথবা হরণের চেষ্টা করলে তা রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তোমরা অবৈধভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না।" (বাক্বারা - ১৮৮)

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে তবে রাষ্ট্র বা অন্য কোন নাগরিকের কাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন স্বাধীনতা ইসলাম বৈধ মনে করে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি ব্যাপক বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, নাগরিকদের স্বাধীন ও অবাধ চলাফেরা, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা, সম্পদ সংরক্ষণ, অকারণে অত্যাচারী না হওয়ার অধিকার ভোগ করা। ইসলামী রাষ্ট্রেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় স্বীকৃত। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় কিনা সেদিকে বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে লক্ষ রাখতে হয়। কোনভাবে একজনের অপরাধ অন্যের উপর চাপানো যাবে না। বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে কাউকে যেন শাস্তি না দেয়া হয় সেদিকে রাষ্ট্রকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে : "একজনের বোঝা অপরজন কখনো বহন করবে না।" (ফাতির-১৮)

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : ইসলামের সাম্যনীতির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে আইন। ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন সাম্যনীতি অনুসৃত হয়। কোন নাগরিক যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা আমলা এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তার ন্যায্য অধিকার খর্ব করছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বা তার উপর যুলুম করছে, তবে সে-এর প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে বাধ্য। অভিযোগ যার বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হোক না কেন আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, "তোমরা বিচারে বসে যখন কথা বল, তখন ন্যায় কথাই বলবে; যদি বিচারাধীন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আত্মীয়ও হয়।" (আনআম-১৫২)

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কিত বহু ঘটনা মহানবী (স), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী যুগের অনেক মুসলমান শাসকের জীবনে দেখা যায়। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার উপরই শ্রেণী বৈষম্যহীন ইসলামী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

বাক স্বাধীনতার অধিকার : এ অধিকারটি পৃথিবীর কোথাও নিঃশর্ত ও নিরংকুশ নয়। কারো কথা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম অথবা অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার বাক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায্য কথা বলা নাগরিকের শুধু অধিকার নয় কর্তব্যও বটে। মহানবী (স) এ মর্মে বলেন, "যে সত্য ও ন্যায্য কথা বলে না সে বোবা শয়তান।" সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার ন্যায্য কথা, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে।

সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার : কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। পবিত্র কোরআনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল ইমরান-১০৩)

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে সত্য ন্যায় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে

www.pathagar.com

আত্মনিয়োগ করবে এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। কাজেই আল্লাহর এ ইচ্ছাকে ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

চলাফেরার অধিকার : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিক দেশের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারবে। এ চলাচলের অধিকার একটি অন্যতম সামাজিক অধিকার, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয় শরীয়াত এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "লোকেরা কি যমীনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না? এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি স্বচক্ষে দেখবে না?" (ইউসুফ-১০৯)। তাছাড়া ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ ভ্রমণের কথাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত। তার এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের রয়েছে।

মত প্রকাশের অধিকার : মত প্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার মুসলিম নাগরিকের অন্যতম অধিকার। হযরত আলী (রা) বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল। বর্তমানকালের নৈরাজ্যবাদী দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। আলী (রা)'র খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করত এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। আলী (রা) এ অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান :

"তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পার। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এ চুক্তি রইল যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না, এবং কারও উপর যুলুম করবে না।" (নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড)। অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন- "তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করব না।" (নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড)

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতামত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মতামত শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবায়িত করতে চায় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ভোটদানের অধিকার : যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রকৃতির সেহেতু দেশের শাসক নির্বাচনে জনগণ ভোটদানের অধিকার ভোগ করে থাকে। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনের সময় মুসলিম নাগরিকগণ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করার মাধ্যমে ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করেছিল। খিলাফতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল নাগরিকদের ভোটাধিকার তথা সমর্থন অসমর্থনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকার রাখে।

নেতৃত্ব দানের অধিকার : ভোটের মাধ্যমে বা অন্য যে-কোন উপায়ে জনমতের সমর্থনে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। এখানে নেতৃত্ব প্রার্থনা করার রেওয়াজ না থাকলেও যে কোন নাগরিক তার গুণাবলি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন লাভ করে তাদের নেতৃত্ব দানের অধিকার রাখে। এ জন্য মহানবী (স) একজন ক্রীতদাসের নেতৃত্বও

www.pathagar.com

মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণ, গোত্র, অভিজাত্য ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয় না বলে ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার সর্বজনীন।

রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার : দেশ ও জনগণের কল্যাণে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়, ন্যায্য সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে দল গঠন করতে পারে। তবে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ইসলাম অনুমোদিত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রচিত হতে হবে। মানুষের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামী রাষ্ট্রে অচল। মনে রাখতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ আল্লাহর বিধান ও মহানবী (স) এর নির্দেশিত পদ্ধতির মধ্যে নিহিত।

অভাবমুক্ত হওয়ার অধিকার : অভাবী এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদের তাদের জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র বা ধনী ব্যক্তিরা তার এ অধিকার পূরণ করবে। যেমন আল্লাহর বাণী : "এবং তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (আয-যারিয়াত-১৯)

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য : রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু অধিকারই ভোগ করে না। তাকে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়েই গঠিত হয়। অতএব নাগরিকদের অধিকারের সাথে কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে নাগরিকের কর্তব্যগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হল।

আনুগত্য স্বীকার করা : নাগরিক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। নাগরিকগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করে। নেতা জনসমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষমতারোহণ করেন। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করলে নাগরিকগণ তার প্রতি অনুগত থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করবে। পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের নেতার (রাষ্ট্র প্রধানের) অনুগত হও।" (নিসা-৫৯)

আইন মান্য করা : নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন হচ্ছে ইসলামী নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করা পক্ষান্তরে ইসলামকে অমান্য করার শামিল। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের পূর্বশর্ত আইন মেনে চলা। মহানবী (স) এ মর্মে বলেন, "সুখে-দুঃখে ও আনন্দে নিরানন্দে রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম আহকাম শ্রবণ করা ও মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।"

যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন শরীয়া পরিপন্থী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকগণ আইন মেনে চলতে বাধ্য। ইসলাম বিরোধী হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। কেননা ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে : "কোন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর নাফরমানীর আওতায় পড়ে এমন কোন অন্যায় কাজে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করা বৈধ নয়।"

রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া। প্রতিটি নাগরিক যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তার সুখ ও

www.pathagar.com

সমৃদ্ধির স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয় এবং যে নাগরিক রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সে সুনাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রদ্রোহী। রাষ্ট্রদ্রোহীতা জঘন্য অপরাধ। কেননা এ কাজ সমাজজীবনকে অস্থিতিশীল ও জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। পবিত্র কোরআনে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মত জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "শান্তি স্থাপনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না" (আরাফ-৫৬)। রাষ্ট্রদ্রোহীতা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আল্লাহর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।" (কাসাস-৭৭)

সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে বাধদান করা : মুসলমান হিসেবে সৎ ও কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করা এবং অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত শুভ উদ্যোগে সহযোগিতা করা, অসৎ অশুভ কাজে বাধা দান করা।

এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারসমূহ উপভোগের পাশাপাশি উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও সমৃদ্ধি অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুস্‌লিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
Rights and Duties of Non-muslim Citizens

মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিক যে সকল অধিকার ভোগ করে তার প্রায় সবকটি অধিকার একজন অমুসলিম নাগরিকও ভোগ করতে পারবে। নিম্নে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল।

জীবনের নিরাপত্তার অধিকার : মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের জীবনের মূল্য আইনের চোখে সমান। কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ঠিক অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাসূল (স)-এর আমলে জনৈক মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন, "যে নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্বও আমার।"

হযরত ওমর (রা)-এর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাকে হত্যার পক্ষে রায় দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর (রা)-এর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী (রা)-এর আমলে জনৈক মুসলিম জনৈক অমুসলিমকে হত্যার দায়ে

www.pathagar.com

গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলল, "আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন : "ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বলল, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আমাদের অধীন অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতই।"

অপর এক বর্ণনায় হযরত আলী (রা) বলেছেন, "তারা আমাদের নাগরিক হতে রাজি হয়েছে এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।" এ কারণেই ফিকহবিদগণ এই বিধান প্রণয়ন করেছেন যে, কোন অমুসলিম নাগরিক কোন মুসলিম-এর হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোন মুসলিম নাগরিকের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়।

ফৌজদারী দন্ডবিধির ক্ষেত্রে অধিকার : ফৌজদারি দন্ডবিধি মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলিম নাগরিককে দেয়া হবে, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিম নাগরিকের কোন সম্পদ যদি মুসলিম চুরি করে কিংবা মুসলিম নাগরিকের কোন সম্পদ যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক উভয়কে এই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কারণ মদ তাদের জন্য হালাল।

দেওয়ানী আইন প্রয়োগের সমান অধিকার : দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো।" হযরত আলী (রা)-এর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলিমদের সম্পত্তি যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় অমুসলিমদের সম্পত্তিও অনুরূপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং আমাদের ও তাদের দেওয়ানী অধিকার সমান ও অভিন্ন হবে। মুসলিমদের উপর যে সব দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমদের ওপরও তাই অর্পিত হবে। ব্যবসায়ের যে সব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধু শুকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ প্রস্তুত করা, পান ও কেনাবেচনা করতে পারবে। আর তা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের মদ বা শুকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে, "কোন মুসলিম যদি অমুসলিমদের মদ ও শুকরের ক্ষতি করে তবে সে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।"

সম্মান পাওয়ার অধিকার : একজন অমুসলিমের জন্য কোনভাবে কোন মুসলিমকে অপমান ও লাঞ্ছিত করা যেমন অবৈধ ঠিক অনুরূপভাবে একজন মুসলিমের জন্য একজন অমুসলিমকে অপমান করা অবৈধ। মুখ বা হাত-পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা কুৎসা রটনা করা যেমনিভাবে একজন অমুসলিমদের জন্য অবৈধ, অনুরূপভাবে এসব কাজ মুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুররে মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, "তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলিমদের গীবত করার মতই হারাম।"

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী নিরাপত্তা বিধান : অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলিমদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকার চুক্তি করার পর মুসলিমরা তা কখনও ভাঙতে পারে না। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতদিন খুশি তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দিতে পারে। 'বাদায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের চুক্তি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলিমরা তা কোনো অবস্থাতেই ভাঙতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।"

অমুসলিম নাগরিক যত বড়ই অপরাধ করুক, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমন কি জিযিয়া কর বন্ধ করে দিলে, কোন মুসলিমকে ব্যক্তিগত কারণে হত্যা করলে, রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে অথবা কোন মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নাগরিকত্ব বাতিল হয় না এবং সে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা যাবে না। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এক, যদি সে ইসলামী রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুই, যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয় এবং অরাজকতার সৃষ্টি করে।

পারিবারিক বিধানের ক্ষেত্রে অধিকার : অমুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal Law) অনুসারে নির্ধারণ করা হবে। তাদের উপর ইসলামী আইন কার্যকর করা যাবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব কাজ অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয় তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মোহর ছাড়া বিয়ে, ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ে, অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরীর কাছে এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন, "খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে করা, মদ পান ও শুকরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন কিভাবে?"

জবাবে হযরত হাসান লিখলেন, "তারা জিযিয়া দিতে এ জন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকিদা বিশ্বাস অনুসারে জীবন-যাপন করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।"

তবে কোন ক্ষেত্রে যদি বিবাদমান উভয়পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের উপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পরিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিবাদে যদি এক পক্ষ মুসলিম হয়, তাহলে শরীয়াত মোতাবেক ফায়সালা হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন খ্রিষ্টান মহিলা কোন মুসলিমের স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার স্বামী মারা গেল, এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়াত মোতাবেক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতরে সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের অধিকার : অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে একান্ত ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিতে পারে। আবার কোন ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে। "বদ্দায়ে" গ্রন্থে বলা আছে, "যে সব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শুকর বিক্রি, ক্রুশ বহনকরা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজাতে বাধা দেয়া যাবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা বেশী হোক না কেন। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে অর্থাৎ যে সব জনপদকে জুময়া, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ঐসব অঞ্চলে এসব কাজ পছন্দনীয় নয়। তবে যে সমস্ত পাপকাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই বাধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলিম জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।"

কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতে তাদেরকে শুধু ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজিয়ে বাজারে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।

উপাসনালয় স্থাপনের অধিকার : একান্ত মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপাসনালয় যদি ভেঙ্গে যায়, তবে তা একই জায়গায় পুনঃনির্মাণের অধিকারও তাদের রয়েছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই।

কিন্তু যেগুলো একক মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুময়া, ঈদ ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর রায় নিম্নরূপ :

"এসব জনপদকে মুসলিমগণ বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শুকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। আর অমুসলিমদের আবাদকৃত জনপদ অতঃপর যা মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছে সে সব জনপদের অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারেই চলবে। মুসলিমগণ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।"

জিযিয়া কর আদায়ে সুবিধা দানের অধিকার : জিযিয়া কর আদায়ে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন বোঝা চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ওমরের নির্দেশ ছিল, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।"

জিযিয়ার পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদ নিলামে দেয়া যাবে না। হযরত আলী (রা) তাঁর

www.pathagar.com

জনৈক কর্মচারীকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, "কর খাজনা বাবদ তাদের গরু, গাধা, কাপড়-চোপড় বিক্রি করো না।" অপর এক ঘটনায় হযরত আলী (রা) স্বীয় কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলে দেন, "তাদের শীত-গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরণ ও কৃষি কাজের পশু খাজনা আদায়ের জন্য বিক্রি করবে না, তাদেরকে প্রহার করবে না, দাঁড় করে রেখে শাস্তি দেবে না এবং খাজনার পরিবর্তে কোন জিনিস নিলামে দিবে না। কেননা আমরা তাদের শাসক হয়েছি, এই জন্য কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করাই আমাদের দায়িত্ব। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করেছ, তাহলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করব। জিযিয়া আদায়ে যে কোন ধরনের কঠোরতা আরোপ করা নিষিদ্ধ। হযরত ওমর (রা) তাঁর গভর্নর আবু উবায়দাকে যে-ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য নির্দেশের সাথে এ নির্দেশও ছিল, "মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের ওপর যুলুম করা, কষ্ট দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পত্তি ভোগ দখল করা থেকে বিরত রেখো।"

সিরিয়া সফরকালে হযরত ওমর (রা) দেখলেন, সরকারি কর্মচারীরা জিযিয়া আদায়ের জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "ওদের কষ্ট দিওনা। তোমরা যদি ওদের কষ্ট দাও তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের কঠোর শাস্তি দিবেন।"

হিশাম ইবনে হাকাম দেখলেন, জনৈক সরকারি কর্মচারী জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি : "যারা দুনিয়ার মানুষকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"

মুসলিম ফিকাহবিদগণ জিযিয়া প্রদানে অস্বীকারকারীদের বড়জোর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।"

যে সব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্র্যের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করতে হবে। হযরত খালিদ হীরাবাসীদের যে লিখিত নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, "আমি হীরাবাসী অমুসলিমদের জন্য এ অধিকারও সংরক্ষণ করলাম যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসেছে, যার উপর কোন দুর্যোগ নেমে এসেছে, অথবা যে পূর্বে ধনী ছিল পরে দরিদ্র হয়ে গেছে, ফলে তার স্বধর্মের লোকেরাই তাকে দানদক্ষিণা দিতে শুরু করেছে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদেরকে বাইতুল মাল থেকে ভরণ-পোষণ দেওয়া হবে।"

একবার হযরত ওমর (রা) জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললেন, "কী আর করবো বাপু, জিযিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তাৎক্ষণাৎ তার জিযিয়া মাফ ও তার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি কোষাগারের কর্মকর্তাকে লিখলেন, "আল্লাহর কসম, এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।"

www.pathagar.com

দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত ওমর (রা) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারি করেছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "কোন অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পুরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না।"

কর প্রদান পূর্বক ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার : মুসলিম ব্যবসায়ীদের মতো অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর আরোপ করা হবে যদি তাদের মূলধন ২০০ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে অথবা তারা ২০ মিসকাল স্বর্ণের মালিক হয়ে যান। এ কথা সত্য যে, ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আড়াই ভাগ কর আরোপ করেছিলেন। তবে এ কাজটা কোরআন বা হাদিসের কোন সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে করা হয়নি। এটা তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ছিল। এটা সমকালীন পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে করা হয়েছিল। সে সময় মুসলমানদের অধিকাংশই দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অমুসলিমদের হাতে চলে গিয়েছিল। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদেরকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের ওপর কর কমিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সামরিক চাকুরি হতে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার : অমুসলিমগণ সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মানে। তাছাড়া লড়াই চলাকালে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করবে ভাড়াটে সৈন্যের মত লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদেরকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবল দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় নির্বাহে মুসলিমদের অংশগ্রহণকে কর্তব্য বলে গণ্য করেছে। এটাই জিযিয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এজন্য জিযিয়া শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়েছে। আর কখনো যদি মুসলিমগণ অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিযিয়ার টাকা ফেরত দিতে হবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটায় এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হল, তখন হযরত আবু উবায়দা নিজের অধীন সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বল, "এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।"

এই নির্দেশ মোতাবেক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিমস নগরীতে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, "ইতোপূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম,

www.pathagar.com

তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পছন্দ করি। এখন আমরা যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনমতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দিব না।"

সাম্যের অধিকার : মৌলিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য নেই। ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন, "আমাদের জন্য যে সব অধিকার, তাদের জন্যও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদের উপরও তাই।"

হযরত আলী (রা) বলেছেন, "অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া প্রদান করে এজন্য যে, তাদের সম্পদ ও জীবন মুসলিম নাগরিকদের সম্পদ ও জীবনের মতই নিরাপদ হবে।"

অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়ে মহানবী (স) যে ওসীয়ত করেছেন তার ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিশারদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। তিনি আরও বলেন যে, "অমুসলিম নাগরিকদের যদি কেউ কষ্ট দেয়, একটু কটু কথাও বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের ইজ্জতের উপর একবিন্দু আক্রমণও করে অথবা তাদের সাথে শত্রুতার ইন্ধন যোগায়, তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর দ্বীন ইসলামের দায়িত্বকে লঙ্ঘন করল।

আল্লামা ইবনে হাজাম-এর মতে, যদি কোন বহিঃশক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমদের হত্যা করতে এগিয়ে আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে অমুসলিম নাগরিককে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করবে। ইসলামের প্রখ্যাত শাসকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মশালা সংস্কার ও মেরামত করে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা - "ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।" এর মাধ্যমে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : মুসলিম নাগরিকের মত একজন অমুসলিমও রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করার অধিকার রাখে। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমীর, ফকির, শিক্ষিত, মুর্খ, মুসলিম, অমুসলিমদের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টানেনি। স্বজনপ্রীতি অথবা গোত্র, বর্ণ, ধর্মবিশেষের পক্ষপাতিত্ব করা সম্পূর্ণ হারাম করেছে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ, "তুমি যখন মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে।" (মায়েদা - ৪২)

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অধিকার : অমুসলিমদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া যাবে না। দেশ রক্ষার মত কঠিন দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। কারণ এসব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই তারা জিযিয়া প্রদান করে থাকে। অতএব, জিযিয়া গ্রহণ করে তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া চুক্তিভঙ্গের শামিল। ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ ও দেশরক্ষার দায়িত্ব মুসলিম নাগরিকগণ পালন করবেন।

অমুসলিমদের অন্যান্য অধিকার : অমুসলিমদের যেসব অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তাদের জন্য শরীয়াতে নির্ধারিত। বর্তমান যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার

www.pathagar.com

অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে কী কী অতিরিক্ত অধিকার দিতে পারে নিম্নে তা আলোচিত হল।

রাষ্ট্রপ্রধান বা আইনসভার সদস্য হওয়ার অধিকার : যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র, সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হল ইসলামের মূলনীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সুতরাং যারা ইসলামের মূলনীতিকেই মানে না, সে আর যাই হোক, রাষ্ট্রপ্রধানের পদে কোনক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারে না। আর মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট তথা আইনসভাকে যদি শতকরা একশ ভাগ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ মোতাবেক গঠন করতে হয়, তাহলে এখানেও অমুসলিম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই। তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে এর অবকাশ এই শর্তে সৃষ্টি করা যেতে পারে দেশের সংবিধানে এই মর্মে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা থাকবে যে,

ক. আইনসভা কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।

খ. দেশের আইনের সর্বপ্রধান উৎস হবে কোরআন ও সুন্নাহ।

গ. আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন তিনি একজন মুসলিম হবেন।

তবে এরূপ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদেরকে দেশের আইনসভার অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ বা আইনসভা গঠন করে দেয়া। এই পরিষদ দ্বারা তারা নিজেদের সামষ্টিক প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারবে। এই পরিষদের সদস্যপদ এবং ভোটাধিকার শুধু অমুসলিমদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে এবং এখানে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই পরিষদের মাধ্যমে তারা নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাধা করতে পারবে।

১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও পূর্ব থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত করতে পারে।

২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করতে পারবে এবং সরকার ন্যায়ের ভিত্তিতে তার পর্যালোচনা করবে।

৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দেশের অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবেন।

পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে (Local bodies) অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোট দানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।

বাক স্বাধীনতা বা লেখার স্বাধীনতা : ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম যেমন বাক স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যে সব আইনগত বিধি-নিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে।

আইনসঙ্গতভাবে তারা সরকার, সরকারি আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বাধীনতা মুসলমানদের রয়েছে, তা আইন সঙ্গতভাবে তাদেরও থাকবে। একজন অমুসলিম যে কোন ধর্ম গ্রহণ করলে

www.pathagar.com

তাতে সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে কোন মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখায় থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না। অমুসলিমদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোন কাজ তারা আপন বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে।

শিক্ষার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র সমগ্র দেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

চাকুরি পাওয়ার অধিকার : কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরিতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপমাঠি হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার : শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সব পেশার দ্বার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ ভোগ করে থাকে তা অমুসলিমরাও ভোগ করতে পারবে এবং মুসলিমদের ওপর আরোপ করা হয় না এমন কোন বিধিনিষেধ অমুসলিমদের ওপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমান অধিকার থাকবে।

অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
Duties of non-Muslims

নাগরিকের প্রদত্ত এসব অধিকারের বিপরীতে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের প্রতি অমুসলিমদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

সরকারের আনুগত্য করা : ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারের আনুগত্য করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় নবী করীম (স) বলেছেন,

"শ্রবণ করা, অনুসরণ করা ও মেনে চলা সকল অবস্থায় অপরিহার্য।" অর্থাৎ কোন আইন পছন্দ হোক বা অপছন্দই হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক তা মান্য করা এবং পালন করা অপরিহার্য।

আইন শৃঙ্খলায় ফাটল না ধরানো : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্রে শাসন-শৃঙ্খলা বিরোধী এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলায় ফাটল ধরে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও এসেছে, "সংস্কার সংশোধনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" (আল-আরাফ :৫-৬)

ভাল কাজে সহযোগিতা করা : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের কল্যাণকাজে সহযোগিতা করা, অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া। কোরআনের ঘোষণা, "ভাল ও নৈতিক কাজে এবং তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর আর পাপ ও খোদাদ্রোহীতার কাজে সহযোগিতা করো না।" (সূরা—মায়েদা :২)

www.pathagar.com

জিযিয়া প্রদান করা : ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত জিযিয়া প্রদান করা অমুসলিম নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। তবে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রা)-এর নির্দেশ ছিল "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।"

যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোনরূপ কষ্ট দেবে, আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াব এবং আমি যার বিরুদ্ধে দাঁড়াব কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করব। (আল-হাদিস)

সর্বদা রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করা : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক যারা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি বা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে। রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করা তাদের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজ তারা করতে পারবে না। তবে মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কতিপয় পার্থক্য ছাড়া মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। অতএব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলি
Quality of a Head of the Islamic State

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক সর্বশক্তিমান আল্লাহ। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধিমাত্র। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এর ভূমিকাও অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন প্রকৃতির। যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যে রাষ্ট্র প্রধানের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করে তারা আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। এই কারণেই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কতগুলো আইনগতও চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অন্যদের মধ্যে এ সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী বিদ্যমান থাকবে, জনগণ তাকেই আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করবে। তিনি জনগণের রায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক যোগ্য ও নেতৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত করবেন। আর তাদের পরামর্শক্রমে শরীয়াত মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত গুণাবলি : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান-এর নিম্নবর্ণিত আইনগত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

মুসলিম হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার প্রধান পদে উপযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা : "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য হতে নির্বাচিত আমীর বা নেতার" (নিসা - ৫৯)। এখানে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ডাক দিয়ে মুমিনদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য করার কথা বলছেন তিনি অবশ্যই মুমিন তথা মুসলমান। এখানে মোমিনাতের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ শুধু পুরুষদের বুঝানো হয়েছে।

পুরুষ হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। কোন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। এ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন "যে জাতি কোন মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, সে জাতি সফলতা অর্জন করতে পারবে না"। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা "পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল" (নিসা ৩৪)।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের আরেকটি গুণাবলি অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। ইমামতি, স্বাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুস্থ হওয়া : অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য উপযুক্ত নয়। তাকে অবশ্যই সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হতে হবে।

বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবেক-বুদ্ধিহীন, পাগল ও নির্বোধ লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান করা যাবে না। কোরআনের ঘোষণা "তোমাদের সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিওনা।" (নিসা-৫)।

রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে হলে, অবশ্যই তাকে রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী "যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি, হিজরত করে নাগরিক না হওয়া পর্যন্ত ওয়ালী বা নেতৃত্বের কোন অধিকার তাদের নেই।"

নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা : রাষ্ট্রপ্রধানকে আইনগত গুণাবলির পাশাপাশি কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

তাকাওয়া তথা খোদাভীরুতা : রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্যই সর্বোত্তম তাকওয়ার অধিকারী তথা খোদাভীরু ও পরহেযগার হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সম্মানিত।" (হুজরাত-১৩)

আমানতদার ও আস্থাভাজন হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য সত্যাশ্রয়ী আমানতদার ও জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে। বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী কখনও এ পদের উপযুক্ত নয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তাদের প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতে।" (নিসা-৫৮)

বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অবশ্যই বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, গভীর জ্ঞান প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় জটিলতা ও সমস্যমান কার্যাবলি সমাধান করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। রাসূল (স) বলেন, "যখন কোন অযোগ্য লোককে দায়িত্বে প্রধান করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের তথা ধ্বংসের অপেক্ষা কর।" (বুখারী, ইলম অধ্যায়)

পদলোভী না হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যেহেতু সমাজের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের অধিকারী সেহেতু তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাই কেউ এখানে পদপ্রার্থী বা পদলোভী হতে পারবে না। অর্থাৎ ইসলামে পদের প্রার্থী হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, তদ্বির, প্রচার ও অর্থব্যয় করা এ পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা জনগণই নৈতিক মান দেখে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করবেন। রাসূল (স) এ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

বলেন, "আল্লাহর শপথ! এমন কাউকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যাবে না, যে ব্যক্তি নিজেই তা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয়।"

অর্থলোভী না হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই অর্থ সম্পদের প্রতি লোভ লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে তাকে কখনও নির্বাচিত করা যাবে না। কারণ এ লোভের কারণে সে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার করতে পারে।

আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা : এর দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কথা স্মরণ করা আবশ্যক। কখনও তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হতে পারবে না। কেননা আল্লাহর প্রতি বেখেয়াল হলে তার দ্বারা অন্যায় অনাচার হতে পারে। আল্লাহ বলেন, "এমন ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, যে তার অন্তরকে আমার স্মরণ হতে বিরত রেখেছে।" (কাহাফ-২৮)

বিদআতপন্থী না হওয়া : রাষ্ট্রপ্রধানের পদে কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী তথা কোন বিদআতপন্থী, কুসংস্কারপন্থীকে নির্বাচন করা যাবে না। কেননা এ জাতীয় নেতৃত্ব কখনো ইসলাম বা মানবতার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। রাসূল (স) বলেছেন, "ইসলামের নামে সকল কুসংস্কার পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য।"

ন্যায়বিচারক হওয়া : সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই ন্যায়বিচারক হতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা "যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে" (সূরা নিসা-৫৮)। আল্লাহ আরো বলেন, "যারা আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী বিচারকার্য করে না তারা কাফের, ফাসেক, জালেম।"

উত্তম মেধা ও প্রতিভাধর হওয়া : প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য তার স্বভাবগত যোগ্যতা একান্তই অপরিহার্য। নেতৃত্ব দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা। কেননা মানুষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শাসকদের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা বিশ্ব জাতিসমূহের বিরোধিতা করে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে চরম দুর্গতি ও দুর্ভোগ। প্রশাসকের এই গুণ থাকায় শর্তটির গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। নেতৃত্ব স্বতঃই এই শর্তের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে নবী করীম (স) নিজে এই শর্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন "সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের জন্য কেবল সেই পুরুষই উপযোগী যার মধ্যে এ তিনটি স্বভাব রয়েছে —

এক, এমন আল্লাহ ভীতি যা তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখে।

দুই, এমন ধৈর্য সহ্য যা দ্বারা সে তার ক্রোধ আয়ত্ত্বে রাখতে পারে।

তিন, সে যাদের নেতৃত্ব দিবে তাদের উপর উত্তম নেতৃত্ব দান করবে যেন তারা সবাই তার সন্তানতুল্য হয়ে যায়।"

মুসলিম জনগণের নেতা এমন ব্যক্তি হতে পারেন যিনি উদারতা, সহনশীলতা ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী হবেন।

www.pathagar.com

বস্তুত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান সেই রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ এবং খোদাভীরু, আমানতদার, ন্যায়বিচারক ও নিঃস্বার্থবাদী মানুষ হবেন। এরূপ নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার উপযুক্ত যিনি কোরআন-সুন্নাহর আলোকে রাসূল (স) এর নির্দেশিত পন্থায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই পরিচালনা করবেন; যার পশ্চাতে নিহিত ইহজাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য
Duties of a Head of the Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আইন জারী ও কার্যকর করার জন্য একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মুসলিম জনগণের মধ্য হতে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। মানুষের মধ্যে কেবল তাকেই খলিফা বা আমীর নামে অভিহিত করা হয় যিনি জনগণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক। খলিফা হবেন খলিফাতুল মুসলিমীন বা সমগ্র মুসলিম জাতির প্রতিনিধি। এরূপ খলিফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা : রাষ্ট্রপ্রধান বা খিলাফতের মর্যাদায় যিনি অধিষ্ঠিত হবেন তার কাজ সাধারণ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে ব্যাপক বিস্তৃত ও ভিন্নতর। এ মর্যাদা হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়াত প্রদত্ত একটি মর্যাদা। শরীআত তার নির্ধারিত উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মর্যাদাটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই খলিফা বা আমীর তথা রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হবে এ উদ্দেশ্যের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। এ উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআনের উদ্ধৃতি ও রাসূল (স) এর বাণী থেকে একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

"তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করবে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খলিফা বা রাষ্ট্র পরিচালক বানাবেন। যেমন করে তাদের পূর্ববর্তীদের তিনি খলিফা বানিয়েছিলেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তার পছন্দনীয় দ্বীন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ভয়-ভীতি ও আশংকার পর অবশ্যই তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। এই লোকেরা কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করবে। তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না" (নূর-৫৫)। রাসূল (স) বলেন, "যদি এমন কোন ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার অঙ্গ কেটে দেয়া হয়েছে; কিন্তু সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তোমাদের পরিচালনা করছে, তাহলে তার কথা শ্রবণ করো ও তার আনুগত্য করো" (মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত)। মূলত খিলাফতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে -

"খিলাফত হল দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (স) উত্তরাধিকারী" (কিতাবুল সাওয়াকিফ)। দ্বীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল মুসলিম সমাজকে সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। এই দৃষ্টিকোণে ইসলামী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

চিন্তাবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার দায়িত্ব কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণমূলক আদর্শিক রাষ্ট্র। তাই এর রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ : রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ করা। সার্বভৌম ক্ষমতার (Sovereign Power) মালিক সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের। আল্লাহর খিলাফতের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দ্বীন-ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, দ্বীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করা, দ্বীনের মর্যাদা, ঐতিহ্য আদর্শ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আর এ কাজের জন্য প্রধান দায়িত্বশীল হচ্ছে খলিফা।

আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা : রাষ্ট্রপ্রধানের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে বিবদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করা। ঝগড়া-বিবাদ ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও ফয়সালায় ইসলামী আইন অনুসরণ করা।

শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণ : ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতি ও বিপদ আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা, স্বাধীন ও নির্বিঘ্নে জীবন-যাপনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ দেওয়া খলিফার অন্যতম দায়িত্ব। এককথায় শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and Order) স্থাপন ও সংরক্ষণ করা।

সকল নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা : আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত হারাম ও অবৈধ কাজ যাতে কেউ করতে না পারে, কোন নাগরিকই যেন স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। অন্য কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন, দুর্বলকে শক্তিশালী করা সবলদের সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রপ্রধানের অতিগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা : বৈদেশিক ও বিজাতীয় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে দেশকে, দেশের জনগণকে এবং তাদের জীবন-সম্পদ, ইজ্জতকে রক্ষা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন ও সামর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় আয়ের ব্যবস্থা : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক রাষ্ট্রের কর, খাজনা ও অন্যান্য সরকারি ধার্য সঠিকরূপে নির্ধারণ করা ও তা আদায় করার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

বাইতুল মাল সংরক্ষণ : রাষ্ট্রের বাইতুল মাল সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের আর একটি দায়িত্ব। বাইতুল মাল থেকে যাকে যা দেয় তার পরিমাণ নির্ধারণ এবং যথাযথভাবে তা দেয়ার ব্যবস্থা করা, অপচয় না করা ইত্যাদি খিলাফত প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব।

নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ : দায়িত্বশীল, নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, তাদের নিকট থেকে কর বুঝে নেওয়া, তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিপথগামীদের সুপথে আনয়ন : পথভ্রষ্ট ও বিপথগামীদেরকে ইসলামের সুমহান পথে ফিরে আনার পদক্ষেপ গ্রহণও খলিফার দায়িত্ব। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পুরো দায়দায়িত্ব খিলাফত ব্যবস্থার উপর ন্যাস্ত।

www.pathagar.com

সামগ্রিক দায়িত্ব : সকল জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া, পরিস্থিতির অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদ্রূপ পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন সার্বিকভাবে গোটা উম্মাহ রক্ষা পায় এবং মিল্লাত সংরক্ষিত থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সর্বোপরি আল্লাহর বিধান জারি ও সংরক্ষণ করাই রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাষ্ট্র প্রধানের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা রাষ্ট্র-প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যত ব্যাপক ও সর্বজনীন তার অধিকার তত নির্দিষ্ট। তার অধিকার হল এই যে, তাঁর নির্দেশ সবাইকে শুনতে হবে ও পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল, তাদের আনুগত্য করা। (নিসা - ৫০)

মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে নিজের আমীরের আনুগত্য করে, সে মূলত আমার আনুগত্য করে এবং যে আমীরের অবাধ্য সে বাস্তবে আমারই অবাধ্য। (মুসলিম - ২য় খণ্ড)। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা প্রতিটি নাগরিকের জন্য ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য।

ভালবাসা : আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানকে ভালবাসাও রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অধিকার। বাইরে যেমন তাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, তেমনি অন্তরেও তাঁর প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে। মহানবী (স) বলেন,

"তারা তোমাদের ভাল খলিফা যাদেরকে তোমরা ভালবাস, তোমাদেরকেও তারা ভালবাসে এবং যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো, তোমাদের জন্য তারাও দোয়া করে। অনুরূপভাবে তারাই তোমাদের মন্দ খলিফা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং যাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ দাও, তোমাদের প্রতিও তারা অভিশাপ দেয়।" (মুসলিম - কিতাবুল ইমারত)

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে এমনই হতে হবে। মানুষ তার জন্য সদিচ্ছা পোষণ করবে। অন্তর থেকে তাঁর মঙ্গল কামনা করবে। মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁর জন্য ভক্তি ভালবাসা উপচে পড়বে। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হাতে "বাইআত" আনুগত্যের শপথ আন্তরিকতা ও ভালোবাসারও শপথ।

দ্বীন ও আখিরাতের জন্য বাইআত : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের তৃতীয় অধিকার হল এই যে, তাকে শুধু দুনিয়ার নয় বরং দ্বীনের জন্যও প্রয়োজন মনে করতে হবে এবং রাষ্ট্র প্রধানের হাতে এ ব্যাপারে বাইআত করতে হবে, তার পেছনে আসলে প্রেরণা হবে কেবল আখিরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। মহানবী (স) বলেন,

"তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না। এক ব্যক্তি হল যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে খলিফার হাতে বাইআত করে" (বুখারী - ২য় খণ্ড, কিতাবুল আহকাম)। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুসলমানদের খলিফার কাছে বাইআত ও আনুগত্য কেবল দুনিয়ার জন্যই নয় বরং দ্বীন ও আখিরাতের জন্য হতে হবে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুক্তি : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত মর্যাদা হল তিনি হচ্ছেন জাতির উকিল ও জাতির সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বশীল। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দায়িত্ব বিরোধী কোন কাজ করলে বা অক্ষমতা অথবা উপেক্ষার দরুণ তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাঁকে পদচ্যুত করার দায়িত্ব জাতির রয়েছে। যেহেতু জাতির জনগণই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে, কাজেই তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতিরই থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়াতে এ অধিকার স্বীকৃত। যে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করেনা এবং তার বিধান অনুসরণ করে না, তাঁর আনুগত্য করা কিছুতেই বৈধ হবেনা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

"যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ শূন্য, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই যার অভ্যাস এবং যে ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্মে সীমা-লঙ্ঘন করে তার আনুগত্য করো না।" (কাহাফ-২৮)

"যেসব লোক সীমালঙ্ঘন করে দুনিয়ার অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব একেবারেই স্বীকার করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করো না।" (শূরা-১৫১-১৫২)

"নিশ্চই আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি। অতএব ধৈর্যধারণ করে কেবল আল্লাহর হুকুম পালনে রত থাক, সমাজের কোন পাপী ফাসিক কিংবা কাফির লোকের আনুগত্য করো না।" (দাহার-২৩-২৪)

ইসলামী রাজনীতিবিদ ও ফকিহগণ শরীয়াতের বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, যে রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিকৃতিগুলো পরিদৃষ্ট হবে তাকে পদচ্যুত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। সেগুলো হচ্ছে -

১. রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজা সাধারণের অধিকার আদায় না করেন এবং তাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালান।

২. তিনি যদি জনগণকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেন।

৩. তিনি যদি অসৎ চরিত্রের অধিকারী হন, প্রকাশ্যে শরীয়াতের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং অন্যান্য গর্হিত কার্যাবলি সম্পাদন করতে থাকেন।

৪. তিনি যদি দ্বীন ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহ পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলির অনুপ্রবেশ ঘটান।

৫. ইসলাম থেকে তাঁর দূরত্ব যদি এমন পর্যায়ে যায় যে, তিনি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র আইনের পরিবর্তন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলির অনুপ্রবেশ ঘটান।

৬. তিনি যদি ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ পরিহার করেন এবং কুফরী আকীদা গ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হবেন তাকে অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়াত নির্ধারিত পন্থায় চলতে হবে এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পশ্চাতে নিহিত থাকবে ইহজাগতিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান দুনিয়াতে যেমন জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকবে তেমনি আখিরাতে শেষ বিচারে মহান প্রভুর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. রাজনীতি কি? রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is politics? Explain the concept of Islam about politics]

২. রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is state? Explain the western concept about the State]

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী আলোচনা কর।
[Define Islamic state. Discuss the formation of Islamic state.]

৪. ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান বর্ণনা দাও।
[What is meant by Islamic state? Describe the elements of Islamic state.]

৫. ইসলামী রাষ্ট্র কি? ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণনা কর।
[What is Islamic state? Describe the principles of Islamic state]

৬. ইসলামী রাষ্ট্র কি? ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
[What is Islamic state? Discuss the features of Islamic state.]

৭. ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।
[Discuss the puposes of Islamic state.]

৮. মজলিসে শূরা কি? এর সদস্যদের গুণাবলি আলোচনা কর।
[What is Majlish-E-Shura? Discuss the qualities of its members.]

৯. ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিশে শূরার ভূমিকা/কার্যাবলি আলোচনা কর।
[Discuss the role of Majlish-E-Shura in the Islami Democracy.]

১০. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর।
[Discuss the Rights and Duties of Citizens of Islamic state]

১১. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর।
[Discuss the Rights and Duties of non-muslims of Islamic state.]

১১. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা কর।
[Discribe the qualities and Duties of Chief of Islamic state.]

১২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা কর।
[Compare between the Islamic political system and modern political system.]

১৩. ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা কর।
[What is meant by Islamic state? Compare between the Islamic state and western democratic state.]

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রশাসন ব্যবস্থা
Administration in Islamic State

❒ প্রাক-কথা, তৎকালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, মহানবী (স) কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক ভিত্তি, রাসূল (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা, মহানবী (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, নির্বাচিত প্রশ্নাবলি

প্রাক-কথা
Introduction

মানবতার মুক্তির অগ্রদূত নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) শুধু একজন নবীই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় সংস্থার পরিচালক। তাঁর জীবন সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গোত্রকলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরবদেরকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সংগঠনী ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রোথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি গোড়াপত্তন করেন একটি 'উম্মাহ' ভিত্তিক রাষ্ট্রের। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের উপর শুধু আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব। শিরকের সকল চিহ্ন মূলোৎপাটিত হয়েছিল সমাজ থেকে। অবসান হয়েছিল মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের। মানুষ স্বাদ পেয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার। ফিরে পেয়েছিল মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার সকল মৌলিক অধিকার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন ও ন্যায়ের শাসন। শাসকগণ পরিণত হয়েছিলেন জনগণের সেবকে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। নারীরাও পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদের মুক্তির সোপান। সমাজ থেকে শোষণের হাতিয়ার সুদ উচ্ছেদ হয়ে তদস্থলে প্রবর্তিত হয়েছিল জনকল্যাণমুখী যাকাত ব্যবস্থার। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান হয়েছিল সংকুচিত। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন রাসূল (স) স্বয়ং। মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করতে থাকেন। আর মহানবী (স) তাঁর সাথীদের সহযোগিতায় সেইসব বিধি-বিধান কার্যকর করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকদের মতে, মদীনায় এই রাষ্ট্রটি ছিল মানব ইতিহাসে প্রথম সাংবিধানিক সরকার এবং সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। রাসূল (স)

www.pathagar.com

জীবদ্দশাতেই এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটেছিল মদীনা শহর ছাড়িয়ে আরবের প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মহানবী (স) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মহানবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

তৎকালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মহানবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র তথা এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলাম-পূর্ব আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহর দুই মহান নবী যীশু (হযরত ঈসা আ) ও হযরত মুহাম্মদ (স) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। ইসলামে এই সময়টাকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'মূর্খতার যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ইসলামী যুগের 'জ্ঞান ও আলোর' যুগের বিপরীত।

জাহেলী যুগে আরবরা দুই বৃহৎ অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশ হচ্ছে মরুবাসী বেদুইন। মধ্য আরবে ছিল এদের বসবাস। এদের নির্দিষ্ট কোন বসতি ছিল না। এরা তাদের উট, মেষ ও ঘোড়া চারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ খোঁজার উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এদের জীবন-যাপন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। এরা শক্তিশালী, উদ্যমী ও অতিথি পরায়ণ ছিল। আরবদের অপর অংশটি হচ্ছে তারা, যারা আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। যাযাবর বেদুইনদের তুলনায় এরা সভ্যতায় অনেক অগ্রসর ছিল। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল এবং বৎসরে দু'বার বাণিজ্য সফর করত। তাদের বাণিজ্য সফর শীতের সময় ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে, আর গ্রীষ্মকালে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার প্রধান প্রধান শহর ও নগরে পরিব্যাপ্ত ছিল।

যাযাবর আরবরা পরিবার, গোত্র, দল ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক পরিবার, দল ও গোত্রের একজন প্রধান বা নেতা ছিল। পূর্বপুরুষদের নামানুসারে পরিবার ও গোত্রের নামকরণ করা হত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রহিম বলেন, "গোত্রের বন্ধনই ছিল আরবদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গোত্রই তাদের সরকার এবং গোত্রপ্রধানই ছিল তাদের সরকার প্রধান। এই সূত্রে গোত্রই ছিল সার্বভৌম এবং গোত্রের প্রতিই তাদের আনুগত্য থাকত। গোত্রের বাইরে একসাথে বসবাস করা আরবের সমসাময়িক অবস্থায় সম্ভব ছিল না।" বয়স, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে দলীয় প্রধান নির্বাচিত হত। সুতরাং বেদুইনদের সামাজিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের মৌলিক ইউনিট ছিল গোত্র যার ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক। এস এ কিউ হোসাইনী (১৯৬৬) এর মতে, সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষভাবে বেদুইনরা আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রী ছিল। তারা দলীয় প্রধান নির্বাচনে অংশ নিত এবং আরোপিত (স্বেচ্ছাচারী) শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করত না। দলীয় প্রধানকে তাই প্রবীণ ও জ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিলের সম্মুখে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হত।

অন্যদিকে, শহরবাসী আরবদের নগর-রাষ্ট্র ভিত্তিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল, ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের মতে, "মক্কার আদিবাসীদের একটি সিটি হল ছিল, যার

www.pathagar.com

নাম ছিল 'দারুন নদওয়া' (সম্মেলন কক্ষ)। নেতৃস্থানীয় ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দলের কার্যাবলি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য সেখানে মিলিত হত। এছাড়াও তাদের অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ এরূপ ২১টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : (১) নদ্ওয়া; (২) মশওরা; (৩) কিয়াদাহ্; (৪) সেদানা; (৫) হিযাবা; (৬) সেকায়া; (৭) ইমারাতুল বাইত; (৮) ইফাদা; (৯) ইজাজাহ্; (১০) নসি; (১১) কুব্বা; (১২) আন্নাহ্; (১৩) রিফাদাহ্; (১৪) আমওয়ালে মাহ্জরা; (১৫) ই'সার; (১৬) এশনাক; (১৭) হুকুমাহ; (১৮) সেফারা; (১৯) ইকাব; (২) বুয়া এবং (২১) হিলওয়া নুন নফর।

মক্কার অভিজাত পরিবারসমূহ কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করত। এসবের মধ্যে ছিল পর্যটক ও হাজীদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল সেবামূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা মদীনার মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে করও আদায় করতেন।

মহানবী (স) এই মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে একই 'উম্মাহ' বা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সূচনা করেন জাতীয়তাবাদী কল্যাণ রাষ্ট্রের - মদীনা রাষ্ট্র।

মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি

মহানবী (স)-এর জীবন সাধনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ছিল মক্কা হতে মদীনায় হিজরত। এই হিজরত উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই শুধু বদলে দেয়নি ইসলামের বিকাশেও একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুর ৬২২ বৎসর পর হযরত মুহাম্মদ (স) ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর মাতৃভূমি মক্কা নগরী ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। তৎকালীন মদীনায় 'মুহাজির' এবং 'আনসার' ছাড়াও অনেক ইহুদি বসবাস করত। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে সময়ে মদীনায় প্রধানত তিন শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। যথা - (১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়; (২) বিদেশি ইহুদি সম্প্রদায়; (৩) নবদীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের কারো সাথে কারো আদর্শের কোন মিল ছিল না বরং ছিল দলগত হিংসা-বিদ্বেষ। এ সকল গোত্র এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকদের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপনের জন্য রাসূল (স) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা তা একখানি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাকেই 'কিতাব-উর-রাসূল' বা রসূল (স)-এর কিতাব বা দলিল বলা হয়। এই দলিলই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। Reuben Lay-এর মতে, এই মদীনা সনদের মধ্যেই নিহিত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ। এই সনদের মাধ্যমেই গোড়াপত্তন হয় ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় : (১) একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড; (২) একটি জনগোষ্ঠী; (৩) সার্বভৌম সরকার; (৪) জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ। হিজরতের সময় মদীনায় ভূখণ্ড এবং জনগোষ্ঠী ছিল; কিন্তু সরকার ছিল না এবং জনগণের মধ্যে একাত্মবোধও ছিল না। মুহাম্মদ (স) কর্তৃক এই কিতাব (সনদ) জারি করার ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকারও সৃষ্টি হয়। মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাই মিলে একটি উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত হয়। এই উম্মাহ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল না, ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ব্যাপারেও। এতে বুঝা যায় যে, এখানে 'উম্মাহ্' শব্দটি নাগরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে এই সনদ (সংবিধান) এর মাধ্যমে মদীনায় একটি সরকারেরও উন্মেষ ঘটে এবং মুহাম্মদ (স) নিজেই হলেন এই সরকারের প্রধান।

মহানবী (স) কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক ভিত্তি

মহানবী (স) কর্তৃক মদীনা সনদ নামক জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে উম্মাহ্‌ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ঘটনাকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক প্রয়োজন বা সে সময়কার পরিস্থিতিজনিত উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিক কারণ ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট। রাসূল (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রেরিত তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত ইসলামকে মানবজাতির জন্য জীবন বিধান হিসেবে পূর্ণতা দিয়েছেন মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড যথা—রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র আনুগত্য তথা শরীয়া আইনের কাঠামোতে পরিচালনার জন্য ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়েতের পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে। তাঁরা কেউ কখনও নতুন সমাজ গঠন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন নি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য 'রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন' হিসেবে। পূর্বের নবীগণের দায়িত্ব ছিল শুধু মানুষকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর আনুগত্যের পথে আহ্বান জানানো। এ সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও মহানবী (স)-কে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার, মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান ও অসৎকর্ম প্রতিহত করার এবং মানুষকে অধীন রাখার সকল ধরনের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বে সবার জন্য সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম প্রতিহতকরণ এবং মানবমুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সামাজিক কর্তৃত্বের, নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মী সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের কর্তৃত্ব। অতএব, আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজে উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন প্রক্রিয়ায় রাসূল (স) প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা। এছাড়াও কলেমার প্রথম উচ্চারণ "লা" শব্দের মাধ্যমে ঘোষিত সকল ধরনের কৃত্রিম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিদ্রোহ এবং "ইল্লাল্লাহ্" এর আনুগত্যে জীবন ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক কাঠামো যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্ভব।

রাসূল (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা

রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। উক্ত রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইনই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। তবে রাসূল (স) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাধারণ নাগরিক সমাজের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। জরুরি পরিস্থিতিতে তিনি

www.pathagar.com

জনগণের পরামর্শ নিতেন। রাসূল (স)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও সরলতা। তখন স্থায়ী কোন অফিস বা নিয়মিত কোন বেতনভুক্ত কর্মচারি ব্যবস্থা ছিল না। সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল মসজিদ। এতে রাসূল (স) প্রার্থনা করতেন, উপদেশ দান করতেন, সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বিদেশী পর্যটকদের সাথে দেখা করতেন, সমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরণের জন্য পত্রাদি লিখতেন। তাই বলা যায় তখন সম্পূর্ণ অর্থে না হলেও বিভাগীয় বা দিওয়ানের অনেক কার্যাবলি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করা হত। নিম্নে রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

(ক) সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই"। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ এই যে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, তারা আল্লাহ্‌র আইনের অধীন। মূলত আল্লাহ্‌র জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমন। মদীনা সনদ অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রে মুহাম্মদ (স)-এর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তার সেই সার্বভৌম ক্ষমতায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নাই। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিন বোডিন, অস্টিন ও হব্‌স সার্বভৌমত্ব বিষয়ে এ জাতীয় মত পোষণ করেন। হবস বলেন : "The Ruler was above his own Laws but under God's or under the law of nature"। রাসূল (স)-এর সার্বভৌমত্বের সমর্থনে হোসাইনীর মন্তব্য হচ্ছে, He regulated social relation, he raised armies and commanded them, he acquired territories and administered them." প্রকৃতপক্ষে মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌ই আইনত সার্বভৌম এবং রাসূল (স) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থা

উল্লেখ্য যে রাসূল (স)-এর সময়ে কোন স্থায়ী ও বেতনভুক্ত কর্মচারী প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবে মদীনা রাষ্ট্রে রাসূল (স)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিন ধরনের সরকারি কর্মচারী ছিল। যথা -

১. আল-ওয়ালী (গভর্নর);

২. আল-আমিল (কর-আদায়কারী); এবং

৩. আল-কাজী (বিচারক)। নিম্নের আলোচনা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. আল-ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্নর : রাসূল (স) কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পবিত্র শহর মদীনা। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে তিনি আরবদেশকে কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক গভর্নর বা ওয়ালী নিযুক্ত করতেন। ওয়ালীগণ প্রদেশে জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, শিক্ষাদান, ইসলাম প্রচার এবং আইনের শাসন তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতেন। মদীনা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বয়ং রাসূল (স)-এর শাসনাধীন ছিল। মদীনা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশগুলো ছিল তাইমা,

www.pathagar.com

আল-জানাদ, বনুকিন্দ মক্কা, নাজরান, ইয়েমেন, হাজরা-মাউত, ওমান এবং বাহরাইন। ইবনে হিশামের মতে, যিয়াদ বিন লবিত হাজারা মাউতের, আলী বিন আবু তালিব নাজরানের, মুয়ায বিন জাবাল ইয়েমেনের, ইয়ালা বিল উমাইয়া আল-জানাদের, আলা বিন হাযরানী বাহরাইনের প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান তাইমা এবং ইত্তাব ইবনে উসাইদ মক্কার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ওয়ালীর যোগ্যতা গুণাগুণের মধ্যে ছিল ইসলামী জ্ঞান, খোদভীরুতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার।

২. আল-আমিল বা রাজস্ব কর্মকর্তা : রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা এবং ইসলাম প্রচারসহ রাজস্ব সুষ্ঠুভাবে আদায়ের জন্য রাসূল (স) ওয়ালী ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বা বড় বড় গোত্রের উপর 'আমিল' নিযুক্ত করেছিলেন। এতে রাসূল (স)-এর শ্রম বিভাজন নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমিলের কাজ ছিল নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত ও সাদকাহ্ এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগকারী অমুসলিমদের নিকট থেকে 'জিজিয়া কর' আদায় করা। আমিলগণ উন্নত চরিত্রের ও ধর্মপ্রাণ সাহাবীদের মধ্য হতে মনোনীত হতেন।

৩. আল-কাজী বা বিচারক : রাসূল (স)-এর প্রশাসন ব্যবস্থায় আল-কাজী বা বিচারকের পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রদেশসমূহে ওয়ালী ও আমিলদের সাথে একজন বিচারককেও নিয়োগ করতেন। কাজীগণ ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্নর থেকে স্বাধীন ছিলেন এবং সরাসরি রাসূল (স)-এর নিকট রিপোর্ট করতেন। রাসূল (স) ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। তিনি মদীনার মসজিদে বসে রাজকার্যের সাথে বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। বিচারক পদের জন্য যোগ্যতা ও গুণাগুণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। বিচারকদের বিশেষভাবে কোরআন ও হাদিস বিশেষজ্ঞ, ফকীহ বা আইনের জ্ঞানসম্পন্ন এবং একই সাথে ধার্মিক, ন্যায়বিচার করার সামর্থ থাকতে হবে। কোন কোন সময় বিচারকদেরকে গভর্নরের দায়িত্বও প্রদান করতে হত। এছাড়াও তাঁরা ওয়াকফ ও নাবালকের বিষয় সম্পত্তিরও দেখাশুনা করতেন। হযরত আলী (রা) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) প্রমুখ রাসূল (স) কর্তৃক বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

(গ) রাজস্ব ব্যবস্থা

রাসূল (স)-এর শাসনামলে মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় দেখাশুনার জন্য কোন অর্থ বিভাগ বা ট্রেজারী ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের উৎসের মধ্যে ছিল প্রধানত যাকাত, দান ও সাদ্কাহ। অতিরিক্ত উৎসসমূহের মধ্যে ছিল ভূমি রাজস্ব (খারাজ), ভূমি কর (ফা'ই), গণিমত, জিজিয়া ইত্যাদি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

যাকাত : ইসলামের বিধান অনুসারে কেবল সামর্থবান মুসলমান নাগরিককেই যাকাত দিতে হয়। যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধকরণ ও প্রবৃদ্ধিকরণ"। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে যে কোন প্রকারের বহনযোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (নিসাব)পৌঁছলে তার উপর দেয় করকে যাকাত বলা হয়। যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট সম্পদগুলোকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা - ১. খাদ্যশস্য; ২. গৃহপালিত জন্তু; ৩. স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু; এবং ৪. বাণিজ্য দ্রব্য।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাত হতে সংগৃহীত অর্থ আটটি খাতে ব্যয়িত হত। এই খাতগুলো হচ্ছে - ১. গরিব ও অক্ষমকে সাহায্য প্রদান; ২. অভাব গ্রস্থদের অভাব দূরীকরণ; ৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান; ৪. গরিব নওমুসলিমদের ভরণ-পোষণ; ৫. দাস ও বন্দী মুক্তি; ৬. ঋণগ্রস্থদের সাহায্য; ৭. আল্লাহর পথে জিহাদ; এবং ৮. মুসাফিরের সাহায্যার্থে যারা বিদেশে অর্থ কৃচ্ছতায় পড়ে।

দান-ও সাদ্‌কাহ্ : দান ও সাদ্‌কাহ্ও যাকাতের ন্যায় দেয় সাহায্য। তবে যাকাত হচ্ছে অপরিহার্য আর দান ও সাদ্‌কাহ্ হচ্ছে ঐচ্ছিক। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যাকাত ও সাদ্‌কা প্রদানের বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য আট শ্রেণীর প্রাপকের বিষয়েও কোরআনে নির্দেশ আছে। তারা হচ্ছে নিকট আত্মীয়, অনাথ ও এতিম শিশু, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, ভিক্ষুক, বন্দীমুক্তির জন্য দেয় পণ, জিহাদে অংশগ্রহণকারী এবং অভাবে সাহায্য প্রার্থী অথচ লজ্জাবশত তা প্রকাশ করে না। দান ও সাদ্‌কাহ্ প্রদান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপই এটা প্রদেয়।

আল-খারাজ : রাজস্ব আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল "আল-খারাজ" বা ভূমি রাজস্ব। অমুসলিম কৃষি প্রজাদের উপর মুহাম্মদ (স) এই কর ধার্য করেন। এই করের পরিমাণ ছিল ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক অংশ। রাসূল (স) খায়বর বিজয়ের পর সর্বপ্রথম সেখানকার কৃষিভূমির উপর এই কর ধার্য করেন। তথাকার ইহুদীগণ মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং 'খারাজ' প্রদানের শর্তে সেখানকার কৃষিযোগ্য ভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে।

আল-ফাই : রাসূল (স)-এর রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল 'আল-ফাই' বা রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি। বিজিতদেশের আবাদী ভূমির কিছু অংশ সরাসরি রাষ্ট্রের দখলে নিয়ে নেয়া হত। ঐ সকল কৃষি ভূমিকে 'আল-ফাই' বা রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি বলা হত। এ সকল সম্পত্তির আয় থেকে রাসূল (স)-এর আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণ এবং দেশের অনাথ শিশু, গরিব-দুঃখী, পরিব্রাজক এবং অন্য জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হত।

গনিমত : আভিধানিক অর্থে গনিমত বলতে ধন-দৌলতকে বুঝায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক অর্থে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সম্পদকে গনিমত বা ইংরেজিতে booty বলা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের যে সকল মালামাল মুসলমান সৈনিকদের হস্তগত হত সেগুলোকে একত্রিত করে এক-পঞ্চমাংশ মহানবী (স) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে (জিহাদে) অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত।

জিজিয়া : জিজিয়া ছিল অমুসলিম প্রজাসাধারণের উপর ধার্যকৃত একটি লঘু কর। পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুসারে রাসূল (স) অমুসলিম প্রজার উপর 'জিজিয়া' ধার্য করেন। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করতেন না তারাই রাষ্ট্রকে এই কর প্রদান করতেন। কিন্তু অমুসলমানদের মধ্যে যারা দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতেন তাদেরকে জিজিয়া দিতে হত না। মুহাম্মদ (স)-এর শাসনকালে এই করের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু এক দিনার। কিন্তু অমুসলিম ধর্মযাজক, শিশু, মহিলা, উন্মাদ ও গরিব যারা জিজিয়া প্রদানে অক্ষম এবং পীড়িত ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জিজিয়া হতে নিষ্কৃতি দেয়া হত। খারাজ এবং জিজিয়া

www.pathagar.com

হতে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হত।

(ঘ) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

রাসূল (স)-এর মদীনা রাষ্ট্রে কোন নির্দিষ্ট সামরিক বিভাগ বা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনের সময় তিনি জাতিকে প্রতিরক্ষার কাজে আহ্বান করতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে উৎসাহী ব্যক্তিগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেন। সেই সেনাবাহনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (স) স্বয়ং। যোদ্ধাদের নিয়োগ, অস্ত্রায়ন, প্রশিক্ষণ, দেখাশুনা এবং সমস্ত মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি রাসূল (স) এর নিজের হাতে ছিল। সাধারণত তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী সর্বাধিনায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য তিনি উপনেতা নির্বাচন করতেন। তাঁর শাসনকালে মুসলমানদেরকে বহুসংখ্যক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। রাসূল (স) স্বয়ং ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন এবং অবশিষ্টগুলোতে এক একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করেছিলেন।

সৈন্যবাহিনী প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাস করার সময় পবিত্র কোরআনের সূরা আছছাফাত এর ৪ নং আয়াত অনুসারে "সফবন্দী" ভাগে সৈন্য সমাবেশ করা হত। প্রথম সফে (লাইন) বর্শাধারীগণ বাম হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঢাল দিয়ে শত্রু নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষা করতেন। দ্বিতীয় লাইনে তীরন্দাজগণ পরিমাণমত দূরত্বে ব্যূহ রচনা করতেন এবং তৃতীয় লাইনে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বদরের যুদ্ধে রাসূল (স) সৈন্যদেরকে সফবন্দী করে সাজিয়ে স্বয়ং প্রতিসারিতে প্রবেশ করে সফ বা লাইন সোজা করতেন।

(ঙ) প্রশাসনিক জবাবদিহিতা

প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ ওয়ালী, আমিল এবং কাজী তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি রাসূল (স) নিকট দায়ী থাকতেন। তিনি প্রদেশসমূহের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয় তদারকির জন্য জবাবদিহি এবং ভারসাম্য (Checks & Balance) নীতি রক্ষা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একদা এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগ দান করা হয়। ঐ আমিল রাজস্ব আদায় করে মদীনায় এসে বলেন যে, রাজস্বের কিছু অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। তা শুনে রাসূল (স) বলেন,

"সে ব্যক্তির কতই না ভুল ধারণা, যাকে আমরা রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছি অথচ সে এসে বলে এ অংশ আপনাদের জন্য আর ঐ অংশ আমাকে দেয়া হয়েছে। যদি সে ব্যক্তি তার পিতামাতার ঘরে বসে থাকত তাহলে কি তাকে কোন কিছু দেয়া হত?" রাসূল (স) আরো বলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি তখন তাকে আমরা বেতন-ভাতাও দিয়ে থাকি। যদি কেউ এর পরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে থাকে তবে তা হবে বিশ্বাস ভঙ্গের নামান্তর।" এছাড়াও ব্যবসায়িক অসাধুতা ও প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্য যথাক্রমে আল হিসবা (বাজার পরিদর্শক) এবং দিওয়ান আল মাজালিম (অভিযোগ তদন্তকারী) নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়।

www.pathagar.com

মহানবী (স)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাসূল (স)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ফলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠে :

১. ধর্মরাষ্ট্র : মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মরাষ্ট্র। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক। তিনি কোরআনের ভিত্তিতে এর আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন তবুও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতেন। মোট কথা উক্ত রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

২. সমতা : মদীনা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতা। সেখানে আইনের চোখে দেশের শাসক ও জনগণ সবাই ছিল সমান অর্থাৎ Rule of Law পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এমন কি মহানবী (স)ও একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতেন। সমসাময়িক বিশ্বের রাজন্যবর্গ ঐশ্বরিক অধিকারের যে দাবি করতেন, মদীনা রাষ্ট্রে স্বয়ং রাসূল (স)-এর জন্য তেমন কোন অধিকার সংরক্ষিত ছিল না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। একদা চুরির অপরাধে ধৃত সম্ভ্রান্ত মকজুমী বংশীয় ফাতিমা বিনতে আসাদ নামীয় এক মহিলার পক্ষ হয়ে কেউ শাস্তি মওকুফের আবেদন জানালে রাসূল (স) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন : "তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কেননা তারা একই অপরাধের জন্য দুর্বলদের শাস্তি দিত, কিন্তু ধনী ও সবলদের ছেড়ে দিত। আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মোহাম্মদও যদি চুরির অপরাধে ধৃত হত, তাহলে তার জন্যও আমি শরীয়া আইনে নির্ধারিত একই ধরনের শাস্তির নির্দেশ দিতাম" (বুখারী শরীফ)। আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্রে "রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না" (The King can do no wrong) বলে স্বীকৃত অথবা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে আদালতে জবাবদিহি করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫১ (১), (২))। কিন্তু রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তেমন কোন সুযোগ কারো জন্য সংরক্ষিত ছিল না। তাই দেখা যায় রাষ্ট্রপতি হয়েও খলিফা হযরত আলীকে একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় কাজীর দরবারে উপস্থিত হতে হয়েছিল ন্যায়বিচারের প্রার্থী হিসেবে। অনুরূপভাবে খলিফা ওমর'কেও জুম্মার নামাযে প্রকাশ্য সমাবেশে জবাবদিহি করতে হয়েছে সমভাবে বায়তুল মালের সম্পদ বিতরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের। কেবল ধর্মভীরুতা ও সৎকর্ম এবং উন্নত চরিত্র ও শরীয়ত সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যই ছিল সেখানে মানুষের মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। সে রাষ্ট্রে আরব-অনারব, সাদা-কালো, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ তথা বর্ণবাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। রাসূল (স) বলেন, "কোন নাক কাটা কাল কাফ্রীও যদি স্বীয় যোগ্যতাবলে তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয় তবে তোমরা তাঁকে মান্য কর" (আল-হাদিস)।

৩. শ্রম বিভাজন : রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রম-বিভাজন নীতি অপরিহার্য। মদীনা রাষ্ট্রেও দেখা যায় যে, রাসূল (স) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন

www.pathagar.com

কার্য সম্পাদনের জন্য ওয়ালী, আমিল, কাজী, মুহতাসির ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করেন। এতে রাসূল (স)-এর প্রশাসন পরিচালনায় শ্রম বিভাজন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৪. মেধানির্ভর কর্মকর্তা নিয়োগ : মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের ভিত্তি ছিল মেধা ও যোগ্যতা। সেখানে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ ছিল না। মদীনা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে রাসূল (স) প্রথমে গড়ে তোলেন একদল আদর্শ মানুষ। ধর্মপরায়নতার সাথে সাথে, তাদের সততা ও নেতৃত্বের যোগ্যতাও বিকশিত হয় সমভাবে। এভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব প্রদান করে সমুন্নত করার সর্ববিধ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তারা। এদেরই নিয়োগদান করা হয় প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে।

৫. পদসোপান নীতি : রাসূল (স) এর প্রশাসন ছিল পদসোপান ভিত্তিক। আল্লাহর আইন বা কোরআনের নির্দেশাবলিকে শিরোধার্য করে প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেছেন স্বয়ং রাসূল (স)। তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ কর্মরত থাকতেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর নির্দেশ -"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা আনুগত্য কর তাদের যাদেরকে তোমাদের মধ্য হতে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে।" তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন পদসোপান ভিত্তিক হলেও এর কার্যক্রম অনুভূমিক (Horizontal) পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল।

৬. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে 'শুরা' বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "তোমরা নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে।" মদীনা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। যদিও রাসূল (স) ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বময় নেতা এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদেশ বিনা বাক্যে মেনে চলতেন, তথাপি তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূল (স) প্রথম দিকে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বদরের প্রান্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি চূড়ান্ত করা নিয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শের সময় জনৈক সাহাবা ভিন্নতর জায়গায় যেখানে পানির ফোয়ারা অবস্থিত তথায় সেনা ছাউনী সরিয়ে নেবার পরামর্শ দেন যাতে শত্রুপক্ষ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। পরামর্শটি যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় এবং এর উপকারিতা বিবেচনা করে রাসূল (স) তা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে তাদের ছাউনী পানির ফোয়ারার পার্শ্ববর্তী স্থানে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে, ওহুদের যুদ্ধের সময়ও অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি তাঁর নিজস্ব মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও মদীনা নগরীর বাইরে গিয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাসূল (স)-কে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উজারা (মন্ত্রীবর্গ) এবং খাত্তাব (সেক্রেটারীগণ) ছাড়াও ছিলেন প্রিয় সহচর বা সাহাবীগণ। রাসূল (স) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী প্রশাসনে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহণ কার্যত স্বীকৃত ছিল। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করা হত।

www.pathagar.com

৭. সামাজিক ন্যায়বিচার : মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়বিচারের মহান আদর্শ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহ্ ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আদেশ করেছেন। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় রাজা-প্রজা, মুসলমান-অমুসলমান, আরব-অনারব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না। আল্লাহ্ বলেন, "হে মুহাম্মদ (স)! বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার।" অন্যত্র বলা হয়েছে, "ওয়া ইজা হাকামতুম বাইনান্নাসি আন তাহ্‌মু বিল আদল" অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ হচ্ছে যখন বিচার করবে তখন ন্যায়বিচার করবে।" আরো বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানকারী ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও। যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় এবং ন্যায়বিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা।" সুতরাং মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূল (স) নিজেও সচেষ্ট ছিলেন এবং ইসলামী আইন-কানুনে অভিজ্ঞ, সৎ, খোদাভীরু ও নিঃস্বার্থ, ন্যায়বান ব্যক্তিদেরকে কাজী পদে নিয়োগ দান করতেন।

৮. মানবতার বিকাশ : মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতা বিকাশের এক নতুন সংস্থা যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের ভিত্তিতে মানব সমাজ ছিল বিভক্ত। সেখানে তিনি বৃহত্তর মানব কল্যাণের লক্ষ্যে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো রচনা করেন যেখানে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বজায় রেখেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানেই। অনেকে ভাবেন ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ রূপায়ণ ক্ষেত্র।

শুধু নামাজ, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ইসলামী বিধানই এখানে কায়েম হবে এমন নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের দিগন্ত বহু প্রসারিত। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ কিভাবে একই রাষ্ট্রে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র হবে তারই দৃষ্টান্তস্থল। অন্যকথায়, উদার মানবতা ও বিশ্ববোধই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শরীয়াতের যে কঠোরতা সম্ভব, ইসলামী রাষ্ট্রে বরং তা অনেকাংশে শিথিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের জন্য মূর্তিপূজা শুধু অনুমোদিতই নয় বরং বিভিন্নভাবে অমুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং সরকারি প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ সংরক্ষিত।

৯. অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ : অমুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ চুক্তি ও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন মদীনা রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসূল (স) জিজিয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের সাথে যে সকল মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার মূল বিষয়বস্তু ছিল :

(ক) তারা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের রক্ষা করবে;

(খ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না;

(গ) তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে;

(ঘ) তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সম্পত্তি অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে;

(ঙ) তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হবে না;

www.pathagar.com

(চ) তাদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না;

(ছ) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না বা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবে না; এবং

(জ) ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।

বস্তুত মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান ও তাঁদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসূল (স) বলেন, "যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কেউ যদি তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে কিংবা তাদের বহন করার অতিরিক্ত বোঝা (কর) চাপায় তবে আমি শেষ বিচারের দিন তাদের জিম্মার পক্ষে ওকালতি করব।"

১০. মহানবী (স)-এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব : মহানবী (স)-এর রাষ্ট্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তা হচ্ছে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী। ওয়েবারীয় ধারণামতে তিনি কোন গতানুগতিক (Traditional) নেতা ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে AL Buraey বলেন, "He did not assert the right to rule and lead by virtue of his birth or class." পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, রাসূল (স)-কে কেবল আরব জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" তাঁর মধ্যে ছিল সহজাত নেতার শাশ্বত সকল গুণাবলী। অতএব, তাঁকে আধ্যাত্মিক (Charismatic) ও আইনগত (legal) নেতা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কেননা তিনি তাঁর মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুসারীদেরকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতা দ্বারা পরিচালিত করেছিলেন। এ কারণে সারা বিশ্বের মুসলমান তাঁকে তাদের পথ প্রদর্শক, পরিচালক ও নেতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং তার ইন্তেকালের প্রায় পনেরশত বৎসর পরও তাঁর পথ অনুসরণে ও তাঁর নির্দেশ পালনে সচেষ্ট। তার সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সামর্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে William Hocking বলেন, "মুহাম্মদ (স)-এর চিন্তা ও কাজের মধ্যে ছিল অভিন্নতা এবং এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থা। তিনি একদিকে ছিলেন আল্লাহর রাসূল, অন্যদিকে ছিলেন আইন প্রণেতা ও ম্যাজিস্ট্রেট।" সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "মুহাম্মদ (স) ইসলামী কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে আরবজাতির চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে এক মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্য আনয়ন করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় সাফল্য অর্জন ইতিহাসে নজীর হিসেবে চির অম্লান থাকবে।" তাঁর এই মহান আদর্শের প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এখনো সমানভাবে বিরাজমান। আর এজন্যই Michael H. Hart বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "He was only man in history, who was supremely successful on both religious and secular levels."

১১. তত্ত্ব ও প্রয়োগের বাস্তব নিদর্শন : চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে রাসূল (স) মদীনা রাষ্ট্রে সরকার ও প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক মহান ভাণ্ডার সৃজন করেছেন যা ছয়টি

www.pathagar.com

বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ শরীফ) লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর অনেক নির্দেশনা ও কথায় প্রশাসনের মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বিশ্বাস, ন্যায়বিচার এবং দক্ষতার কথা প্রতিভাত হয়েছে। অধিকন্তু, আধুনিক প্রশাসনের ধারণা অনুযায়ী কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যে পরস্পর নির্ভরশীল তা আজ থেকে প্রায় পনেরশ বৎসর পূর্বে রাসূল (স)-এর অনেক হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর একটি হাদিস হচ্ছে, "তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে মন্দকাজ করতে দেখে তবে সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি সে তাতে অপারগ হয় তবে সে যেন মুখ (কথা) দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি সে তাতেও অপারগ হয় তবে সে যেন তাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। তবে এটি হবে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।"

শেষকথা

রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে যদিও আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রশাসন যন্ত্র ছিল না, তথাপি সে সময়ের প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথার্থতা ছিল সন্দেহাতীত। শরীয়া নীতির উপর ভিত্তি করেই এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং যার ব্যাপক ভিত্তি ছিল ধর্মীয় সতর্কতা এবং ব্যক্তির মানবিক গুণাবলি তথা সততা ও সহানুভূতি। এ প্রসঙ্গে আধুনিক লোক প্রশাসন চিন্তাধারায় সাম্প্রতিক ধারণার প্রবক্তা আরব লোক প্রশাসনবিদ আবদেল হাদী (১৯৭০-৭২) বলেন, হযরত (স)-এর সময়ের প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মহানবী (স) এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করা। তিনি এতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কার্যাবলিকে পৃথকভাবে দেখেন নি, বরং একের সঙ্গে অপরকে সম্পর্কযুক্ত করে মানুষকে মহান হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ছিলেন জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত সংরক্ষক ও পরিচালক। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্ব। সে কারণে এটিকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রও বলা যেতে পারে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমীর হাসান সিদ্দিকী মদীনা রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "It was a unique welfare state ever designed by mankind." তাই আমরা দেখতে পাই রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদেরকে চৌদ্দশত বৎসর পরও পথের দিশারী হিসেবে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক লোক প্রশাসনের ধারণায় যে সাম্য, ন্যায়বিচার ও দরিদ্রের জন্য সহানুভূতির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিফলন আমরা মদীনা রাষ্ট্রেই দেখতে পাই। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কর্মে আল্লাহর কোরআন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহ্ অর্থাৎ ইসলামের নীতিমালার প্রয়োগ উপযোগিতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহীন বা সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের

www.pathagar.com

জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের দু'জন লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick এবং James Pollock আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টে লিখেছেন, "Islamic Culture is one of the best basis for a strong and successful Government and a strong and efficient bureaucracy in modern times." অর্থাৎ "ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। তারা আরো লিখেছেন, "The Sharia'h offers the Egyptians (So to all muslim countries) the basic principles and elements upon which they can erect their new democracy and use their leadership qualities citizen's involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery.... in the best interest of the nation as a whole." অর্থাৎ "ইসলামী শরীয়া (কোরআন, সুন্নাহ ও ইজতেহাদ) মিশরীয়দেরকে (অতএব সকল মুসলিম দেশসমূহকে) তাদের নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থের নেতৃত্বের গুণাবলির যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।" কোন মৌলবাদী মুসলিম গবেষক নয় বরং বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ সকল উক্তি বিশ্বের নবজাগরিত মুসলিম জাতিসমূহকে হীনমন্যতা পরিহার এবং আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করবে - এটাই প্রত্যাশিত।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা সর্ম্পকে আলোচনা কর।
[Discuss the administration of Islamic State]

২. ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর।
[Discuss the various aspects of Islamic administration.

৩. ইসলামী প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
[Discuss the features of Islamic administration.]

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

খিলাফত
Khilafat

❐ প্রাক-কথা, খিলাফত-অর্থ ও ব্যাখ্যা, খিলাফতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, খিলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য, খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি

প্রাক-কথা
Introduction

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে (বিশ্বাস স্থাপন করে) এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করবেন। যেমন- তিনি শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।" (নূর-৫৫)

ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো ও কর্মপদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল খিলাফত। খিলাফত মূলত শরীয়তের অপরিহার্য অঙ্গ। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বা সার্বভৌমত্বের বাস্তব রূপায়নের গুরুদায়িত্ব খিলাফতের উপর ন্যস্ত। আর খিলাফতকে মান্য করা বা খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। খিলাফতের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন, নির্বাচন পদ্ধতি, খলিফার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাকার বিষয়ের উপর ধারণা লাভ করা একান্তই শ্রেয়।

খিলাফত- অর্থ ও ব্যাখ্যা
Khilafat-Meaning and Explain

খিলাফত আরবি শব্দ। এটি মূল শব্দ খলিফা থেকে উৎপন্ন। খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। আর খিলাফত অর্থ প্রতিনিধিত্ব। তবে শাব্দিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামী আইনজ্ঞ মহল খিলাফতকে ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অনেকেই খিলাফতকে ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religio-Political institution) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন; অনেকেই আবার ইসলামী শাসনামলের দৃষ্টান্ত টেনেছেন।

মজীদ খাদ্দুরীর ভাষায়, "খিলাফত হল ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামো"। প্রখ্যাত ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **ইবনে খালদুন** মনে করেন, "হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওফাতের পর যারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে তাঁর আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী ধর্মীয় ও পার্থিব

www.pathagar.com

ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাদেরকে খলিফা বলা হয়।" অর্থাৎ খিলাফত এমন একটি প্রত্যয় যা হযরত মুহাম্মদ (স) এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। এরূপ মিশনের কর্ণধার খলিফার প্রধান কর্তব্য হল ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ ও সংরক্ষণ এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ।

আবার ইসলামী চিন্তাবিদ **আল-মাওয়ার্দীর** দৃষ্টিতে, খিলাফত হল সামাজিক ব্যবস্থায় সকল কল্যাণের উৎস এবং সামাজিক আইন-কানুনের ভিত্তি। খিলাফত নবুয়্যতের প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার কারণে রাসূল (স) এর আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রাধান্য লাভ করবে। তিনি আরো বলেন, খলিফার কর্তব্য হল দেশের মধ্যে ধর্মীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম দিকপাল **ইমাম আল গাজ্জালী** (র) খিলাফতকে ইমামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তিনি প্রেরিত নবী-রাসূল (স) কে মানব জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করে মানবকুলের জীবন সংগ্রামে সঠিক পথ প্রদর্শনকে রাজনীতি বা খিলাফত/ ইমামত বলেছেন। তবে ইসলামী প্রশাসনে খলিফা, ইমাম, আমিরুল মু'মেনিন প্রভৃতি উপাধি এক ও অভিন্ন।

খলিফা ও খিলাফত সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে বিশদ আলোচনা বিধৃত আছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল। আল্লাহতায়ালা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে মান্য কর, তাঁর রাসূল (স) কে মান্য কর এবং মান্য কর তাদেরকে যাদের হাতে শাসনকর্তৃত্ব রয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ক্ষমতার অধিকারী। এরপর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে থাক।" (নিসা-৫৯)। রাসূল (স) এরশাদ করেন,

"যে বা যারা তাঁর বা তাদের শাসককে মেনে চলে, সে বা তারা আমাকে মেনে চলে এবং যে বা যারা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে বা তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।"

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "তোমাদের ওপর যদি কোন হাবশী ক্রীতদাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় তবুও তার আদেশ শোন এবং মান্য কর।" (বুখারী)

কোরআনের ঘোষণা এবং রাসূলের হাদিসের আলোকে খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। তবে এই অধ্যায়ের প্রাক-কথা'য় বর্ণিত আয়াতের আলোকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর 'ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ১০৩) খিলাফতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথমত, ইসলাম সার্বভৌম শাসনের পরিবর্তে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব পরিভাষাটি ব্যবহার করে। যেহেতু ইসলামের মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও শাসক পদে অধিষ্ঠিত হবে তাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হতে হবে। সে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াত থেকে অকাট্যভাবে আরো জানা যায় যে, খলিফা বা প্রতিনিধি বানানোর ওয়াদা আল্লাহ মুমিনদের সাথে করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন খিলাফতের

www.pathagar.com

অধিকার প্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে খিলাফত মুমিনদের দেয়া হয় তা সর্বজনীন খিলাফত। কোন ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী, গোত্র বা বর্ণের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক মুমিন স্ব স্থানে আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসেবে প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

ড. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এর মতে, হযরত মুহাম্মদ (স) এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার যে সংস্থার প্রতিভূর উপর বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে বর্তিয়ে ছিল সেই সংস্থার নাম খিলাফত। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান হিসেবে খলিফার নানান কর্তব্যের মধ্যে ধর্মরক্ষা, আইন নির্দেশ ও বিচার, শান্তি রক্ষা, শাস্তি বিধান, রাষ্ট্ররক্ষা, জিহাদ, লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ, সৈন্যদের বেতন ও পুরস্কার প্রদান, রাজকর্মে নিয়োগ ও রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ ছিল প্রধান। (রাজনীতির অভিধান পৃষ্ঠা - ৮৮)

উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সারবস্তু হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর আইন ও রাসূল (স) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী তাদের মর্যাদা হল তারা প্রকৃত সার্বভৌম শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই আখ্যায়িত; আর তাদের পরিচালিত ইসলামী প্রশাসনের কাঠামোগত সর্বোচ্চ স্তর হল খিলাফত।

খিলাফতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
Origin and Evolution of Khilafat

আরবের বুকে হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয় এবং নবীর (স) হিজরতের পর মক্কায় রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে তা ছিল সকল জাতির জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহর রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র কোরআনে নির্দেশিত মৌলিক নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। সেই ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শিক দিকগুলো ছিল আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এ রাষ্ট্র আল-কোরআনের রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসনব্যবস্থার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর আইনের সর্বময় কর্তৃত্ব, সকল মানুষের প্রতি সামাজিক সুবিচার ও সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, ছিল সরকারের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত পরামর্শ ভিত্তিক শূরা, ভাল কাজে আনুগত্য। মুহাম্মদ (স) রাষ্ট্রের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; সেই সাথে তিনি ছিলেন ধর্ম প্রবর্তক, প্রচারক, রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাধ্যক্ষ ও আইন প্রণেতা। কিন্তু রাসূল (স) এর তিরোধানে ইসলাম এক ঘোর অমানিশার মধ্যে পতিত হয়। আরবের বুকে নানা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সম্পর্কে নবীপত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন," যখন মহানবী (স) ইন্তিকাল করেন, তখন আরববাসিরা ধর্মত্যাগ, ইহুদি, খ্রিস্টান মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এবং সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। হযরতের ইন্তিকালের সময় শীতের রাতের বৃষ্টিপাতে উন্মুক্ত মেষ পালকের ন্যায় মুসলমানগণ দুরবস্থায় পতিত হয় যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রা) এর নেতৃত্বে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।" (When the prophet died the Arabs apostatised and christanity and Judaism raised their heads and

www.pathagar.com

disaffection appeared. The Muslims became as sleep exposed to rain an a winter night Through the loss of their prophet Until God United them Undes Abu Bakr" — Sirat (Huillaunes Translation Page-689)

ঐতিহাসিক **খোদা বখস** এর ভাষায়, "The eath of the Prophet (sm) forebeded a dangerous and doubtful career for Islam." এহেন এক ক্রান্তিকালে তাঁরই একনিষ্ঠ সাহাবী ও সহচরদের নেতৃত্বে তাঁরই অনুসৃত মূলনীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন। মুহাম্মদ (স) এর নেতৃত্বে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উক্ত সমাজের প্রত্যেক সদস্যই অবগত ছিল যে ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন। তবে আল্লাহর রাসূল (স) নিজের উত্তরাধিকার বা স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা না দিলেও ইসলাম একটি অধিকতর পরামর্শভিত্তিক, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য খিলাফত দাবি করে যা মুসলিম সমাজের সকলের কাম্য। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে রাসূল (স) এর ওফাতের পর কোন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র বা বাদশাহী কায়েম হয়নি, বা 'জোর যার মুল্লুক তার' (Might is Right) নীতির ভিত্তিতে কেউ বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি কিংবা খিলাফত বা শাসন কর্তৃত্ব লাভের জন্য কেউ নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা তদবীর করেনি। কারণ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সবধরনের রাজা-বাদশাদের শাসন কীর্তির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ নেই। রাসূল (স) এর তিরোধানে উত্তরাধিকার নির্বাচনের প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সাহাবীই স্বাধীন মতামত প্রকাশের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্তির পক্ষে মত দেন। সেই থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার শাসনের ভিত্তি ছিল জনমত নির্ভর। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর খিলাফতের পালাবদলে দেখা দেয় বৈচিত্র্য। প্রথমেই উমাইয়া রাজবংশের হাতে খিলাফতের কর্তৃত্ব চলে যায়। সেখান থেকে আরবীয় বংশ। এভাবে বাগদাদ, কার্ডোভা, কায়রোকে কেন্দ্র করে মুসলিম সাম্রাজ্যে একাধিক খিলাফতের আবির্ভাব ঘটে যার বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

প্রথমত, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ: ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (স) এর তিরোধানের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর প্রতিনিধিরূপে সমগ্র আরব জাহান এবং মুসলিম সাম্রাজ্যে সর্বাধিনায়কত্ব করেন মুসলিম মিল্লাত এ শাসনামলকে খিলাফতে রাশেদা বা 'সুন্নত্যাশ্রয়ী খিলাফত' বলে গ্রহণ করেছে। এভাবে মুসলিম জাহানে খিলাফতের সূত্রপাত হয়। খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা হয়।

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাসূল (স) এর স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)'র নাম প্রস্তাব করলে মদীনার অধিবাসীরা কোন প্রকার চাপ, প্রভাব বা প্রলোভন ছাড়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে পছন্দ করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আর এর মাধ্যমেই ইসলামে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। তবে হযরত আবু বকর (রা) কে খলিফা করার ব্যাপারে কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা পরামর্শ করা হয়নি। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এক গভীর সংকটময় মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্ব পান। রাসূল (স) এর ওফাতের পর একদিকে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদেরকে নবী দাবি করার জন্য তৈরি হয়, অন্যদিকে ভণ্ড নবীর আবির্ভাবও ঘটে। সেই

www.pathagar.com

সাথে ইরান ও রোমকদের সাথে তখন মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। এমনি এক ক্রান্তিকালে হযরত আবু বকর (রা) অসীম ধৈর্য, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ভণ্ড নবীদের শায়েস্তা করেন, জেরুজালেমের কাছে আজনাদাইনে মুসলমানদের নিকট রোমক সম্রাটের পরাজয় ঘটে। ফিলিস্তিন মুসলমানদের অধীনে আসে। এভাবে যুদ্ধ আর বিজয়ের মধ্যদিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক পর্যায়ে তাঁর খিলাফতের অবসান ঘটে।

(২) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ওফাতের মুহূর্তে হযরত ওমর (রা) কে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। এ ব্যাপারে তিনি ওমর (রা) সম্পর্কে একটি ওসীয়ত নামা লিখে তা মসজিদে নববীতে সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন। তিনি বলেন,

"আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি, আমার কোন আত্মীয় স্বজনকে নয় বরং ওমর ইবনুল খাত্তাব কে আমার স্থলাভিষিক্ত করছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" সমবেত সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা তাঁর নির্দেশ শুনব এবং আনুগত্য করব। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃষ্ঠা - ২৭২।)

হযরত ওমর (রা)ও রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ সময় সিরিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত ওমর (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর বীরত্ব গাথা বর্ণনাতীত। তাঁর দীর্ঘ ১০ বছরের শাসনামলে লিবিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান (সিন্ধু) ভারত (গুজরাট) সিরিয়া, ইরাক-ইরানসহ অর্ধ পৃথিবী মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। হযরত ওমর (রা) এর শাসনামল সম্পর্কে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে "অর্ধ পৃথিবী করেছে শাসন ধূলার তকতে বসি।"

(৩) হযরত উসমান (রা) ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা হলেন জামেউল কোরআন হযরত উসমান ইবনে আফফান জিন্নুরাইন (রা)। তবে তিনিই ছিলেন প্রথম নির্বাচকমণ্ডলীর সরাসরি রায়ে নির্বাচিত খলিফা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় জানা যায় যে, সাকীফায়ে বনি-সায়িদার এক মজলিসে হযরত ওমর (রা) হঠাৎ দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা) এর নাম প্রস্তাব করত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন। এ ঘটনায় উপস্থিত অনেকেই মনক্ষুণ্ন হয়; কারও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। ফলে ওমর (রা) এর জীবন সায়াহ্নে হজ্জের সময় এক ব্যক্তি ঘোষণা দিল হযরত ওমরের মৃত্যুর পর আমি অমুক ব্যক্তির বাইয়াত গ্রহণ করব। এতে ওমর (রা) বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে ঘোষণা দেন এখন কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারও হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাহলে সে এবং যার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হবে উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে। এ ব্যাপারে তিনি প্রথম শ্রেণীর ছয়জন সাহাবীর উপর খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে বলেন, "মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি বলপূর্বক আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা কর।' খিলাফত যাতে বংশপরম্পরায় রাজতন্ত্রের আদলে পরিণত না হয় সেজন্য তিনি খিলাফত লাভের উদ্দেশ্যে তৈরি তালিকা থেকে নিজ পুত্রের নাম বাদ দেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট

www.pathagar.com

নির্বাচক কমিটি (কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ) বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে সকলের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। জনমত যাচাইয়ের ফল ছিল হযরত উসমান (রা) এর পক্ষে। এভাবে হযরত উসমান (রা) কে খলিফা নির্বাচন করে তার হাতে সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)ও দীর্ঘ ১০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল নুরিয়া থেকে দোসানা পর্যন্ত। বস্তুত, স্পেনের আন্দালুসিয়া, চীনের কিয়দংশ, সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ, রোডস এবং ক্রীট মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে।

(৪) হযরত আলী (রা) ৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল বিক্ষোভকারী হযরত উসমান (রা) কে কোরআন পাঠরত অবস্থায় শহীদ করে। তাঁর শাহাদত বরণের পর কিছু সংখ্যক লোক হযরত আলী (রা) কে খলিফা নিযুক্ত করতে চাইলে হযরত আলী (রা) বললেন, এমন করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা শূরার সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খলিফা বানাতে চান সেই হবেন খলিফা। অতএব আমরা মিলিত হব এবং এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করব। তিনি আরো বলেন, গোপনে আমার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, হতে হবে মুসলমানদের মতামত অনুযায়ী। সুতরাং অধিকাংশ লোকের মতামত অনুযায়ী হযরত আলীই হলেন ইসলামের চতুর্থ এবং শেষ খলিফা।

উপরিউক্ত খলিফা চুতষ্টয় রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলেন মুহাম্মদ (স) এর সুযোগ্য উত্তরসূরী। মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধনে তারা যে চরম ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বীরত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা ছিল অভূতপূর্বে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, This was period is which the lustre of the prophets life had not ceased to shed its light and Influence over the thoughts and acts of the Caliph". (P.K. Hitti, History of the Arab Page-140). খোলাফায়ে রাশেদার খলিফা চতুষ্টয় মুহাম্মদ (স) এর প্রকৃত আদর্শের অনুসারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। তাদের সময়েই বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী রীতিনীতি ও আইন-কানুন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়, উমাইয়া বংশের খিলাফত : ৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) এর মৃত্যুর পর ইসলামী খিলাফত এক মহাসংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তাঁর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করল আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রা) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব। উত্তরে আলী (রা) বললেন, "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছি না, আবার নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে। তাঁর স্বীয় পুত্রদের অসীয়তকালে জনৈক ব্যক্তি বলল আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন? উত্তরে আলী (রা) বললেন, "আমি মুসলমানদের সে অবস্থায় রেখে যেতে চাই, যে অবস্থায় রেখে গেছেন আল্লাহর রাসূল (স)।" সুতরাং খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং আল্লাহর রাসূল (স) এর সর্বসম্মত মতামত ছিল। খিলাফত হল একটি নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের স্বাধীন মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে বংশানুক্রমিক কর্তৃত্ব বা বল প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। ইসলামের খলিফা চতুষ্টয়

www.pathagar.com

সরকারের আইন বিষয়ক ও নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজের প্রাজ্ঞজনদের পরামর্শ নিতেন। প্রথমত কোরআন-সুন্নাহ, দ্বিতীয়ত সমস্যমান বিষয়ে সৎ ও প্রজ্ঞাবানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলের অবসানে খিলাফতের ক্ষেত্রে শুরু হয় ভিন্ন এক ধারা যা ছিল খোলাফায়ে রাশেদার নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত আলী (রা) এর মৃত্যুর পর আমীর মু'য়াবীয়া জনমতকে যাচাই না করে মুসলিম বিশ্বের স্বঘোষিত খলিফা হয়ে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াযীদকে খলিফা মনোনীত করে ইসলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেন। শুধু তাই না সুচতুর মুয়াবীয়া বিভিন্ন ছল-চাতুরী, অপকৌশল আর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে খিলাফতে নববীকে চিরতরে উৎখাত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের যে আদর্শ স্থাপন করেন তা উমাইয়া বংশ পরবর্তীকালে অনুসরণ করে। অর্থাৎ উমাইয়া বংশের প্রত্যেক খলিফাই হয় স্বীয় পুত্র নতুবা স্বীয় ভ্রাতাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে। ইসলামের নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদার খিলাফতের উপর ব্যক্তিক ইচ্ছার প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রেখে পারিবারিক তথা রাজতন্ত্র কায়েম করলেও রাষ্ট্রপ্রধানের পদবী 'খলিফা' বহাল ছিল কিন্তু তারা দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। উমাইয়া খলিফাগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ভিত্তিতে রাজকার্য পরিচালনা করলেও তাঁরা খিলাফতের দাবিদার হিসেবে রাসূল (স) এর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ককে বেশ গুরুত্ব দিতেন। তবে উমাইয়া খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামল ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল। তিনি তাঁর মেধা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যকর্মকে সঠিকভাবে কাজে লাগান হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তৃতীয়ত, আব্বাসীয় বংশের খিলাফত : ৭৫০-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া বংশের পতনের মাধ্যমে আব্বাসীয় বংশের খিলাফত লাভ। আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আল সাফফাত উমাইয়াদের ন্যায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বংশানুক্রমিক ধারায় স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতাদের খলিফা মনোনয়ন করে। তবে আব্বাসীয় খলিফাগণ ধর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আব্বাসীয় খলিফা আল মুনসূরই সর্বপ্রথম সুন্নী-মর্তাদশের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে ১২৫৮ সালে বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলিফা মুসতাসিম স্বপরিবারে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক নিহত হওয়ার পর দীর্ঘ সাড়ে চার বছর মুসলিম বিশ্বে কোন খলিফা ছিল না। তবে এই শূন্যতার অবসানকল্পে মিশরের মামলুক সুলতান বাইযারস ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় বংশের খলিফা জাহিরের পুত্র মুসতানসিরকে কায়রোতে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। মুসতানসিরের উত্তরসূরীগণ প্রায় আড়াই বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। যাই হোক আব্বাসীয় খিলাফত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন করে শাসক ছিলেন। বাগদাদ, কর্ডোভা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে রাশিয়ার কাজাখ অঞ্চল, ককেশাস ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে । তবে আব্বাসীয় খলিফাগণ নিজেদের খিলাফত ও আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বীনের ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে,

www.pathagar.com

প্রাচ্যের ইসলামী ভূখণ্ডে সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেখানে আব্বাসীয় খিলাফতকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হত। খলিফার স্বীকৃতি লাভ না করা পর্যন্ত কোন মুসলমান রাজ্য বিধিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা করা হত না।

চতুর্থত, উসমানী বংশের খিলাফত : ১৫১৭-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৫১৭ সালে উসমানী সুলতান সেলিম কর্তৃক খিলাফত আব্বাসীয়দের নিকট থেকে উসমানী সুলতানদের হাতে চলে যায়। আবার সুলতান সেলিম খিলাফত উপাধি ধারণ করলে খিলাফত উসমানী তুর্কীদের হাতে চলে যায়। কালক্রমে আরবজাতিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবগণ তুরস্কের সুলতানকে সমর্থন না দিয়ে বরং মিত্রপক্ষকে সমর্থন দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতির ধারায় খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং খিলাফতের অস্তিত্বের প্রশ্নে তৎকালীন ফকীহমহলও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে ১৯২০ সালে উসমানী সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মদ ঘোষণা দেন, "জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রচারণা ইসলামের পরিপন্থী।"

পঞ্চমত, খিলাফতের সমাপ্তি পর্ব : ১৯২১-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইসলামী খিলাফত ভিত্তিক শাসনের বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে তুরস্কের পার্লামেন্ট Grand National Assembly ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা দেয় যে, 'জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং খলিফার কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।' পার্লামেন্টের ঘোষিত এ সিদ্ধান্তের প্রতি খোদ তুরস্কের আলেমদের একাংশ অভিমত প্রকাশ করে যে, খিলাফতের বিলুপ্তি বৈধ, কারণ খিলাফত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে খলিফার কোন করণীয় নেই। সুতরাং ধর্মের সাথে খিলাফতের কোনরূপ সংযোগ থাকা অনুচিত। এই মতের প্রেক্ষিতে বলা হয়, খলিফা মুসলমানদের নেতা ছাড়া কিছুই নয় এবং তিনি রিপাবলিক এর (প্রজাতন্ত্রের) সভাপতি। আলেম সমাজের এ ধরনের অভিমত ও ফতোয়ায় প্রভাবিত হয়ে মোস্তফা কামাল আতার্তুক ১৯২৪ সালে পার্লামেন্টে খিলাফত রহিতকরণ বিল উত্থাপন করলে তা সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাশ হয়। ফলে উসমানী সুলতান আব্দুল মজিদ আফেন্দীকে খিলাফত থেকে পদচ্যুত করে সপরিবারে তাকে সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমে খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে। সে থেকে আজ অবধি মুসলিম বিশ্বে কোথাও খিলাফতের অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

খিলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য
Base or Characteristics of Khilafat

খিলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান আর নবুয়্যতের প্রতিনিধিত্বের জন্যই খিলাফতের জন্ম। সুতরাং রাসূল (স) কোরআন এর আলোকে যেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে চারজন খলিফা তথা খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁর অনুসৃত আদর্শ ও মূলনীতির আলোকে খিলাফত পরিচালনা করেছেন। খিলাফত কতিপয় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তবে খোলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে খিলাফতের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তিমূলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

প্রথমত, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। সমগ্র বিশ্বের একক স্রষ্টা, পালনকর্তা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ হলেন সর্বোচ্চ শাসক। তিনি চরম, চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে মানুষ সেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে তাঁর সকল আদেশ নির্দেশের বাস্তবায়নকারী। প্রতিনিধির কাজ হল সার্বভৌম কর্তৃত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো। অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্ব এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। যেমন আল্লাহর ঘোষণা "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য" (আনআম-৫৭)। "বল, হে আল্লাহ! শাসন কর্তৃত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা শাসনকর্তৃত্ব দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নাও" (ইমরান-২৬)। সুতরাং ইসলামী খিলাফতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল খলিফা বা আমীর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে এর বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল পর্যালোচনা করলে ইহাই প্রতিভাত হয়। "সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁর (আরাফ-৫৪)। মোটকথা, মুসলিম রাষ্ট্রের বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতার সীমারেখা আছে। কারণ মুসলমানদের যাবতীয় আইনের উৎস কোরআন। এরূপ আইনের ব্যাপ্তি জাগতিক আধ্যাত্মিকসহ মানব জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

দ্বিতীয়ত, কোরআন ও সুন্নাহ আইনের প্রধান উৎস। ইসলামী খিলাফতের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস হল পবিত্র মহাগ্রন্থ আল্লাহর বাণী আল কোরআন যা মানবজাতির সকল পথের সঠিক নির্দেশনাস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সাথে মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বিশ্বমানবের মুক্তির অগ্রদূত নবীশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর কর্মময় জীবনলিপি তথা সুন্নাহ। সুন্নাহ বা হাদিস হল মুহাম্মদ (স) এর উপর প্রেরিত ঐশী গ্রন্থের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। রাসূল (স) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে কোরআন ও সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কোরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। যত দিন তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে থাকবে তত দিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।" অর্থাৎ কোরআন-সুন্নাহই হবে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসকের শাসনের মৌলভিত্তি। রাসূল (স) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল (রা)কে ইয়ামেনের কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করা হলে তিনি ইয়ামেনে গমনের পূর্বে রাসূলের (স) সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে মামলা মোকদ্দমার রায় দিবে? মুয়াজ ইবন জাবাল (রা) বললেন কোরআনের বিধি-বিধানের আলোকে। রাসূল (স) বললেন, কোরআনে যদি নির্দেশ না পাওয়া যায় তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স)কে অনুসরণ করব। রাসূল (স) বললেন, সেখানেও যদি কোন বিধান না পাওয়া যায় তখন কি করবে? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এ বক্তব্য শুনে রাসূল (স) মুগ্ধ হলেন এবং আনন্দিত চিত্তে বললেন সকল প্রশংসাই আল্লাহর। তিনি যেন তাঁর রাসূলের প্রেরিত প্রতিনিধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং তাঁর রাসূল যার উপর রাজি-খুশী থাকেন তিনিও যেন তাঁর উপর রাজি-খুশী থাকেন। এভাবে কোরআন এবং সুন্নাহকে আইন প্রণয়নের প্রথম উৎস হিসেবে গণ্য করে খোলাফায়ে রাশেদার কর্ণধারগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

তৃতীয়ত, নির্বাচন ভিত্তিক। ইসলামী খিলাফত কোন বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকার

www.pathagar.com

ভিত্তিক নয়। বরং খলিফা নিযুক্ত হবেন নির্বাচকমণ্ডলীর রায়ে। রাসূল (স) বলেন, আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে এ সরকারের পদমর্যাদা দেই না, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে। (মুসলিম কিতাবুল ইমারাত, তৃতীয় অধ্যায়)। তাই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রকাশ্যে জনগণের নিকট বাইয়াত গ্রহণ পূর্বক খলিফা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) তাঁর ওফাতের সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তির লক্ষ্যে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন, 'মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা কর।' প্রসঙ্গত কারণে উল্লেখ্য যে, খিলাফত যাতে স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয় সে জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে ওমর (রা) নিজ পুত্রের নাম বাদ দিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী (রা) কে খলিফা করতে চাইলে তিনি বলেন, "গোপনে আমার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তা হতে হবে মুসলমানদের সম্মতির ভিত্তিতে" (আততাবারী, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৫০)। সুতরাং খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূল (স) এর প্রিয় সাহাবীদের সর্বসম্মত অভিমত হল এটি একটি নির্বাচক ভিত্তিক পদমর্যাদা, মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থত, শূরাভিত্তিক সরকার। খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফা চতুষ্টয় সরকারের নির্বাহী তথা প্রশাসনিক এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজের প্রভাবশালী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। শূরা বলতে সরকারের পরামর্শ সভাকেই বুঝায়; যার ভিত্তিতে সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রত্যেক খলিফাই উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে কোরআন, সুন্নাহ, শীর্ষস্থানীয় সৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতেন। আল্লাহ বলেন, "তাদের (মুসলমানদের) কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।" (শূরা – ৩৮) "(হে নবী!) কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন"(ইমরান-১৫৯)। এরূপ পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূরার সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে।

পঞ্চমত, বাইতুল মালের যথাযথ ব্যবহার। খিলাফতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকারের বাইতুল মাল আল্লাহ ও জনগণের আমানতস্বরূপ। অবৈধপন্থায় বাইতুল মালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো অনুচিত। খলিফা অন্যায়ভাবে তা থেকে কিছু গ্রহণ ও ব্যয় করবে না। কারণ তা না হলে খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। রাজতন্ত্রে রাজা-বাদশাহরা জাতীয় ভাণ্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে ইচ্ছামত তা ভোগ করত। এ সম্পর্কে ওমর (রা) এর একটি ভাষণের অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এই সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুকেই আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। ন্যায়ভাবে গ্রহণ করে তা অন্যায়ভাবে প্রদান এবং বাতিল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। এতিমের সম্পদের সাথেও আমার অনুরূপ সম্পর্ক। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করব না। অভাবী হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করব। (ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭)

ষষ্ঠত, আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য। খোলাফায়ে রাশেদার কোন খলিফাই আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকেরা যেমন আইনের অধীন তেমনি রাষ্ট্রপ্রধান খলিফাও

www.pathagar.com

সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আইনের অধীন। এক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, মুসলিম-অমুসলিম, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, বর্ণ আভিজাত্য বিবেচ্য বিষয় নয়। খলিফার কাছে সকলেই সমান এবং সকলেই সমান আইনী সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকারী, এমনকি একজন সাধারণ নাগরিকও খলিফার বিরুদ্ধে মত প্রকাশে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সপ্তমত, পক্ষপাতমুক্ত শাসন। খিলাফত ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষপাতমুক্ত শাসনব্যবস্থা। ইসলামে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগেও বংশ, বর্ণ, গোত্র, আভিজাত্য সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে সকলের সাথে সমান আচরণ করা হত; অর্থাৎ কারো প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করা হত না। রাসূল (স) এর তিরোধানের পর আরবের বুকে নানা বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, খ্রিস্টবাদ, ইহুদীবাদ নবুয়্যতের দাবিদার প্রভৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে; ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তা কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি যখন মদীনায় বাইয়াত করেন তখন অনেকেই তাঁর বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বরং চারজন খলিফাই নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতমুক্ত আচরণের মাধ্যমে সকল ভেদাভেদের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারি চাকরি এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সকল গোত্রের জন্য সমান ছিল।

অষ্টমত, জবাবদিহিমূলক। খিলাফত একটি জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান। রাসূল (স) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্র এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ছিল বাধ্যতামূলক। এই দুই সরকার ব্যবস্থায় তিনটি পদ্ধতিতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হত। (১) অধঃস্তন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করবে। (২) প্রত্যক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহি করবে। এবং (৩) শেষ বিচার দিবসে কৃতকার্যের জন্য মহান প্রভু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (স) বলেন, "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা যিনি সকলের উপর শাসক হন, তিনিও দায়িত্বশীল, তাকেও তাঁর সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে" (মুসলিম কিতাবুল ইমারত, অধ্যায়-৫)। হযরত ওমর (রা) বলেন, "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি ছাগল ছানাও (অভুক্ত থেকে) ধ্বংস হয়, তবে আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।" (কানযুল উম্মান, পঞ্চম খণ্ড)

নবমত, সমালোচনা ভিত্তিক। আমীর সমালোচনার উর্ধ্বে নন। প্রত্যেকেই তার সমালোচনা করতে পারবে। অর্থাৎ আমীরের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। সমালোচনার ভিত্তিতে আমীর বা খলিফাকে পদত্যাগও করানো যেতে পারে। কারণ আমীরের মর্যাদা একজন সাধারণ নাগরিকের মতই। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও দায়ের করা যাবে।

দশমত, গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের যোগ্যতাসম্পন্নদের পরামর্শ গ্রহণ, সমালোচনা করার অধিকার, খলিফাকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার অধিকার ইত্যাকার বিষয়গুলো গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং খিলাফত হল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সকলের সমান-সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থায় রয়েছে।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের ৩০ বছর পর্যালোচনা করলে আমরা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু তাদের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে খিলাফতের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা পুরোপুরি খোলাফায়ে রাশেদার অনুসারী ছিল না। তাই সময় এসেছে বিশ্বব্যাপী রাসূল (স) তার আদর্শ অনুযায়ী এবং খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত নীতির আলোকে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব মানবের ইহজাগতিক মুক্তি ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করার।

খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি
Election Process of Caliph

খিলাফত একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান। ইহা মূলত নবুয়্যতের প্রতিনিধি। খিলাফত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এ নির্বাচন হবে মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা সর্বসম্মতিক্রমে। ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আল মাওয়ার্দী খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

এক, নির্বাচকমণ্ডলীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন; এবং

দুই, পূর্ববর্তী খলিফা দ্বারা মনোনয়ন।

উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির ব্যাপারে ফকীহ মহল ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে, দেশের শহরাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় নির্বাচকদের অংশগ্রহণে এই নির্বাচন হতে হবে। আবার কারো মতে, নির্বাচক মণ্ডলীর ন্যূনতম সংখ্যা পাঁচ জন হওয়া শ্রেয়। যেমন- হযরত আবু বকর (রা) এর নির্বাচন প্রথমে পাঁচজনের ইজমার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। আবার ওমর (রা) ওফাতের সময় ছয় জনের নির্বাচন কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাদের মধ্যে থেকে হযরত উসমান (রা) কে খলিফা নির্বাচিত করেন। কিন্তু অপর একদল ফকীহ মনে করেন, নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা তিন জন হলেও চলে। তবে আল মাওয়ার্দী মনে করেন খলিফা নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীকে খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে এবং নির্বাচিত খলিফার হাতে সকলকেই বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। অপর দিকে ইমাম আল গাজ্জালী বলেন, মুসলিম উম্মাহর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইমামত (খিলাফত) অপরিহার্য এবং ইমাম (খলিফা) নির্বাচন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। তিনি বলেন, "ইমাম আহলে হালাল ওয়াল আকদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জনসাধারণের বাইয়াত গ্রহণ করে ইজমার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।"

নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতা

খলিফা নির্বাচনে যারা সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, সেই ভোটার তথা নির্বাচকমণ্ডলীর কি কি পূর্বযোগ্যতা থাকা বাঞ্ছণীয় সে সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা সুস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

প্রথমত, আল মাওয়ার্দীর মতে এক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর কমপক্ষে ত্রিবিধ গুণ থাকা আবশ্যক।

১. ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা;

২. নেতৃত্বের শর্তাবলি উপলব্ধির ক্ষমতা; এবং

www.pathagar.com

৩. বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা।

দ্বিতীয়ত, ফকীহমহলের অনেকেই মনে করেন, খলিফা নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে অবশ্যই শিক্ষিত, দ্বীনদার এবং খিলাফতের পদমর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে।

খলিফার পূর্ব যোগ্যতা

খলিফার পূর্ব যোগ্যতা সম্পর্কে আল মাওয়ার্দী এবং ইমাম আল গাজ্জালী ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত, আল মাওয়ার্দীর মতে, খলিফা হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত সাতটি গুণের অধিকারী হতে হবে-

১. ভাল-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা;

২. এমন বিদ্বান হওয়া যার মাধ্যমে ন্যায়নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে চিন্তা করতে সক্ষম;

৩. পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বাক শক্তির শুদ্ধতা;

৪. শরীরের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের সুস্থতা ও সবলতা;

৫. এমন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-যার দ্বারা শাসিতের পথ প্রদর্শন এবং দেশকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে;

৬. সাহসিকতা ও অসীম বীরত্ব যার মাধ্যমে দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত রাখা যায়; এবং

৭. কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া;

দ্বিতীয়ত, ইমাম আল গাজ্জালী খলিফা হওয়ার প্রয়োজনীয় গুণাবলীকে প্রথমে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. দৈহিক গুণাবলি এবং ২. নৈতিক গুণাবলি।

দৈহিক গুণাবলি

১. বয়ো:প্রাপ্তি, ২. পুরুষ, ৩. সুস্থ মস্তিষ্ক, ৪. স্বাধীন, ৫. কুরাইশ বংশীয় এবং ৬. প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির অধিকারী হওয়া।

নৈতিক গুণাবলি

১. সাহসিকতা, ২. প্রশাসনিক দক্ষতা ৩. খোদাভীরু তথা তাকওয়া এবং ৪. শরীয়তের জ্ঞান।

খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় একজন খলিফা নির্বাচিত হয়ে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবেন, তাহল

১. ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সমাজের বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান সংরক্ষণ, পরিচালনা ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা।

২. ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান জারী করা এবং তদানুযায়ী সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও মামলা-মোকাদ্দমার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করা।

৩. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জনগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. শরীয়তের অপরাধের শাস্তি, সংক্রান্ত বিধানগুলো জারি করা, যাতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাগুলো পালিত হয় এবং মানুষের অধিকার ব্যাহত না হয়।

৫. শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সীমান্তে টহল জোরদার করা এবং

www.pathagar.com

মুসলিম ও জিম্মীদের জীবন ও সম্পদকে ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ করা।

৬. ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। যদি তারা এই আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা জিম্মী হিসেবে থাকে।

৭. কোন প্রকার ভয়-ভীতি, জোরজবরদস্তি কিংবা অত্যাচার ছাড়াই শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় যাকাত,উসর, খারাজসহ যাবতীয় কর আদায়ের ব্যবস্থা করা।

৮. বায়তুল মালের যথাযথ ব্যবহার করা এবং বায়তুল মালের ন্যায্য দাবিদারদের জন্য তা ব্যয় করা। এ ব্যাপারে অপব্যবহার বা কৃচ্ছ্র সাধন না করা।

৯. খলিফা সমাজের ধার্মিক ও ঈমানদার লোকদের নিজের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং সৎ ও বিশ্বস্তদের মধ্য থেকে শাসনকর্তা ও কর আদায়কারী নিযুক্ত করবেন।

১০. নিজেই সরকারি বিষয়সমূহের দেখাশুনা করা এবং সর্বপ্রকার ঘটনা সম্পর্কে সজাগ থাকা যাতে সফলভাবে উম্মাহর পরিচর্চা ও ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়।

উপরে উল্লিখিত কর্তব্যগুলো আল মাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হল। কিন্তু ইমাম আল গাজ্জালীর মতে, ইমাম বা খলিফার দায়িত্ব হল যে কোন মূল্যে জনগণকে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করা। তার মতে, "অরাজকতার ভয়াবহ পরিণতির চেয়ে স্বৈরাচারী শাসকের কিছু পরিমাণ অত্যাচার সহ্য করা মন্দের ভাল হিসেবে শ্রেয়। সেই সাথে ইমাম আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জনগণের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. খিলাফত বলতে কি বুঝায়? খিলাফতের উৎপত্তি ও বিকাশধারা আলোচনা কর।
[What is mean by Khilafat? Discuss the origin and development of Khilafat.]

২. খিলাফতের ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
[Describe the basis and features of Khilafat.]

৩. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় খিলাফতের নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[Describe the process of election of Khilafat of Islamic political system.]

৪. ইসলামী প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
[Discuss the features of Islamic administration.]

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলামে নেতৃত্ব
Leadership In Islam

❒ প্রাক-কথা, নেতৃত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা, নেতৃত্বের ইসলামী ধারণা, নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম চিন্তকদের ধারণা

প্রাক-কথা
Introduction

আধুনিক বিশ্ব যে রাশি রাশি সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলায় সচেষ্ট তার শিরোভাগে পরিপূর্ণ রয়েছে নেতৃত্ব, সুব্যবস্থাপনা ও সুশাসন। আজকের সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে নেতৃত্বের সংকট তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ব ক্রমেই অনিশ্চিত সম্পর্ক নিরাপত্তাহীন এবং উদ্বিগ্ন হচ্ছে এবং মানব জীবন এমন হয়েছে যেমন থমাস হবস দু'শতাব্দী পূর্বে বলেছিলেন "নিঃস্ব, দীন, ঘৃণ্য, নির্মম এবং সংকীর্ণ"। সামাজিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তি এবং সম্পদের অসম প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, হত্যা এবং ধ্বংস নিত্য অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যাপকভাবে বস্তুগত উন্নতিতে এবং প্রকৃতির অপরিমেয় দান ব্যবহারের মাধ্যমে আরাম-আয়েশের আচরণে এবং সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধনে অবদান রেখেছে কিন্তু এটা একই সময়ে মানব জীবনকে আরো বেশি অহমিকাবাদী ও বস্তুবাদী করে তুলেছে, আনন্দ এবং শান্তি দুরাশা হয়েছে, সহযোগিতা ও সহ-অবস্থান আরো বেশি জটিল ও কঠিন হয়েছে এবং মানব সম্পর্ক আন্তরিক ও আন্তর্জাতিকতার চেয়ে আরো বেশি স্বার্থান্বেষী ও কৃত্রিম হয়েছে।

যদিও গত দু'শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্ময়কর সাফল্য এবং নজিরহীন অগ্রগতি সাধন করেছে এবং একুশ শতকে আরো সাফল্য অর্জন করবে বর্ধিত উৎপাদন, সহজ যোগাযোগ আরামদায়ক জীবন যাপন ইত্যাদিতে; তবুও সুখ, শান্তিপূর্ণ জীবন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হলেও বাস্তবে বেশি বেশি ব্যবধান রয়ে গেছে। মানব জীবন এবং সম্পদের দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা এবং অনিশ্চিয়তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবকুল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং সরকার ও ছোট রাষ্ট্রগুলো তাদের ধারাবাহিকতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা/ সংহতিতে সার্বক্ষণিক হুমকির

www.pathagar.com

মধ্যে পতিত হচ্ছে। যত বেশি বস্তুগত উন্নয়ন তত কম মূল্যবোধের অভ্যাস – গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, সমতা, সহযোগিতা এবং সহাবস্থান বড় লোকদের এবং বৃহৎ গোষ্ঠীগুলোর দম্ভোক্তিতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বৈধ বা অবৈধ যে কোন পন্থায় সম্পদশালী ও ধনীরা প্রভাব খাটায় এবং নেতার অবস্থান দখল করে যেখানে গুণ, দক্ষতা, অবদান এবং মানবতার প্রতি সেবা কোন মাপকাঠি হিসাবে বিবেচ্য হয় না। আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কে ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো ধনী এবং বৃহৎ শক্তির নিত্য হুমকি ও প্রভাবে থাকে যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলো পরাশক্তির প্রভাব ও হুমকিতে থাকে। এটা একটা নিত্য দিনের ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র অবধি কেউই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত নয় এমনকি পরাশক্তিগুলোও নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ও জারি রাখার জন্য নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকে থাকার এবং বৃহৎপরাশক্তির প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান সংগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা চলছে। জাতীয় পর্যায়ে ছোট ও দুর্বলরা সমকক্ষ এবং শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং সমকক্ষ ও শক্তিশালীরা শ্রেষ্ঠ হবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সরকারি দল ক্ষমতা চালাতে চাইলেও বিরোধীরা তাদেরকে উৎখাত করতে চায়। সংশ্লিষ্টরা এগুলো বন্ধ করতে হয় অসমর্থ না হয় সমর্থহীন বা অনিচ্ছুক। যদি এই বিষয়গুলো এভাবে চলতে থাকে তাহলে বিশ্ব মানব সভ্যতা ধ্বংস ও বিলোপ সাধনের দিকে অগ্রসর হবে যেমন একজন সমাজবিজ্ঞানী একদা মন্তব্য করেছিলেন, " সভ্যতার চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্বরতা এবং ধ্বংসের দিকে।" এটা এখন সচেতন মানুষের সর্বপ্রথম উদ্বেগের বিষয় কিভাবে এ সকল বিষয় সভ্য জগতে ঘটে? এ সকল পর্যায়ে ভাল নেতৃত্বের অনুপস্থিতি ও সংকট অন্যান্য সকল বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে সাধারণভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, "কেউ কেউ এমন আছেন যারা নেতা হয়ে জন্মায়, কেউ কেউ নেতৃত্ব অর্জন করে, আবার অনেকের উপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়।" নেতৃত্ব একটা সর্বজনীন পর্ব। জীবনের সকল দিকে সকল পর্যায়ে সামাজিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, খেলাধুলায় নেতার প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা আছে। নেতৃত্বের গুণাবলী ও ধারণা পরিবর্তনশীল এবং দেশে দেশে এর ভিন্নমাত্রা লক্ষণীয় কিন্তু এর অনুপস্থিতি অচিন্তনীয় যদিও কর্তৃত্ববাদী, গণতন্ত্রী এবং হস্তক্ষেপমুক্ত নেতৃত্ব থাকতে পারে। কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) রীতিতে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেতার উপর ন্যস্ত থাকে আর গণতান্ত্রিক (Democratic) পদ্ধতিতে নেতার এবং অনুসারীদের পারস্পরিক পরামর্শ ও আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত বা কাঠামো গড়ে তোলে। সাধারণভাবে নেতৃত্ব তিনটি মৌলিক উপাদান সংশিষ্ট - নেতারা যারা অন্যদেরকে পরিচালনা করে ও দিক নির্দেশনা দেয়, অনুসারীদের দল যারা এই জাতীয় পরিচালনা মানে এবং জবাব দেয় এবং সত্য ও অনুসারীদের সমন্বয়বিধানের মাধ্যমে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন কিভাবে নেতারা ক্ষমতা অর্জন করে, খ্যাতি ও প্রভাবের অবস্থানে পৌঁছায় এবং নেতৃত্বের অবস্থান গ্রহণ করে। শিক্ষা, সম্পদ, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, দক্ষতা, সামাজিক সেবা, মানবতার প্রতি অবদান, চরিত্র এবং কার্যাবলী এগুলোর বেশিরভাগ বা অনেক কিছু গুণ আজকের নেতাকে তৈরি করে। নৈতিক এবং ধর্মীয় চিন্তাচেতনা আধুনিক নেতৃত্বের গুণাগুণে অংশত বা পুরোপুরি অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

নেতৃত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা
Western Concept of Leadership

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণে নেতৃত্বকে একটি সামাজিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নেতৃত্ব সমাজজীবনের লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম পন্থা বা মাধ্যম। নেতৃত্বের গুণে একটি জাতি বা দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের কারণে কোন জাতির জীবনে নেমে আসতে পারে ঘোর অমানিশা-দুর্দশা। নেতৃত্বের কাম্য গুণাবলি সমাজের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। যেমন- কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young)-এর ভাষায়, "নেতৃত্ব হল ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যদের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।" কিন্তু পাশ্চাত্যের কোন কোন চিন্তাবিদ নেতৃত্বকে নৈতিক ক্ষমতা হিসেবে দেখেছেন। এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার (Alvin W. Gouldner) বলেন, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সে নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে।" আবার নেতৃত্ব বলতে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনার উপায়কে বুঝায়। সি আই বার্নার্ড-এর মতে, "নেতৃত্ব হল ব্যক্তিবর্গের এমন গুণ যার মাধ্যমে তাঁর সংগঠিত কর্ম উদ্যোগে জনগণের অথবা তাদের কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।" বস্তুত, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলি হিসেবে আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সাহস, আত্মবিশ্বাস, সদাচরণ, দূরদৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, প্রতিভাকে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু রবার্ট মিশেলস মনে করেন, "নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।" রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই সম্মোহনী সম্পন্ন, বিশেষজ্ঞসুলভ হতে হবে। তবে নেতৃত্বের পাশ্চাত্যের ধারণার সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

নেতৃত্বের ইসলামী ধারণা
Islamic Concept of Leadership

নেতৃত্ববিষয়ক সংজ্ঞা, গুণাগুণ, পদ্ধতি এবং বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য এবং নেতা-অনুসারী সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী ধারণা পাশ্চাত্য ধারণার তুলনায় মৌলিকভাবে পৃথক। ইসলামে নেতৃত্ব হচ্ছে একটা আস্থা যা অনুসারীরা স্থাপন বা অর্পণ করে থাকে। তারা তাদের মধ্য থেকে কোরআন ও শরীআতের আলোকে সবচেয়ে বেশি গুণী মনে করে। এইভাবে ইসলামে নেতৃত্ব নেতা অনুসারীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ দায়িত্বের জন্য সহাবস্থান; যদি নেতা ইসলামের বিধান মতে এবং অনুসারীদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তবে তার নেতৃত্ব বাজেয়াপ্ত হতে পারে এবং অনুসারীদের তার প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং নতুন নেতা মনোনীত করে নেয়। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াতে নেতৃত্ব বা ইমামতির সাধারণ ও মৌলিক নীতিগুলো, গুণাবলিসমূহ শাসনের বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্বসমূহ, অনুসারীদের সাথে তাদের সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ৪২ নং সূরার ৩৮ নং আয়াতে, ৪ নং সূরার ৫৮ নং আয়াতে, ৩ নং সূরার ১৫৯ নং আয়াতে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বহার ১৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে" (তাওয়াক্কুল) এবং একই আয়াতে নেতাদের গুণাবলি নির্ধারিত রয়েছে যেমন- আল্লাহকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর কিতাবসমূহে এবং নবী-রাসূলদের উপর ব্যবহারে নম্র ও ভদ্র হওয়া, পারস্পরিক বিষয়ে অনুসারীদের সাথে পরামর্শ যদিও কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতি রেখে নেতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং অনুসারীদের দোষের ব্যাপারে দয়ালু হবেন আর আল্লাহর ক্ষমার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেবেন। পবিত্র কোরআনে নেতাদের এবং অনুসারীদের বাধ্যবাধকতার উপর বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যেগুলো আল্লাহর প্রতি বাধ্যবাধকতা, মুসলিম নেতাদের এবং অনুসারীদের প্রতি আর অনুসারীদের নিকট থেকে উপদেশ নেয়ার ব্যাপারে।

অতএব, ইসলামী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নেতার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে সকল বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি যার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলো রয়েছে, এটা উম্মাহর দ্বারা নেতার উপর অর্পিত আস্থা; নেতৃত্ব খুঁজে নেয়া, উচ্চাভিলাষী হওয়া অথবা আত্মস্থ করতে পারবে না। এটা দেয়া হবে, নেতা ও অনুসারীদের পারস্পরিক পরামর্শে, এবং এটা প্রত্যাহৃত হবে যদি নেতা কোরআন সুন্নাহ এবং জনগণের মঙ্গল অনুসারে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া নেতার বাধ্যবাধকতা ও অনুসারীদের কর্তব্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আলোকে হযরত আবু বকর (রা) যিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর পর জনগণের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন; তার ঐতিহাসিক ভাষণ স্মর্তব্য, যাতে তিনি বলেছিলেন, "হে জনগণ! আমাকে তোমাদেরকে শাসন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই, যদি আমি ভাল কাজ করি, আমাকে সহযোগিতা করো ও সমর্থন দিও কিন্তু যদি আমি বিচ্যুত হই আমাকে সর্তক করে দিও। আমাকে মান্য করো যতক্ষণ আমি আল্লাহকে মানি, কিন্তু যদি আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য থাকা নিষ্প্রয়োজন।" তাঁর এই মহানুভব ভাষণ সহজগম্য ও আত্মবিশ্বাসী ছিল; তার যথার্থতা ও সামর্থ্যের কারণেই তিনি শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন না বরং তিনি নবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সবচেয়ে নিকটবর্তী অনুসারী ছিলেন এবং ইসলামের স্বার্থে বা কল্যাণে সবকিছু কোরবানী করেছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন।

মধ্যযুগের কিছু মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদ ইসলামী নেতৃত্বের ধারণার আলোকে নেতা বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। নেতৃত্বের ধারণার জন্য নেতার গুণাবলি ও কার্যাবলির জন্য এটা অতীব প্রয়োজন। তাদের মধ্যে আল-ফারাবী, আল-গাজ্জালী এবং ইবনে খালদুন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম চিন্তকদের ধারণা
Concept of Muslim Thinkers about Leadership

আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০) যিনি একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তক। অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে রাজনীতি ও শাসনের কলাকৌশলের উপর স্বল্প সংখ্যক বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সিয়াসাতুল মদিনা, আয়াউহলিল, মদীনাতুল ফজিলাহ

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য যেগুলোতে তিনি নেতৃত্বের ধারণা, নেতার প্রয়োজনীয়তা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ভাল নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তার মতে, মুসলিম রাষ্ট্রের একজন নেতার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, সুপ্ত ও অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হতে হবে, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, ভাল স্মৃতিশক্তি এবং ভাল বোধগম্যতা, সমস্যার গভীরে যাবার ক্ষমতা ও জনগণের জন্য গভীর ভালবাসা, অন্যদের কাছে পৌঁছানো ও উদ্বুদ্ধ করার যোগ্যতা, শঠতা পরিহার করা, অন্যায় আকাঙ্ক্ষা, খাওয়া দাওয়া পান করা ও যৌন আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সত্যের প্রতি ভালবাসা আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা এবং শক্তি ও অত্যাচারের প্রতি অপছন্দ, ভয় অথবা অনুগ্রহ ব্যতীত সাম্যের ভিত্তিতে বিচার করার ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হওয়া। তিনি এই মত তুলে ধরেন যে যদি এই সকল গুণাবলি একজন মানুষের মধ্যে দৃষ্টিগোচর না হয় তবে একদল লোক থাকতে পারে যারা সম্মিলিতভাবে এই গুণাবলি ধারণ বা অর্জন করে মানুষের কল্যাণের জন্য তারা সম্মিলিতভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করবে।

ইমাম আল-গাজ্জালী (১০৫৮ – ১১১১) তার বিখ্যাত গ্রন্থ তাবরুল মাছবুক -এ একজন আদর্শ ও ফলপ্রসূ শাসকের (নেতা) যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং যার অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্বে রাষ্ট্র বস্তুগতভাবে ও অধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভ করবে, তার প্রয়োজনীয় গুণাবলিসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি ভাল শাসকের জন্য গুণাবলিসমূহ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেন। যেমন- বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি, জনগণের প্রতি ভালবাসা, দূরদৃষ্টি, জিনিসের সঠিক অনুপাত, মনের কূটনৈতিক ঝোঁক, নিত্য সংবাদের সাথে ভাল জানাশুনা এবং অতীত বর্তমান শাসক ও রাজাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তার মতে, নেতা পৃথিবীতে খোদার ছায়ার প্রতিফলন ঘটাবে যখন এই সকল গুণাবলি তার মধ্যে প্রতিভাত হবে।

নেতৃত্ব বা খিলাফত বিষয়ে **ইবনে খালদুন** (১৩৩২ – ১৪০৩) এর ধারণা তার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ কিতাব-আল ইবার-এ আলোচিত হয়েছে। খলিফার গুণাবলি আলোচনার পূর্বে তিনি প্রথমে বলেন যে রাষ্ট্রের চরিত্র রাষ্ট্রের লক্ষ্য শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক দ্বারা জানা যায়। শাসিতের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং নেতা বা শাসকের মধ্যে তা করার সামর্থ পূর্ণমাত্রায় থাকতে হবে। ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য এবং শাসক বা নেতার দ্বৈত ভূমিকায় জাগতিক জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবন যা কেবল আল্লাহ নিজেই পরিচালনা করবেন সেটার ভাল-মন্দ নির্ভর করবে শাসক-শাসিতের গুণাগুনের উপর। ইবনে খালদুন নেতার মনোনয়নের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন যেটা মানুষ হিসাবে অনুসারী বা শাসিতের মতৈক্যের (ইজমা) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইবনে খালদুনের মতে নেতা বা খলিফা অবশ্যই নিম্নোক্ত মৌলিক গুণাবলির অধিকারী হবেন। যেমন — কোরআন ও শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, আইনের (ইজতিয়াদ) ব্যাখ্যা করার সামর্থ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন, অবশ্যই দপ্তর ও পুরস্কার বন্টনে ন্যায়বিচার কারার মত সামর্থ ও দক্ষতা থাকতে হবে, যে কোন আগ্রাসনে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, জনগণকে অংশগ্রহণের জন্য এতে উদ্বুদ্ধ করার সামর্থ থাকতে হবে এবং পরিশেষে তাকে অবশ্যই শাসন করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য হতে হবে।

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে যেগুলো উল্লেখ করেছেন আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য ও গুণাবলি সেগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশের কেউই (কেউ কেউ সৌদি আরবকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবী করেন) যা ইসলাম আদেশ করেছে তা পূরণ করে না।

উপরের আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা, রীতি, গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নেতা-অনুসারী সম্পর্কে একটা লক্ষণীয় ও মৌলিক পার্থক্য আছে। ইসলামী ধারণা বস্তুবাদের চেয়ে আরো বেশি নৈতিক, ন্যায়পরায়ণ ও আত্মিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামে আদেশকৃত ও মুসলিম ব্যক্তিদের পরস্পর সাজানো নেতৃত্বের গুণাবলিগুলো আজকের মুসলিম বিশ্বের নেতারা আংশিকভাবে গ্রহণ করছে; অমুসলিম (পাশ্চাত্য) দেশের নেতারা মোটেই অনুসরণ করছে না। বর্তমান বিশ্ব সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও সুদূরপ্রসারী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব অনুভব করছে। সৎ, দক্ষ নেতৃত্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন তথা সুশাসনের পূর্বশর্ত (Pre-condition of all over development)। তাই পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষত বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাস করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে বিকল্প ও সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এই সকল কিছুর প্রেক্ষাপটে এখন যেটা আকাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে নেতারা অকপটে যা বলছেন তার অভ্যাস। এই আলোকে মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের সকল পার্থক্য দূরে রেখে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসা উচিত, তাদের নিজের সমাজে ও রাষ্ট্রে নেতৃত্বের ইসলামী রীতি ও আদর্শ গ্রহণ ও পূর্ণ বাস্তবায়ন করা যা অন্যেরা অনুসরণ করতে পারে। কারণ ইসলামের আবেদন সর্বজনীন।

বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ'র পর্যবেক্ষণ এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যদি ইসলাম কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী কার্যকর হত, এবং যদি বিশ্বকে একক নেতৃত্বের পদতলে একীভূত করা যেত, তখন মুহাম্মদ হত বিভিন্ন বিশ্বাস, মতবাদ ও ধারণার মানুষদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে শান্তি ও সুখে চালানোর সর্বোত্তম যোগ্য ব্যক্তি।" (If Islam would have been practised in the line prescribed by Quran and Shariah and if the world could be united under one leadership then Mohammad would have been the best fitted man to lead the people of various creeds, dogmas and ideas to paece and happiness.)

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. নেতৃত্ব কি? নেতৃত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is leadership? Explain the western concept about leadership.]

২. নেতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[Explain the concept of Islamic leadership.]

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও দায়িত্ব অবস্থান
The Status, Position and Duties of Woman in Islam

❒ প্রাক-কথা, নারীর মর্যাদা-আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত, সামাজিক প্রেক্ষিত, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত, মেয়ে হিসেবে পরিবারে নারীর স্থান, বোন হিসেবে নারীর অবস্থান

আল কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালার সর্বজনীন ঘোষণা "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে (প্রভু-প্রতিপালককে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি, আর এ উভয়ের থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আল-ইমরান)

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ (আদম আ) ও একজন নারী (হাওয়া আ) থেকে সৃষ্টি করেছি" (হুজুরাত-১৩)। "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেইনা তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে" (আল-ইমরান-১৯৫)। রাসূল (স) বলেন, "নারীরা পুরুষদেরই অংশ।"

প্রাক-কথা
Introduction

"Islam has given woman rights and privileges which she has never enjoyed under other religious or constitutional system" (Hammudah Abdalati, Islam in Focus P-184)

একথা শাশ্বত সত্য যে, "Islam is not a mere religion, but also a complete and comprehensive code of life". ইসলাম কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা দেশকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক উত্তম জীবন দর্শন এবং একটি পূর্ণ জীবনসংহিতা, জীবন যাপনের এক সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর এর বুনিয়াদ রচিত। পবিত্র কোরআন ইসলামী আদর্শবাদের এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল আধার বা উৎস।

ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদিও কোন কোন মুসলিম সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিচ্ছে না। তথাপি কুরআন এবং হাদিস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, একমাত্র

www.pathagar.com

ইসলামই নারীকে আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনুপম মর্যাদা দিয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

১. নারীর মর্যাদা - আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত

প্রথমত, ইসলামে কোন আদি পাপের ধারণা নেই এবং এর দায়ভার বিবি হাওয়া (আ) থেকে সকল মহিলাদের উপর আসবারও কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, যখন খ্রিস্টান বিশ্ব নারীর আত্মা আছে কি-না এবং নারী মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কি-না এই বিতর্কে ছিল, তখন ইসলামই ঘোষণা করেছে যে, প্রথম মানব-মানবী এক রুহ (Essence) থেকে সৃষ্টি।

বৃহত্তর মানবজীবনে নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে, "নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক সৎকর্মে সবাই সমান অধিকার লাভ করবে।" (সূরা নিসা)

এছাড়া ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্ব পালন একজন নারীর জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পুরুষের জন্যও এবং তাদের পুরস্কারে কোন তারতম্য হবে না।

২. নারীর মর্যাদা - অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

ইসলামী মতে, একজন নারী বিয়ের পূর্বে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তার সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছেমত বিক্রয় করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে বা দান করতে পারেন। ইসলাম তার ব্যক্তিত্ব সবসময়ই হেফাজত করে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের ন্যায় নারীরও অংশ আছে তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক এক নির্ধারিত অংশ"। ফলে নারী সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনেও সম্মানজনক মর্যাদার অধিকারী।

রাসূল (স) এর আগমনের সময় সম্পত্তিতে নারীর তো কোন অধিকার ছিলই না বরং নারী নিজেই ছিল সম্পত্তির অংশ। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলে সন্তানরা অন্য সম্পত্তির সাথে স্ত্রীদেরও ভাগ করে নিত। আর সে যুগে কোরআন সম্পদে নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকারের ঘোষণা করে। তাদের পাওনা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

৩. নারীর মর্যাদা - সামাজিক প্রেক্ষিত

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হত। অন্যান্য স্থানেও কন্যা সন্তানকে অশুভ হিসেবে দেখা হত। ইসলাম এই খারাপ চর্চাকে শুধু বন্ধই করেনি বরং মানুষকে এ ধারণায় দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই ধরনের সন্তানই আল্লাহর উপহার। এছাড়া ইসলামে জীবিকার প্রয়োজনে নারীর যে কোন বৈধ কাজকে বাধা দেয়া হয়নি বরং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ তথা জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ ঘোষণা করেছে। রাসূল (স) এর যুগে নারীরা স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

তাছাড়া ইসলাম নারীকে একজন স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সমাজজীবনে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার অত্যধিক। মহানবী (স) বলেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"। তিনি ধার্মিক নারীকে পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ বলে অভিহিত করেন। ফলে নারী জাতি স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে।

www.pathagar.com

৪. নারীর মর্যাদা - রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

কোরআন ও হাদিস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। তাই মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বন্ধু ও অভিভাবকের মত একে অপরকে সহযোগিতা করবে। আর এ সহযোগিতা সব ক্ষেত্রের মত রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কোরআন ও হাদিসের যে সব স্থানে 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' এর কথা বলা হয়েছে - তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তাই নারীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ, ভোটাধিকার প্রয়োগ এমনকি আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই ইসলামে।

৫. নারীর মর্যাদা - বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত

প্রশ্নাতীতভাবে ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক (জ্ঞান ও শিক্ষা) দিক থেকেও নারী পুরুষের সমতা বিধান করেছে। নবী (স) বলেছেন - 'জ্ঞান অন্বেষণ করা পুরুষ ও নারী প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য এবং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।' অর্থাৎ ইসলামে পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা) যে কারণে স্মরণীয় এবং ইসলামের ইতিহাসে সুবিখ্যাত, সেটা হচ্ছে তার মেধা ও স্মৃতিশক্তি। এসবের জন্য তিনি হাদিসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে সমাদৃত।

ইসলামের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের কাছে, সরকারের কাছে নারীর ও পুরুষের সমঅধিকার, সুবিচার লাভের অধিকার, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন - "তারা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের ভূষণ।" (সূরা বাক্বারা)। এ প্রসঙ্গে জনাব আবদুল লতিফের উক্তি, "The status of woman in Islam is something unique, something noble, something that has no similarly in any other system".

ইসলামে নারীর মর্যাদাকে বিভিন্ন অবস্থানের দিক থেকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এক এক অবস্থানের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এক এক রকমের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন -মাতা হিসাবে নারীদের অবস্থান, স্ত্রী হিসাবে, নারীদের অবস্থান, অধিকার ও কর্তব্য, মেয়ে হিসেবে নারীদের পরিবারে অবস্থান এবং বোন হিসেবে নারীদের অবস্থান।

মাতা হিসেবে নারীর অবস্থান

মা হিসেবে ইসলামে নারীর অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ করাকে ইসলামে ইবাদতের পরেই স্থান দেয়া হয়েছে। আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সন্তানদেরকে পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা- সূরা-১৭, আয়াত-২৩, সুরা-৩১, আয়াত-১৪, সুরা-২৯, আয়াত-৮, সুরা-৪৬, আয়াত-১৫। নবী করিম (স) মায়েদের প্রতি বিশেষ করে সন্তানদের সম্মান প্রদর্শন ও লালন পালন সম্পর্কে বিশেষভাবে আদেশ করেছেন এবং ইসলামই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে পুরুষের সমঅধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা করেছে। একদা রাসূল (স) এর নিকট এক সাহাবী জানতে চান যে, সকল লোকের মধ্যে কে আমার সবচেয়ে বেশী সাহচর্য্য পেতে পারে। রাসূলুল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন তোমার মা। এভাবে তিনবার শুধু মায়ের কথাই রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন। এবং

www.pathagar.com

চতুর্থবার যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন বলেছিলেন তোমার বাবা (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। মায়েরা সন্তানের নিকট কতটুকু মর্যাদাপূর্ণ তা রাসূলুল্লাহর আর একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত (ইবনে মাজাহ)।

স্ত্রী হিসেবে নারীর অবস্থান

স্ত্রী হিসেবে ইসলাম মেয়েদেরকে একটি বিশেষ স্থান প্রদান করেছে এই বলে যে, স্ত্রীরা শুধু স্বামীর অধীনে থেকে সাংসারিক কাজকর্মই সম্পাদন করবে না পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার সুন্দরও স্বচ্ছলভাবে পরিচালনা করার জন্যে স্ত্রীদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে। স্ত্রীরা প্রয়োজনবোধে এবং ইচ্ছা করলে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্যে যোগ্যতা অনুসারে চাকরি অথবা ব্যবসা বাণিজ্য ও করতে পারে। নবী করিম (স) তার বিদায় হজ্বের ভাষণে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হল–

তিনি বলেছেন, "হে লোকসকল! নারীদের এবং স্ত্রীদের উপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর তদ্রুপ অধিকার রয়েছে।"

নারী বা স্ত্রীদেরকে শুধু নারী হওয়ার জন্যে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থার ন্যায় স্ত্রীরা শুধু স্বামীর জীবন সঙ্গিনীই (Life partner) নয়। স্ত্রীরা স্বামীদের আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার অধিকার নিশ্চিত করেছে আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলাম। পাশ্চাত্যের নারীদের তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং করছে সে অধিকার ইসলামে নারীদেরকে ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই দেয়া হয়েছে। যদিও নারীদের সে অধিকার ভোগ করার সুযোগ সকল দেশেই সমভাবে প্রচলিত নেই। এজন্যে দায়ী ইসলাম নয়, দায়ী সমাজপতি ও শাসকবৃন্দ। ইসলামী ব্যবস্থাকে এর জন্য কোনভাবেই দায়ী করা যাবে না।

মেয়ে হিসাবে পরিবারে নারীর অবস্থান

পুরুষ সন্তানেরা পিতা-মাতা থেকে যে স্নেহ-ভালবাসা ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে মেয়ে সন্তানদের জন্য ও ইসলামে একই রকমের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হত যার জন্য কন্যা সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে তাকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে রাখা হত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা এসেছে এই বলে যে, "আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে হাত, পা, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি দিয়ে এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে।"

সুতরাং যাদের পুত্র এবং কন্যা সন্তান ইচ্ছা মাফিক জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নেই তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করার কোন অধিকার নেই। ইসলামে কন্যা সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশীদারী হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। যাতে করে তারা বাবা-মা বা ভাই-বোনদের উপর বোঝা হিসেবে চিহ্নিত না হন। তিন জন কন্যা সন্তানকে ঠিকমত লালন পালন করে পাত্রস্ত করলে পিতা মাতা এক হজ্বের সমান ছোয়াব পাবে বলে হাদিসে বর্ণিত আছে।

বোন হিসেবে নারীর অবস্থান

মুসলিম পরিবার পিতা-মাতা, ভাই-বোন নিয়ে গঠিত। ভাই ও বোনের সম্পর্ক ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের থেকেও বেশি আন্তরিক। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে বোনদের ভরণ-পোষণ,

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রদান ইত্যাদির দায়িত্ব ভাইয়ের উপর। ভাইয়েরা যখন রোজগার করে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে, বোনেরাও ইচ্ছা করলে রোজগার করে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই ধরনের নজির মুসলিম পরিবার ব্যবস্থায় রয়েছে। ইসলামে যে পরিবার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, স্নেহ, মায়া মমতা, প্রেম প্রীতি ভালবাসার উপর ন্যস্ত। এখানে কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই তাই এই ধরনের পরিবারকেই পাশ্চত্যের পণ্ডিতগণ এক সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জ্যোতিকাক্ষার হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং প্রতিটি পরিবারকে এক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু আজ পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থার কি অবস্থা লক্ষ্য করছি এখানে কোন আন্তরিকতা বা ভালবাসার স্থান নেই যা আছে তার সবটুকুই কৃত্রিম যার জন্য পাশ্চাত্যজগতে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, পারিবারিক শান্তি বিলুপ্ত হচ্ছে। পরিবার আর সেখানে শান্তির নীড় নয় কলহ ও অশান্তির আখড়া।

মূল্যায়ন

পবিত্র কোরআন এবং রাসূল (স) এর অসংখ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত যে নারী ও পুরুষ এক ও অভিন্ন জীবন সত্তা থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। আবার ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। যেমন- আল্লাহ বলেন, "নারীরা হল পুরুষের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হলে নারীদের পোশাক স্বরূপ" (বাক্বারা-১৮৭)। কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নারীকে এরূপ সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়নি। বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারীর অবস্থান দৃষ্টেই তা প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত, হিন্দু ধর্ম ও সমাজে কোনকালেই নারী তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার পায়নি। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ আছে, "মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, অগ্নি-এর কোনটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।" হিন্দু সমাজে যুবতী নারীকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি, ধন-সম্পত্তি লাভের জন্য বলিদান করা হত। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ কিংবা সহমরণ এর ন্যায় জঘন্য রীতি প্রচলিত ছিল। এখনো হিন্দু সমাজে নারীরা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত।

দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান আরো নীচু। এ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হয়। মহান বুদ্ধের বাণী- "নারী মোহের বাস্তব স্বরূপ মানবতার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন।"

তৃতীয়ত, ইহুদি ধর্মে নারী সকল পাপকর্মের হোতা হিসেবে উপেক্ষার পাত্রী হিসেবেই গণ্য। ইহুদি ধর্মের বাণী-" মেয়েদের গুণের চাইতে পুরুষের দোষও ভাল।" হিন্দু ধর্মের ন্যায় এ ধর্মেও সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার নেই।

চতুর্থত, খ্রিস্টধর্মে নারী নরকের দ্বার ও মানবের সকল দুঃখ-দুর্দশার হেতু বলে পরিগণিত। নারী সকল অন্যায়ের মূল, তারা পুরুষের মনে লোভ-লালসা উদ্রেককারী। তাদের কারণে ঘর ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারী তার অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পেলেও প্রতিনিয়ত তারা অবাধ যৌনাচারের যুপ-কাষ্ঠে বলির শিকার হচ্ছে। এভাবে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও সমাজে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে স্বচ্ছ-ফটিকের ন্যায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র ইসলামই নারীকে তার সমহিমায় সমাসীন করেছে। ইসলাম নারীর নগ্নতাকে কিংবা ভোগ-বিলাসের উপাদান হিসেবে

www.pathagar.com

প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীর সমমর্যাদা অনস্বীকার্য। উত্তরাধিকার, মোহরানা, ভরণ-পোষণ, সম্পত্তি, ধর্মীয় মর্যাদা, শিক্ষা গ্রহণ, পেশা গ্রহণ, স্বামী নির্বাচন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর জন্য যে উদার বিধান রেখেছে তা অন্য কোন ব্যবস্থায় নেই।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. ইসলামে নারীর অবস্থান, মর্যাদা আলোচনা কর।
[Discuss the Position, Status of women in Islam.]

২. রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
[Explain the position of woman in Islam in politics and economics.]

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ
Some Representatives Muslim Political Thinkers

❒ প্রাক-কথা, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, ইমাম আল গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ, নিজাম-উল মুল্‌ক তুসী, আল মাওয়ার্দী

প্রাক-কথা
Introduction

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমনি প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তকের নাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য। রাষ্ট্রদর্শনের পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মধ্যযুগকে "অন্ধকার বা অনৈতিহাসিক' বলে আখ্যা দিলেও H.K. Sherwani মনে করেন, "গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, ইতিহাসের এই যুগ অন্ধকারতো ছিলই না বরং অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই একে ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা যায়।" ইতিহাসের এই স্বর্ণযুগে যাদের চিন্তাধারা ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল তারা হলেন আল ফারাবী, ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ প্রমুখ। এ সকল রাষ্ট্রচিন্তক ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে রাষ্ট্রীক কাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা যার উৎসমূল কোরআন, সুন্নাহ, মদীনায় রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Islamic Democratic state, এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন প্রণালী। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে এসকল মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তকদের অবদান অনস্বীকার্য।

আল-ফারাবী
Al-Farabi [870–950 AD]

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে যে কয়জন খ্যাতনামা দার্শনিকের নাম মূর্ত হয়ে উঠে তন্মধ্যে First Muslim Thinker হিসেবে পরিচিত আল ফারাবী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উন্নয়নে তাঁর

www.pathagar.com

চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্রপ্রধানের আবশ্যকীয় গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গর্ভ উপস্থাপনা প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার অমূল্য সম্পদ। জ্যোতিষশাস্ত্র, আবহাওয়া বিদ্যা, পদার্থবিদ্যাসহ জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ থাকলেও যে কারণে তিনি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন তাহল গ্রীক দর্শন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও প্রামাণ্য ভাষ্য। অর্থাৎ গ্রিক সাহিত্য ও দর্শনের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটলের চিন্তাধারার উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যে মধ্যযুগের দ্বিতীয় এরিস্টটল হিসেবে সুধীমহলে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল ফারাবী তুর্কীস্থানের আল ফারাব নামক প্রদেশের ওয়াজিম নামক স্থানে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম Abu Nasr Muhammad b. Muhammad b. Ozlugh b. Tarkhan Al-Farabi. এই শহরেই তিনি শিক্ষা জীবন শুরু ও শেষ করেন। কিছুদিন তিনি বুখারার কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। জ্ঞানার্জনের প্রবল আকাঙ্খায় তিনি জন্মভূমি ছেড়ে তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে গমন করেন। সেখানেই তিনি জীবনের ৪০ বৎসর অতিবাহিত করেন। এসময় তিনি আরবী ও গ্রিক ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ব করেন। এখানেই তিনি তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান আহরণ করেন।

আল ফারাবীর দর্শনচিন্তা ও রচনাবলি

বিভিন্ন দর্শনে আল ফারাবীর অগাধ বিচরণ থাকলেও গ্রিক দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রামাণ্য ভাষ্য তাকে ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার আসন দান করেছে। বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি এরিস্টোটলের "পলিটিক্স (The Politics)" ও "লজিক (The Logic)" সম্পর্কে বিস্তৃত ও প্রামাণ্য ভাষ্য রচনা করেন। এসময় তিনি নিজেও দর্শন শাস্ত্রে বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। একারণে তিনি প্রাচ্যের দ্বিতীয় মহাগুরু নামে খ্যাতি অর্জন করেন। দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি, চিকিৎসা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(i) A Summary of Plato's Laws

(ii) Siyasatu'l-Madanyah (সিয়াসাতুল মাদানিয়াহ বা নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা)

(iii) Ara'u ahli-l-Madinatu'l Fadilah (মাদীনাতুল ফাযিলাহ বা আদর্শ রাষ্ট্র)

(iv) Jawami-us-Siyasat (জাওয়ামিউস সিয়াসাত) এবং

(v) Ijtima au'l-Madaniyah (ইজতিমাউল মাদানিয়াহ)

"জাওয়ামিউস সিয়াসাত" ও "ইজতিমাউল মাদানিয়াহ" নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের ধারণা বিদ্যমান।

www.pathagar.com

আল ফারাবীর রাষ্ট্র দর্শন

আল ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শনে প্লেটোর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকলেও সেগুলোকে প্লেটোনিক দর্শনের হুবহু অনুকরণ বলা চলে না। তিনি প্লেটোর "রিপাবলিক" ও লজের" উপর নির্ভর করেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর ব্যাখ্যা প্লেটোর বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এউইন রোজেন্থাল বলেন, "মানুষ সুখ লাভ করতে পারে এই রকম ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে আল ফারাবীর 'মদিনা' প্লেটোর 'পলিস' এর অনুরূপ। কিন্তু সম্পূর্ণ সভ্যজগতকে নিয়ে বৃহৎ সংস্থা এবং মধ্যমাকৃতির জাতি (Umma) সম্পর্কে আল ফারাবী যা বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ইসলামিক পরিবেশ থেকেই উৎসারিত। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে "যুক্তি বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা (Power of Contention) বিদ্যমান তার উপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত" রাষ্ট্র মানুষে মানুষে যে বিবাদ মীমাংসার ভূমিকা পালন করে তাও এই ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি মনে করেন যে, "এই ক্ষমতার দরুনই মানুষ কোন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে আবার কোন জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে। এই ক্ষমতাই সকল প্রেম ও ঘৃণা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, শান্তি ও যুদ্ধের মূল ভিত্তি। এই অনুভূতিই মানুষকে পরস্পর সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা দান করে এবং তার ফলেই গড়ে ওঠে পথেপ্রান্তের অনির্ধারিত সমাবেশ, গড়ে ওঠে নগর বা রাষ্ট্রের স্থায়ী সংস্থা এবং গড়ে ওঠে অনুমানমূলক বা কাল্পনিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক নিম্নে তুলে ধরা হল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ফারাবী যে মতবাদ প্রদান করেন তার সঙ্গে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক চুক্তিবাদীদের মতবাদের সাদৃশ্য থাকায় ভাষ্যকারগণ ফারাবীর এই মতবাদকে "পারস্পারিক অধিকার বর্জন তত্ত্ব" (Theory of Mutuas Renunciation of Rights) বলে অভিহিত করেছেন। আর ফারাবী যদিও বেচাকেনার ক্ষেত্রে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁর এই মতবাদকে প্রচার করেন তথাপি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেএই মতবাদ রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্বকে আল ফারাবী "রাইসুল আউয়াল" বা প্রধানতম নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, রাইসুল আউয়াল অন্য কারো দ্বারা পরিচালিত বা অদিষ্ট হবেন না। বরং তার আদেশই অন্য সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় হবে। ফারাবীর সার্বভৌমত্বনীতির ভিত্তিতেই ফরাসী দার্শনিক জিন বোডিন ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর চরম সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব গঠন করেন।

www.pathagar.com

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

আল ফারাবী সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে প্লেটোর সঙ্গে ঐক্যমত পোষন করেন। প্লেটোর উচ্চাভিলাষতান্ত্র (Timocracy), ধনিকতন্ত্র (Oligarcy), গণতন্ত্র (Democracy), এবং স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বা আদর্শ বিচ্যুত রাষ্ট্রগুলোকে তিনি যথাক্রমে "মাদীনা কাবামা", "মাদীনা নাযালা", "মাদীনা জামাইয়া", ও মাদীনা তাঘাল্লুষ" বলে অভিহিত করেন এবং এক্ষেত্রে সেগুলোকে তিনি "মাদানীয়া জাহেলিয়া" বলে আখ্যায়িত করেন।

তিনি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্লেটোর মতই আদর্শ দার্শনিক শাসকের কথা কল্পনা করেন। তাঁর কাছে আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (স) ছিলেন প্লেটো কল্পিত আদর্শ দার্শনিক শাসক।

নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলি

সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের ফলে সমাজে যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় আল ফারাবীর মতে তা রক্ষা করার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাঁর মতে যারা যৌক্তিক চিন্তা-চেতনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম কেবল তারাই নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত (There are some who have the intellect to draw conclusion more than others while can some convay their deuctions to others with greater facitily.) তিনি বলেন যেহেতু মানুষের সাধ্য সসীম, একই নেতার পক্ষে সবাইকে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করা অসম্ভব। সুতরাং নেতৃত্বের গুণে যারা অধিকতর পটু, তারা কমপটুদের কে নেতৃত্ব দিতে পারেন। মানব প্রকৃতির দুর্বলতা ও কার্যকর নেতৃত্বের জন্য সমাজের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে একজন নেতার সঙ্গে কেবল ওদের নেতৃত্ব প্রদান করা বাঞ্চনীয়। যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও ভাব ব্যক্ত করায় তার চেয়ে বেশী পটু। অন্যকথায়, একজন নেতার পক্ষে শুধু ঐ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করা বাঞ্চণীয়, যে ক্ষেত্রে তিনি অন্যদের চেয়ে শ্রেয়।

সুতরাং যে নেতা উচ্চতর স্বভাব চরিত্র শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন পালনের বদৌলতে এমন গুণাগুণের অধিকারী হয় যে নিজ মন ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা যাবতীয় সমস্যাদির হৃদয়াঙ্গম করতে পারে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই সমস্যাগুলোর যথার্থ সমাধান বের করতে সমর্থ হয়; তা অন্যদের কে বুঝাতেও পারে সে প্রধান নেতা বা রাইসুল-আল-আউয়াল হবার উপযুক্ত। আল ফারাবীর মতে, প্রবীণ নেতা বলতে এমন নেতাকে বুঝায় যার উপর কোন নেতা নেই। কারণ অন্য কোন নেতা তার উপর থাকলে সেই প্রবীণ নেতা হবে আর এ দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে যাবে। অন্যকথায়, তিনিই সর্বোপরি নেতা এবং নিজ চেষ্টায় নেতৃত্বের মাধ্যমে ঐ রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এককথায় তিনিই হবেন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসক তার উপর আর কোন উর্ধ্বতন মানব (human superior) থাকবে না। অথবা অস্টিনের ভাষায় বলা যায়, শাসক হবেন একজন determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior.....এখানে ফারাবী ও জন অস্টিনের চিন্তাধারার সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

নেতৃত্ব বনাম রাষ্ট্রের দেহ সাদৃশ্যতা

রাষ্ট্র মানুষের দেহের অনুরূপ। মানবদেহে যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ হৃদয়ের স্থান, রাষ্ট্রে তেমনি কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে প্রধান নেতার স্থান। আর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব ও মর্যাদা তাদের গুণাগুণ, বৃত্তি, কার্যকারিতার উপর আপেক্ষিক তাই প্রধান নেতার কর্তব্য রাষ্ট্রের নাগরিদের কে তাদের পেশা ও মর্যাদা অনুযায়ী ক্রমশ বৃহত্তর মণ্ডলীতে সংঘবদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে তাদের পদমর্যাদা ও কার্যক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত একটি সুশৃংখল শ্রেণী বিন্যাস ও পদবিন্যাসের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা।

আদর্শ রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলি

আল ফারাবীর আদর্শ রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলি আলোচনার পূর্বে আদর্শ রাষ্ট্র বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আল ফারাবীর মতে, মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতির তাগিদে অন্যান্যদের সাহায্য প্রার্থী হয় ও দলবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংঘ গঠন করে এবং পরিশেষে রাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য হয়। কারণ একাকী মানুষ তার জীবনের চরম লক্ষ্য ও পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সমবায়ী মানুষের সম্মিলিত আশা-আকাংখার সম্মিলিত প্রতিবিম্ব রাষ্ট্র। আর যেসব রাষ্ট্র মানব জীবনের যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য যথা জীবনের পূর্ণতা এবং পরম সুখ অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সেসব রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র।

আল ফারাবী আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম শাসকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে তাঁর জুসুম-আল-মাদানীতে (নগর রাষ্ট্রের পরিচ্ছেদ), ছয়টি গুণের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যথা :

১. শাসনকার্যে সিদ্ধ হস্ত হওয়া
২. সৎচরিত্র, দার্শনিক ও রসূল বা ঐশী প্রত্যাদিষ্ট হওয়া
৩. সত্য প্রকাশ করার ব্যক্তিগত সামর্থ্য থাকা
৪. মানুষকে ইহকাল ও পরকালের চরম সুখের দিকে পরিচালিত করার যোগ্যতা
৫. কর্ম সম্পাদন করার সামর্থ থাকা
৬. ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ পরিচালনা করার দক্ষতা থাকা।

আবার তার মদিনাতুল-ফাযিলায় প্রথম শাসকের জন্য নিম্নলিখিত ১২টি গুণের তালিকা দৃষ্ট হয় :

(ক) দৈহিক সুস্থতা
(খ) সঠিক অনুধাবন শক্তি
(গ) সম্মুখে বিবৃত বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করার সামর্থ।
(ঘ) প্রখর স্মরণশক্তি
(ঙ) যত সামান্য জেরা করে কোন ঘটনার মূল উদঘাটন করার সামর্থ।
(চ) অন্যের মনে কোন পিপাসা জাগাবার সামর্থ

www.pathagar.com

(ছ) সত্যের প্রতি অনুরাগী এবং মিথ্যার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হওয়া
(জ) ন্যায় বিচারের প্রতি প্রশস্ত হৃদয় ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা
(ঝ) স্বভাবগতভাবে ন্যায় বিচারক হওয়া ও ন্যায়ে নির্ভীক হওয়া
(ঞ) কথায় ও কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া
(ট) পানাহার ও মেলামেশায় আত্মসম্বরণের ক্ষমতা থাকা
(ঠ) জীবন যাপনের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা থাকা।

যে রাষ্ট্রের শাসন কর্তার মধ্যে প্রথম আদর্শ শাসকের প্রয়োজনীয় গুণাগুণগুলো বিদ্যমান এরূপ শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র প্রথম আদর্শ রাষ্ট্র। যার উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (স) এর দ্বারা শাসিত মদিনার রাষ্ট্র।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আল ফারাবীর ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৌদ্দিক ও ব্যবহারিক সদগুণের দিক দিয়ে শাসককে অবশ্যই অন্য সকলকে অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত নেতৃত্বগুণ ছাড়া তাকে প্লেটোর দার্শনিক রাজার মত বুদ্ধি, প্রখর স্মরণশক্তি, জ্ঞানের গভীরতা, সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগ, মহত্ব, মিতব্যয়িতা, ন্যায়ানুগ সৎসাহস, মিথ্যা বর্জন, উদার হৃদয়ের অধিকারী এবং নির্ভয়ে ন্যায়জীবন অনুসরণ প্রভৃতি মহৎগুণের অধিকারী হতে হবে।

আল ফারাবী নেতৃত্বের গুণাবলিতে প্রধানত তিন ধরনের গুণাবলীর উপর জোর দিয়েছেন।

১. নেতৃত্ব কে দার্শনিক গুণে প্রমাণিত হতে হবে
২. নেতৃত্বের প্রতিভা ও জ্ঞান থাকতে হবে,
৩. ঐশ্বরিক শক্তি থাকতে হবে।

শাসকের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণ। শাসক যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তাহলে রাষ্ট্রের শান্তিও প্রগতির প্রশ্নই উঠে না। এই জন্য প্লেটোর ন্যায় ফারাবীর প্রস্তাব ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও জনগণের শান্তি ও প্রগতির পথ সুগম করতে হলে রাষ্ট্রের শাসনভার নিষ্কলুষ চরিত্র ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকের উপর অর্পণ করতে হবে।

নেতৃত্বের কার্যাবলি

আল ফারাবী নেতৃত্বের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন-

প্রথমত, নাগরিকদেরকে তাদের পেশা ও মর্যাদা অনুযায়ী সমবৃত্তের মণ্ডলীতে সংঘবদ্ধ করা

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের তাদের পদমর্যাদা ও কার্যক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণী বিন্যাস করা।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন মানের শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষণ করা

চতুর্থত, নাগরিকদের অভাব মোচন করা

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি স্থির করা।

www.pathagar.com

কিন্তু মানব সমাজে একজন সর্বগুণে গুণান্বিত নেতার সন্ধান পাওয়া কঠিন। এটা তিনি উপলব্ধি করে তার সমাধান নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, একজন আদর্শ নেতা যদি না পাওয়া যায় তবে এমন লোককে বাস্তব নেতা রূপে নির্বাচিত করতে হবে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলির অধিকাংশ বিদ্যমান। কিন্তু একজন লোকের অভাব ঘটলে রাষ্ট্রের শাসনভার এমন একজনের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যিনি একজন রাষ্ট্র নেতার সান্নিধ্যে থেকে নানা গুণ আয়ত্ব করেছেন। আবার তাও পাওয়া না গেলে একটি শাসক পরিষদ গঠন করতে হবে যার সভ্য সংখ্যা দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শাসক পরিষদের একজন প্রধান বা হাকিম থাকবেন যিনি জনসাধারণের অভাব ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সক্ষম।

ধর্ম ও দর্শন

আল ফারাবী তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দার্শনিকের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টা সম্পর্কে যথার্থ সত্য উদঘাটন করা এবং অন্য কাজ যদি তাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে করতে হয় তাহলে তাকে কাজেকর্মে স্রষ্টারই অনুরূপ হতে হবে। (To become in actions like God) এদিক দিয়ে তিনি প্লেটোনিক মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

আল ফারাবী বিশ্বাস করতেন যে, দর্শন ও শরীয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে তিনি দর্শনের চেয়ে প্রত্যাদেশের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রোজেন্থাল বলেছেন, দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যাদেশের চূড়ান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফারাবীর যে আকাঙ্খা তাকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি একথা না বলে পারি না যে, আমার কাছে তাকে প্রথমত একজন মুসলমান, তারপরে প্লেটো ও এরিস্টোটলের কিংবা তাদের হেলেনীয় সমর্থক বা ভাষ্যকারদের শিষ্য বলে মনে হয়েছে।

আল ফারাবীর মূল্যায়ন

আল ফারাবী নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টোটলের দর্শনকে সভ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পথিকৃত। ফারাবী ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। তিনি মনে করতেন যে, ব্যষ্টির ইচ্ছার ফলে সমষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে একজন ভাষ্যকার বলেছেন যে, তিনি ছিলেন The Theory of Social Contract এর প্রথম পথ নির্দেশক। তাঁর র‍্যাসনাল মরালিটি জ্ঞান তাকে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের অগ্রগামী চিন্তানায়কের মর্যাদা দেয়। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম চিন্তা নায়কদের শিরোমনি আল ফারাবীর জীবনাবসান হয়।

www.pathagar.com

ইবনে সিনা
Ibn Sina [980-1037AD]

সভ্যতা মানুষের প্রজ্ঞা-প্রতিভাদীপ্ত চিন্তা-চেতনার ফসল। সভ্যতার পদসোপান নির্মাণে যুগে যুগে বহু জ্ঞানসাধক অমর কীর্তির স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছেন। এমনি একজন কীর্তিমান মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ-দার্শনিক ইবনে সিনা। ইসলামী রাষ্ট্র চিন্তায় মৌলিকও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি মুসলিম জাহানে চির অমর হয়ে আছেন। শুধু প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবেই নয় বরং দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বিশেষত সমকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসাবিজ্ঞানি হিসেবেও সমধিক পরিচিত। ইবনে সিনাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ প্লেটোর রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক পি কে হিট্টি (P. K. Hitti) মনে করেন, ইসলামের সাথে গ্রিক দর্শনের সমন্বয় সাধনের সূচনা যা আল-কিন্দী করেছিলেন, আল-ফারাবী তা বিকশিত করেছিলেন এবং ইবনে সিনা গুরুর ন্যায় তা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেন।

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী
His life History

মহান জ্ঞানতাপস ইবনে সিনার পূর্ণ নাম আবু আলি আল-হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। জন্ম ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বুখারার নিকটবর্তী (বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার উজবেকিস্তান) আফসানা নামক স্থানে পিতা আব্দুল্লাহ ও মাতা সিতারার কুটিরে। তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন ইরানী এবং ফার্সি ভাষায় পারদর্শী। তবে ইবনে সিনার জ্ঞানচর্চায় ফার্সি ভাষার প্রভাব থাকলেও মূলত তিনি আরবি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন এবং অধিকাংশ গ্রন্থ আরবি ভাষায় রচনা করেন।[১] তাঁর পিতা ছিলেন সামানীয় বংশের শাসকদের অধীনে বুখারার শাসনকর্তা। সেই সূত্রে তাঁর বাল্যশিক্ষার হাতেখড়ি পিতৃগৃহে। বাল্যকাল থেকেই ইবনে সিনা অসাধারণ মেধা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। মাত্র দশ বছর বয়সে ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করতে সক্ষম হন। বহুমুখী প্রতিভাধর (Versatile Genius) ইবনে সিনা অল্প বয়সেই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে গভীর জ্ঞানার্জনে সফল হন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি হাকিম উপাধিতে ভূষিত হন। এ সম্পর্কে ইবনে সিনার জীবনীকার ইতিহাসবেত্তা শামসুউদ্দীন ইবনে খাল্লিকান বলেন, মাত্র ষোল বছর বয়সে বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ইবনে সিনার কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং

---

১ তবে তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করার সময় ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে Even Sina হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় Even Sina রূপান্তরিত হয় Avicena-তে। ফলে পাশ্চাত্যে তিনি Avicena নামেই পরিচিতি পান। তবে তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিত মহল এবং পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীগণ তাঁকে আল-শেখ আল-রইস (জ্ঞানীকুল শিরোমণি), মুয়াল্লিম আসসানি (দ্বিতীয় গুরু-Second Teacher), Princep philosophus, princep philosophorum, The Great Master প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

www.pathagar.com

অভিনব চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে আসতেন। বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন সামান বংশীয় সুলতান নূহ ইবনে মুনসুর (৯৭৬-৯৯৭) এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ষোল বছর বয়স্ক ইবনে সিনা সুচিকিৎসা দিয়ে তাঁকে আরোগ্য করে তোলেন। এতে সুলতান খুশী হয়ে তাকে রাজভিষক নিযুক্ত করেন এবং সুলতানের বিশাল কুতুবখানা তাঁকে ব্যবহারের সুযোগ দেন। পিতৃগৃহেই ইবনে সিনা গৃহশিক্ষকের কাছে ধর্ম, দর্শন, ফিকহ, রাজনীতি, ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন।[২] পাশাপাশি গ্রিক দর্শনের দিকপাল প্লেটো, এরিস্টটলের গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন।

ইবনে সিনা যদিও আল-ফারাবীর চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর মত তিনি নির্লিপ্ত-নিরস জীবন যাপনের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্মকোলাহলময় আনন্দঘন জীবন প্রত্যাশী। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ইবনে সিনা শুধু যে রাষ্ট্রদর্শনের গভীরজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাই নয়, বরং তিনি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রবক্তা মেকিয়াভেলির ন্যায় তিনি কখনো স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে রাজদরবারে বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, নিজ দেশের মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে যশ-খ্যাতি অর্জন করেছেন, আবার কখনো এসবের কারণে কারাবরণ কিংবা দেশত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। এত কিছুর পরও তাঁর জ্ঞানসাধনা ছিল অদম্য, অবিরাম, গতিশীল। সেই সাথে সুখ-জৌলুসময় জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের মোহও ছিল প্রবল। "সূক্ষ্ম দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক তথ্য আলোচনায় তাঁর যেমন অফুরন্ত উৎসাহ ছিল, তেমনি শারাব ও সাঁকীর সাহচর্যে তাঁর মত আনন্দ বিহবল সঙ্গীও খুব বিরল ছিল।" তবে তিনি ছিলেন উদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তিনি মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে ১০৩৭ খৃিষ্টাব্দে হামাদানে পরলোক গমন করেন।[৩]

তাঁর রচনাবলি
His Books

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইবনে সিনা কৈশর থেকেই বিশ্বখ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি সৃষ্টি করেছে এক একটি বিশ্ববিশ্রুত

[২] তাঁর নিজের ভাষায়,"চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের পর আমি ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে পড়াশোনা শুরু করলাম। দেড় বছর ধরে রাত দিন পড়াশোনা করতাম। নিদ্রা যেতাম খুব কম, আমার সামনে অসংখ্যক কিতাব পড়ে থাকত। প্রতিটি সমস্যা ভালভাবে সমাধানের চেষ্টা করতাম। যখন কোন সমস্যা বুঝতাম না বা তাঁর ভাবার্থও অনুধাবন করতে পারতাম না, তখন মসজিদে গিয়ে নামায পড়তাম এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে বিষয়টি বুঝতে পারি। এতে আমার সব সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। সারাদিন মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে কাটাতাম। রাতে বাড়ি ফিরে একটি বাতি নিয়ে পড়তে বসতাম। ঘুম পেলে এক পিয়ালা উষ্ণপানি পান করতাম। এতে ঘুমও যেত, ক্লান্তিও দূর হত। এ সময়ে একান্ত ঘুমিয়ে পড়লে যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম স্বপ্নে সে সবের সমাধান হয়ে যেত। এভাবেই আমার বিদ্যা বাড়তে লাগল।" (এম আকবর আলী, ইবনে সিনা পৃঃ ১২)

[৩] ইবনে সিনার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। জুজখানী মনে করেন, ইসলাম জগতের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ৫৮ বছর বয়সে আলোকছটা বিচ্ছুরণের পর ৪২৮ হিজরি সনে চিরতরে ডুবে গেল। ইতিহাসবেত্তা ইবনে খাল্লিকানের মতে, ইবনে সিনার জন্ম হয় ৩৭০ হিজরি সনে সফর মাসে (অর্থাৎ ৯৮০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে) এবং মৃত্যু হয় ৪২৮ হিজরি সনে। এ বর্ণনানুযায়ী তাঁর মৃত্যু হয় আটান্ন বছর বয়সে। অপরদিকে,অধ্যাপক সাঈদ নাফিসি মনে করেন ইবনে সিনা ৫৪ বছর বয়সে ৪২৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

মূল্যবান গ্রন্থ। তবে সরাসরি রাষ্ট্রতত্ত্ব সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর রচনাবলি মূলত দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও চিকিৎসাশাস্ত্র কেন্দ্রিক। অনেক লেখক মনে করেন তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এক কম একশ (৯৯টি)। তার রচনাশৈলী ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা যে কোন সাধারণ পাঠককেও আকৃষ্ট করে। নিম্নে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলির কিছু উল্লেখ করা হল।

১. **কিতাবুশ শিফা :** আঠার খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ যা মধ্যযুগে ইউরোপে দর্শনের বিশ্বকোষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। মুসলিম জাহানে অদ্যবধি দর্শনের উপর এরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি।

২. **কানুন ফিত্তিব্ব :** চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর পাঁচ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত 'কানুন ফিত্তিব্ব' গ্রন্থখানি পাশ্চাত্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এটি ইউনানী বা ভেষজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রামাণ্য দলিল। Dr. Oslar মনে করেন, অন্য গ্রন্থের তুলনায় ইবনে সিনার 'কানুন ফিত্তিব্ব' দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। কিতাবুশ শিফা ও কানুন ফিত্তিব্ব ইবনে সিনার অমর সৃষ্টি।

৩. ইবনে সিনা ইস্পাহানে থাকাকালীন আলাউদ্দৌলাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষায় দর্শন শাস্ত্র রচনা করেন এবং নৃপতির নামানুসারে গ্রন্থের নাম দেন 'দানিশনামা-ই-আলাই' (The Alai's Book of Knowledge)

৪. কিতাবুল নাজাত (The Book Deliverance)

৫. কিতাবুল ইনসাফ (The Book Equitable Judgement)

৬. কিতাবুল হেদায়াত ওয়াল হিকমাত।

৭. কিতাবুল কুলনজ।

৮. মাকালাতুন ফিল আখলাক।

৯. আল কাসিদাতুল আইনে।

১০. কিতাবুল লিসানুল আরব।

১১. ফি ইসবাত আল-নবুয়া ইত্যাদি।

ইবনে সিনার রাষ্ট্রদর্শন
Political Philosophy of Ibn Sina

দার্শনিক ইবনে সিনার রচনাবলি পর্যালোচনায় যতদূর জানা যায় তিনি সরাসরি রাষ্ট্রতত্ত্ব সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তিনি নিজেকে সর্বদা সত্য সাধনায় ব্যাপৃত রেখে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবিক শান্তি ও পূর্ণতা। তিনি গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের ন্যায় মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আকসামউল-উলুম (বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ) গ্রন্থে ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে যে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করেছেন তার শেষভাগে রয়েছে রাষ্ট্রনীতি (Politics), প্রথম ও দ্বিতীয়তে

www.pathagar.com

যথাক্রমে নীতিশাস্ত্র (Ethics) অর্থনীতি (Economics)। রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ইবনে সিনা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তার সারবস্তু এই যে তিনিও ইবনে রুশদের ন্যায় গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ রিপাবলিক (The Republic) এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সৌধ নির্মাণ করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, প্লেটোর ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State) এমন হবে যেখানে সত্য ও সুন্দরের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটবে এবং সমাজ জীবনকে (Social life) সত্য ও সুন্দরের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। তবে তিনি সত্য ও সুন্দর তথা সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যুক্তি ও বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছেন। গ্রিক পণ্ডিতেরা মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে আখ্যা দেয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ভিত্তিমূলে মানুষের সামাজিক প্রবণতাকেই চিহ্নিত করেছেন। ইবনে সিনাও গ্রিক পণ্ডিতদের এই মতের সুর ধরে বলেন এরূপ রাষ্ট্রেই মানুষ নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইবনে সিনার রাষ্ট্রদর্শনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট সমন্বয় সাধন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা প্লেটো-এরিস্টটল থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয়ের মধ্যেই সমাজ জীবনের পরিপূর্ণতা নিহিত। এদিক দিয়ে তাঁকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার দু'দিকপাল সেন্ট অগাস্টিন ও সেন্ট একুইনাসের সাথে তুলনা করা চলে। কারণ মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য টানা হত না কিংবা গ্রিক দার্শনিকরাই এরূপ পার্থক্যকে এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা ধর্ম ও দর্শনকে অধিবিদ্যা হিসেবে আলোকপাত করেছেন। তবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তিনিই যে প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার তা নয়। বরং তাঁর পূর্বে খ্রিস্ট তাত্ত্বিকগণ এবং মুসলিম তাত্ত্বিকগণ যেমন- আল-কিন্দী, আল ফারাবী, ইবনে রুশদ প্রমুখ এক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা তুলে ধরেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ইবনে সিনার দক্ষ হাতে সেই প্রচেষ্টা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক P.K Hitti এর উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "ইসলামের সাথে গ্রিক দর্শনের সমন্বয় সাধনের সূচনা যা আল-কিন্দী করেছিলেন, আল ফারারী তা বিকশিত করেছিলেন এবং ইবনে সিনা তা গুরুর ন্যায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।"

তৃতীয়ত : আল ফারাবীর ন্যায় ইবনে সিনাও পয়গম্বর (ভবিষ্যদ্বক্তা) বা শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন যা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফি ইসবাত আল নবুয়া' এর মধ্যে বিধৃত আছে। তিনি রাষ্ট্রনায়ক তথা শাসকের জন্য দ্বিবিধ গুণাবলির উল্লেখ করেছেন।

(এক) শাসক এমনভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন যাতে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। অর্থাৎ তিনি দক্ষতার সাথে শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন।

(দুই) ধর্মীয় বিশ্বাসের সাহায্যে জনগণের অনন্ত পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। ইহজাগতিক জীবনই শেষকথা নয়, রাজনৈতিক শাসনের মাধ্যমে জনগণের ইহজাগতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার সাথে পরকালের অনন্ত জীবনের কল্যাণও তাঁকে নিশ্চিত

www.pathagar.com

করতে হবে। বস্তুত রাষ্ট্রনায়ক অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন হবেন। এক্ষেত্রে তিনি গ্রিক পণ্ডিত প্লেটোর 'The Laws' গ্রন্থটিকে রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলির প্রতিকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক প্লেটো বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের দার্শনিক রাজার মত। তিনি স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হন কিংবা দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত হন সেটা বড় কথা নয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য তিনি রাষ্ট্রনায়ক (পয়গম্বর বা ভবিষ্যদ্বক্তা) বলতে আল্লাহ প্রেরিত মুহাম্মদ (স) এর ন্যায় নবী-রাসূলদের বুঝান নি। বরং তিনি পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটোর ন্যায় রাষ্ট্রনায়ককে নির্দেশ করেছেন। তবে তিনি মনে করেন রাষ্ট্রনায়ক একইসাথে নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানার্জন করে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবেন।

তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মূল্যায়ন
Evoluation of his political Philosophy

ইবনে সিনা ছিলেন এরিস্টটলের সাথে ইসলামী ভাবধারার সেতুবন্ধন এবং গ্রিক দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যাকার। বিশ্বাস (Faith) ও যুক্তিবাদিতার (Reason) মানদণ্ডে সামাজিক জীবনের পূর্ণতার যে দর্শন তিনি দিয়েছেন তা বিভিন্ন দিক দিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রদর্শনের এক উচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধিসঞ্জাত তাওহীদের একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী, মানবতার অমরতায় আস্থাশীল এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত মননশীলতার অনুপম সৌন্দর্যের পিয়াসী। ধর্মের সাথে দর্শনের সুসমন্বয় এবং রাষ্ট্রনায়কের যে গুণাবলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা অনন্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা যায় খ্রিস্ট সমাজে সেন্ট আগাস্টিনের যে অসামান্য অবদান, প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তায় ইবনে সিনার অবদানও প্রায় সমরূপ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রচিন্তার চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের জন্যই তিনি প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ইমাম আল গাজ্জালী
Al-Gazzali [1058-1111 AD]

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন ঠিক সেই সময়েই নতুন আলোক বর্তিকা নিয়ে ইমাম আল গাজ্জালীর আবির্ভাব হয়। তিনি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত তুসনগরীর নিকটবর্তী গাজ্জাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেই মনে করেন, গাজ্জাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করায় তার নাম হয় ইমাম আল গাজ্জালী। আবার অনেকে মতে তার পূর্বপুরুষগণ গাজ্জাল বা পশমী বস্ত্রয়েন ও ব্যবসা করতেন বলে তাঁর উপাধি গাজ্জালী হয়েছে। ইমাম আল গাজ্জালীর পুরো নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তাউস আহম্মদ আল তুসী আল শাফী আল নিশাপুরী আল গাজ্জালী।

www.pathagar.com

শৈশবেই তিনি পিতা মাতাকে হারান। পিতার এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তিনি শৈশব ও শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তুস নগরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি জুরজান, নিশাপুর, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। নিশাপুরে অবস্থানকালে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম আবুল মা-আলী মোহাম্মদ যুওয়াইনী ইমামুল হারামাইনের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর কাছেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইমামুল হারামাইনের সহকারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তিনি বিখ্যাত সুফী সাধক আল ফরমাধীর নিকট মরমী শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তৎকালীন সময়ের মশহুর সূফী-দরবেশ, ধর্মতত্ত্ববিদ, নীতিশাস্ত্র বিশারদ, দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দুর্লভ ও গভীর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন।

আল গাজ্জালীর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা সেই সময়ের সেলজুক সুলতান আমীর শাহের উজিরে আজম নিজাম উল মুলক অবগত হন। এসময় ইমামুল হারামাইনের মৃত্যু হলে নিজাম উল মুলক ইমাম আল গাজ্জালীকেই প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি নিশাপুরের নিজামীয়া একাডেমির প্রধান নিযুক্ত হন ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে এক সময় পার্থিব বিষয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন।

ইমাম আল গাজ্জালীর রচনাবলি ও মৌলিক গ্রন্থসমূহ

ইমাম আল গাজ্জালী বহু মৌলিক এবং গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ছোট বড় মোট সত্তরটি গ্রন্থের প্রণেতা। এর মধ্যে তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে ইয়াহ ইয়া-উল-উলুম আদদীন বা ধর্মের নবরূপায়ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। এই গ্রন্থ ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডের রয়েছে ১০টি অংশ। কিমিয়া-ই সাদত বা সৌভাগ্যের পরশমনি এই গ্রন্থের ফারসি সংস্করণ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত আল নওয়ায়ীর বলেন, "যদি সমস্ত মুসলিম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয় এবং শুধু "ইয়াহ ইয়া" রক্ষিত থাকে তবে ইসলামের পক্ষে তা সামান্য ক্ষতিমাত্র। অর্থাৎ মুসলিম দর্শনের এক বিশাল ভাণ্ডার নিহিত আছে গাজ্জালীর ইয়াহ ইয়া উল-উলুম আদদীনের মধ্যে।

ইমাম আল গাজ্জালীর অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থগুলি হল—আল মানকিজ মিনহাজ জালাল (ভ্রান্তি হতে মুক্তি), তাহফাতুল ফলাসিফা (দার্শনিক বিনাশন), মাকাসিদুল ফালাসিফা (দর্শনের লক্ষ্য), ফাতিহাতুল উলুম, আল ইফতিসাদ ফিল ইতিকাদ, 'মীজানুল ইলম', 'ওয়াজিজ', 'মীযারুল উলম' 'মায়ারীজুল কুদস', 'রাওয়াতুল তালেবীন', আল খায়ারীফুল আকলীয়া, মীশকাতুল আনোয়ার, মুকাশফাতুল কুলুব, আর রিসানাতুল লাদুনীয়া, এবং ফায়াসালুত তাফরিকা।

এছাড়াও ইমাম আল গাজ্জালীর "মুনফিফ মিন আদ দালাল, বিবরুল মসবুক, ফাতিহাতুল উলুম, ইফতিসাদ ফিল ইতিকাদ, এবং সিররুল আলামীন সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আইন তত্ত্বের উপর "কিতাবুল ওয়াসিজ" নামের আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

www.pathagar.com

ইমাম আল গাজ্জালীর জীবন দর্শন

ইমাম আল গাজ্জালীর সমসাময়িককালে মুসলিম চিন্তাবিদগণ মূলত ত্রিধারায় বিভক্ত ছিলেন। মুতাজিলা, আশারিয়া এবং সুফী চিন্তা ধারা যখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সক্রিয় ঠিক সেই সময়েই ইমাম আল গাজ্জালী জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হন। মুতাজিলার অনুসারীরা দার্শনিক প্রজ্ঞাকে অধিক গুরুত্ব দেন। আশারিয়ারা প্রত্যাদেশকে জ্ঞানের একমাত্র মাপকাটি মনে করেন। সুফী সাধকরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে মনে করে। এই সব ত্রিধাবিভক্ত চিন্তাধারায় ইসলামের সামগ্রিক রূপ বিধৃত না হয়ে খণ্ডিত রূপ প্রকাশ পায়। ইমাম আল গাজ্জালী এইসব বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারায় এ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করার সাধনায় লিপ্ত হন। ত্রিধাবিভক্ত ইসলামী চিন্তাধারাকে সমন্বয় করে তিনি ইসলামকে এক ধারায় প্রবাহিত করার কঠিন কাজটি করতে থাকেন। এ কারণেই ইমাম আল গাজ্জালীকে মুতাকাল্লিম,দার্শনিক ও সুফী বলা হয়ে থাকে। ইমাম আল গাজ্জালীর সবচেয়ে বড় সাফল্য আশারিয়া মতবাদের সাথে সুফী মতবাদের সমন্বয় সাধন করা।

আল গাজ্জালীর চিন্তাধারা ছিল নীতিধর্মী, কল্পনা বিলাসী নয়। শিক্ষা জ্ঞান সাধনার প্রধান ভিত্তি হিসেবে তিনি নীতি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। গাজ্জালীর দৃষ্টিকোণ ও জীবন দর্শন সম্পর্কে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, "সে যুগের সর্বমুখী জীবনধারা ও সমস্যাবলি তিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেগুলোর মধ্য পথ দিয়ে চলেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভুত হয়েছিল তাঁর ধর্মতত্ত্ব। বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি ও তাদের শ্রেণী বিভাগ পদ ও পদের সম্পর্কিত যুক্তিসমূহ তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। আত্মচৈতন্য জীবনের যে বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছিল তা দৃঢ় মুষ্টিতে তিনি ধারণ করেছিলেন।"

আল গাজ্জালীর রাষ্ট্রচিন্তা
Political thought of Al-Gazzali

আল গাজ্জালীর রাষ্ট্রচিন্তায় ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। তবে সর্বাগ্রে যেটা উল্লেখ্য তাহল তিনি রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। নিম্নে তার রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যার জন্ম আল্লাহর প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ এবং পয়গম্বর ও সাধকদের অনুশাসন হতে এবং যার সাহায্যে পার্থিব জগতের রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। ইমাম আল গাজ্জালী রাষ্ট্র সম্পর্কে যে সব মূল্যবান তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন তার বেশিরভাগই গ্রিক রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে গাজ্জালী বলেন যে, মানবকে এমনভাবে সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা হয়েছে যে, সে কখনো একাকী বাস করতে পারে না, সে সব সময় তারই ন্যায় অপর মানবের সাহচর্য কামনা করে। তার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের সাথে এরিস্টটলের মতবাদের যথেষ্ঠ মিল আছে।

শাসকের প্রয়োজনীয়তা : শাসকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম আল গাজ্জালী বলেন, রাষ্ট্রের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য একজন শক্তিশালী শাসক প্রয়োজন। শাসক না থাকলে নাগরিকদের পার্থিব কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণকারী কোন সংস্থা গড়ে উঠতে পারে না। তিনি ইফতিসাদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, শাসক না থাকলে অবিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলা, তরবারীতে ক্ষন্তিহীন ঝন্যকার, পৌণঃপৌণিক দুর্ভিক্ষ ও গোমরাহী নামবে এবং সকল শিল্প ও কারু শিল্পের অপমান সূচিত হবে। তিবরুল মসবুক গ্রন্থে তিনি সুলতান বা শাসকের যোগ্যতা ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আদর্শ শাসকের গুণাবলি : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আল গাজ্জালী রাষ্ট্রের জন্য কেবল শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি আদর্শ শাসকের প্রয়োজনীয় গুণাবলির কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে একজন আদর্শ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে অবশ্যই কর্তব্য পরায়নতা, ধর্মনিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, গভীরজ্ঞান, প্রজাদের প্রতি দয়া, সুদৃঢ় মনোবল, কূটবুদ্ধি, নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা। সেই সাথে রাষ্ট্র প্রধান অবশ্যই পরহেজগার, খোদাভীরু হবেন, সুষ্ঠ শাসনকার্য পরিচালনার স্বার্থে সমাজের বিজ্ঞজনদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন, অধীন কর্মচারিদের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন। মূলত গাজ্জালী মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মত রাষ্ট্র প্রধানকে প্রত্যাশা করেছেন।

রাষ্ট্রের সাথে জীবদেহের তুলনা : মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আল গাজ্জালী রাষ্ট্রের সাথে জীবদেহের তুলনা করে রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। রাষ্ট্রসত্তাকে একটি জীবদেহের সাথে তুলনা করে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও সংগঠন শাখাকে জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে মানব মনের তুলনা করেছেন। যেমন শাসন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ, পুলিশ, উজির ও সুলতান যথাক্রমে কামনা, ক্রোধ, সাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রতীক স্বরূপ। তাঁর মতে মানব দেহে হৃদয়ের স্থান যেমন সর্বোচ্চে তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার স্থান সবার উর্ধ্বে।

নাগরিকদের শ্রেণী বিভাগ : নাগরিকদের শ্রেণীবিভাগ ও দাসপ্রথা সম্পর্কে ইমাম আল গাজ্জালীর স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তিনি নাগরিকদের ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- (১) কৃষক (২) কারিগর (৩) তরবারী ধারী শ্রেণী এবং (৪) মাসিজীবী। এক্ষেত্রে আল গাজ্জালীর বিশেষত্ব হল, তিনি গ্রিক দার্শনিকদের ন্যায় শ্রেণীগত অসাম্যের ভিত্তিমূলে রাষ্ট্রের কাঠামো রচনা করেন নি। তার কাছে রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীই সমান।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক : বহুমুখী প্রতিভাধর ইমাম গাজ্জালী বিজ্ঞতার সাথে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটিকে পৃথক করে দেখা বেদাআত এর শামিল। কারণ ধর্মকে বা ধর্মীয় বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রীক ক্ষমতা (State Power) প্রয়োজন। ইসলাম ভিত্তিক রাষ্ট্রই সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও যৌক্তিক সমাধান দিবে।

www.pathagar.com

ইমাম আল গাজ্জালী সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য

প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী ইমাম আল গাজ্জালীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার মৌলিকত্ব স্বীকার করে রেনান বলেন—গাজ্জালী আরবী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তানায়ক।

নিকলসন টমাস আল গাজ্জালীকে সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষী বলে অভিহিত করেন।

ডি ব্যুওর বলেন, ইমাম আল গাজ্জালী নিঃসন্দেহে মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিন্তানায়ক। তাঁর মতবাদ তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি।

ড. আগস্তিম যৌলাক ইমাম আল গাজ্জালীকে সত্যিকার ঐশী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব (A Truly divine) বলেছেন।

ম্যাকডোনাল্ড গাজ্জালীকে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল চিন্তাবিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তিনি আল গাজ্জালীকে আগস্তিমের সমকক্ষ বলে মনে করেন।

ড. ব্লু এম ওয়াট ইমাম আল গাজ্জালীকে মুহাম্মদ (স) এরপর শ্রেষ্ঠ মুসলিম বলে চিহ্নিত করেন।

পরিশেষে, ইসলাম ও মুসলিম জগতের চরম যুগসন্ধিক্ষণে আর্বিভূত হয়ে আল গাজ্জালী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামকে নব প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে গতিময় করে তোলেন। এ কারণে বিদগ্ধ মুসলিম জগত তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম নামে অভিনন্দন জানায়। তিনি শিক্ষা ও জ্ঞান-সাধনার মৌলিক ও সর্বপ্রধান ভিত্তি হিসেবে নীতি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইসলামকে স্বমহিমায় উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালান। তাঁর একটি অনন্য কৃতিত্ব হল তিনি সূফীবাদকে ইসলামধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব মধ্যযুগের খ্রিস্টচিন্তকদেরও নাড়া দিয়েছে। যেমন, Saint Aquinas, Dante, Raymond Martin, Blaise Pascla প্রমখ গাজ্জলীর রচনাবলি থেকে যুক্তি, উদাহরণ গ্রহণ করে প্রকারন্তে গাজ্জালীর মতামতকে অভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

ইবনে খালদুন
Ibn-E-Khaldun [1332 – 1406 AD]

প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তক ইবনে খালদুন জ্ঞান পরিমণ্ডলে সমাজ বিজ্ঞানের প্রবক্তা হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তিনি ১৩৩২ সালে ২৭ মে (হিজরী ৭৩২) উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ওয়ালীউদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন হলেও মূলত নামের শেষাংশেই তিনি সুধীমহলে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বিধায়

www.pathagar.com

তিনিও সেই পথে বিচরণের সুযোগ পান। শিক্ষক পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মেধাবী ইবনে খালদুন একাধারে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, আইন ও বিজ্ঞানের বহু শাখায় শিক্ষালাভ করেন এবং সুযোগ্য শিক্ষকমহলের অতি প্রিয় পাত্রে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী (Versatile Genius) ইবনে খালদুন অল্প বয়সে পবিত্র কোরআন মুখস্ত করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভা ও মননশীলতায় মুগ্ধ হয়ে তিউনিস এর সুলতান দ্বিতীয় আবু ইসহাক মাত্র ২০ বছর বয়সে তাঁকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন। সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী ইবনে খালদুনের মধ্যে ছিল অদম্য জ্ঞান পিপাসা যা তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে টেনে নিয়েছে। তাঁর মধ্যে ছিল উচ্চাকাঙ্খা ও ক্ষমতাশালী হওয়ার প্রবণতা। তাই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কখনো সচিব, কখনো রাষ্ট্রদূত (রাজা পেট্রোর দরবারে রাষ্ট্রদূত), আবার কখনো বিচারপতির মত মর্যাদাশীল পদে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৩৮৪ সালে তিনি কায়রোতে যান এবং সেখানে কাজী-উল-কুযাত বা প্রধান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। এর আগে ১৩৮২ সালে কিছুদিন মিসরের বিশ্বখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন যুগসন্ধিক্ষণের সন্তান। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যখন ম্লানপ্রায়, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য-সংহতি যখন বিনষ্টের প্রান্তে, রাজনৈতিক আকাশ যখন রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে টালমাটাল, অরাজকতা ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে দিগ্বিদিক কলংকময় এমনি এক ঘনঘোর অমানিশার মধ্যে তাঁর জন্ম। এক দিকে শৈশবের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অপরদিকে কর্মময় জীবনের নানা অভিজ্ঞা তাঁর চিন্তাধারার সৌধ নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বৈচিত্র্যময় কর্ম জীবনের এক পর্যায়ে তিনি তিউনিসে ফিরে এসে রাজ কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি প্রচলিত রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে জ্ঞান সাধনার জন্য সালামার নির্জন দূর্গে অবস্থান করে ইতিহাস, দর্শন ও সমাজ তত্ত্বে গবেষণা করেন। ১৩৮০ সালে তিনি 'কিতাবুল ইবার' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (যার প্রথম খণ্ড 'মুকাদ্দিমা') যা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থেই ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ বয়সে তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের নদীতে ডুবে আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহত হন এবং তাদের আত্মার শান্তি কামনায় পবিত্র মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন। অতঃপর ১৪০৬ সালে (হিজরী ৮০৮) কায়রোতে পরলোক গমন করেন।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা
His political thought

বহুমুখী প্রতিভাধর মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুন প্রধানত সমাজ বিজ্ঞানী হলেও মূলত ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। 'কিতাবুল ইবার' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুকাদ্দিমায় তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ইত্যাদির উত্থান পতনের কারণ, রাষ্ট্র শাসনের প্রকৃতি, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীক সংগঠন ও নাগরিকদের চরিত্র গঠনে সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রভাব, আবহাওয়া ও জলবায়ুতত্ত্ব ইত্যাদি

www.pathagar.com

বিষয় বিশদভাবে অত্যন্ত সাবলীলভাষায় বিধৃত হয়েছে। তিনি ইতিহাস ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতেন বিধায় তাঁর আলোচনা ও চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তিনি অতীত শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন বিধায় তাকে এরিস্টটলের উত্তরসূরি বা প্রাচ্যের এরিস্টটল বলা হয়।

মুকাদ্দিমা / ভূমিকা
Prolegomena

ইবনে খালদুনের অমরগ্রন্থ কিতাবুল ইবার (Universal History) বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ গ্রন্থের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার যে সুপরিসর বর্ণনা পাওয়া যায় তা পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকের কাছে ছিল ঈর্ষণীয়। মুকাদ্দিমায় বর্ণিত তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের উল্লেখ্যযোগ্য দিকগুলো হল –

(i) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব/মতবাদ
(ii) আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি
(iii) রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও আয়ুষ্কাল
(iv) রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি
(v) ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা
(vi) সমাজ ও মানুষের উপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব (আবহাওয়া ও জলবায়ু তত্ত্ব)
(vii) সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক।

এগুলোই হল রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের মৌলিক অবদান যা প্রাচ্য প্রতীচ্য নির্বিশেষে সকল সুশীল সামজে সমাদৃত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন

রাষ্ট্র একটি সামাজিক, রাজনৈতিক মানবীয় সর্বোপরি বলপ্রয়োগকারী সংস্থা। রাষ্ট্র দর্শনে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ যেমন, বল প্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং ঐতিহাসিক বা ক্রমবিবর্তনমূলক মতবাদ প্রচলিত ও বহুল আলোচিত। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে ঐশ্বরিক মতবাদকে জোরালোভাবে সমর্থন করা হত। মধ্যযুগে রাজনীতির উপর যখন ধর্মের জয় জয়কার প্রভাব এবং সমকালীন মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি হিসেবে মত পোষণ করেন; তখন একজন মুসলিম দার্শনিক হিসেবে ইবনে খালদুনের পক্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক মতবাদ এবং রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করানোই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মননের অধিকারী ইবনে খালদুন রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণে যে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় সকল কাল্পনিক

www.pathagar.com

মতবাদকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ভুল প্রমাণ করে অনেকটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের ন্যায় বলেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সামাজিক মানুষের প্রয়োজনও বহুমুখী। আর এই বহুমুখী প্রয়োজনের তাগিদে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তিনি বলেন, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিধান ও অন্যায়-অপরাধ দমনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে তাঁর মতামতের দ্বারা পরবর্তীকালের চুক্তিবাদী দার্শনিকত্রয় হবস, লক ও রুশো প্রভাবিত হয়েছেন।

ইবনে খালদুন মনে করেন, মানুষের জীবনে প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। আর এই অশেষ প্রয়োজন পূরণে মানুষ একাকী সক্ষম নয়; তাই দেখা দেয় পারস্পারিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার। যেমন, মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্যের। এ খাদ্য কেউ একক প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারে না। খাদ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় একাধিক পেশার একাধিক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাঁর মতে, মানুষের এই পারস্পারিক সহযোগিতা ও সাহায্যের মাধ্যমে সমাজ গড়ে উঠে। এভাবে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজ, সমাজের সকল মানুষ যুক্তি ও সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না। সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে আছে মানবীয় গুণাবলির সমারোহ, বিপরীতে কিছু সংখ্যকের মধ্যে আছে পশু-প্রবৃত্তি; যার ফলে সমাজে নানা অনাচার ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং উহা দমন করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। সমাজের অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ইবনে খালদুন মনে করেন, রাষ্ট্রশক্তির মৌল প্রেরণা গোষ্ঠী চেতনা তথা আসাবিয়াত থেকে উৎসারিত।

রাষ্ট্রের ক্রম বিবর্তন

ইবনে খালদুনের মতে, যখনই কোন সভ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা মানব সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় জন্ম, বৃদ্ধি, যৌবন, বার্ধক্য ও ক্ষয়জনিত প্রকৃতির এ অমোঘ নিয়মগুলো অনুসরণ করে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যদিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়। এ পর্যায়গুলোর প্রত্যেকটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বিদ্যমান।

প্রথম পর্যায়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজন পারিবারিক ও ধর্মীয় সম্পর্কভিত্তিক আসাবিয়াত বা গোষ্ঠী সংহতি। রাষ্ট্রের ক্রম বিবর্তনের এ পর্যায়ে জনগণকে একটি সুসভ্য কৃষ্টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বাধ্য করা হয়। সেই সাথে জনগণকে শাসকের প্রতি আনুগত্য স্বীকার এবং নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির দিকে ধাপিত করা হয়। কিন্তু আসাবিয়ার সাহায্য ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। মূলত ধর্মের সাহায্য নিয়ে আসাবিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অধিকতর কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়, রাষ্ট্রের ক্রমবির্তনের ধারায় প্রথম পর্যায়ের ইতিবাচক প্রক্রিয়ার শুরু। শাসক রাষ্ট্রীক ক্ষমতা একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে একাধিত্য প্রতিষ্ঠা করে তার সমকক্ষদের

www.pathagar.com

ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যখন রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে শাসকের একচ্ছত্র অভিলাষ পূরণ হয়, তখন অন্যান্য কামনা-বাসনা পূরণের জন্য তিনি নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এভাবে তিনি ক্ষমতার আস্বাদন ভোগে মত্ত হন। এর ফলে রাষ্ট্রটি ক্রমবিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে পাদর্পণ করে।

তৃতীয় পর্যায়, এ পর্যায়ে শাসক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রশাসনের দিকে নজর দেয়। রাষ্ট্রের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিজ রাষ্ট্রকে অপরাপর উন্নত রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং সভ্য রাষ্ট্রগুলোর আদলে নগরের শ্রী বৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়ে মনোনিবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র মানুষের ঐশ্বর্য্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হয়। বস্তুত এ পর্ব আরাম-আয়েশ ও অবসর বিনোদনের, যেখানে মানুষ আনন্দ-ফূর্তি ও হাসি-খুশীতে মশগুল থাকে।

চতুর্থ পর্যায়, এটা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সন্তোষের পর্ব যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সন্তুষ্ট চিত্তে সকল প্রকার আনন্দ উপভোগ করতে পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করে। কিন্তু পূর্ব পুরুষদের গুণাগুনের ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকে। রঙিন স্বপ্নগুলো পূরণে ব্যস্ত হয়ে একরূপ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। পূর্ব পুরুষদের কীর্তিগুলো পুঁজি করে তা রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

পঞ্চম পর্যায়, ইবনে খালদুনের মতে, "ইহা অব্যবস্থা, অন্তঃসারশূন্যতা ও অপব্যয়িতার স্তর। জীবনসায়াহ্নে এই বাধর্ক্যগ্রস্থ রাষ্ট্র ধীরে মৃত্যুবরণ করবে অথবা কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে হঠাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্রমবিকাশের চতুর্থ পর্বে যেখানে উন্নতির শেষ সেখানে অবনতিরও শুরু। তবে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের এই ধারাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পর্বে।

আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক অবদানের মধ্যে আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি অন্যতম। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল আসাবিয়া। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, চরম উন্নতি, অবক্ষয় ও পতন ইত্যাদি আসাবিয়ার আনুপাতিক পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। আসাবিয়ার শাব্দিক অর্থ পারিবারিক সংহতি, গোত্র বা গোষ্ঠী সংহতি, সামাজিক সংহতি, দলীয় সংহতি, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি। তবে ইবনে খালদুন এখানে আসাবিয়ার অর্থ গোষ্ঠী সংহতিই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠীর মন ও মানসিকতার সমগ্র যোগফলই আসাবিয়া যা রাষ্ট্রীয় সংহতির উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে Rosenthal বলেন, "কোন একটি ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ কতগুলো সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্বে রক্ত ও পারিবারিক ঐতিহ্যের বন্ধন, সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা কিংবা অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যে অনুভূতির সূচনা করে তা ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ইবনে খালদুন একেই আসাবিয়া বলে অভিহিত করেছেন। এর

www.pathagar.com

মূল লক্ষ্য হল মূলক্ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। খোদ সংঘের প্রয়োজনের মতই এ শক্তির প্রয়োজন, কারণ এ শক্তি ছাড়া মানুষের জীবন-সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংঘ নিতান্তই অকিঞ্চিতকর।" ইবনে খালদুন মনে করেন, এরূপ গোষ্ঠী সংহতি ধর্মের ভিত্তিতে কিংবা ধর্মনিরপেক্ষভাবেও গড়ে উঠতে পারে। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যে ধর্মীয় মিশন নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন তার মধ্যেও প্রবল ঐক্য বিধানকারী ক্ষমতা নিহিত ছিল। তাঁর মতে, গোষ্ঠী সংহতি যে কেবল ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতেই গঠিত হয় এমন নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা আধা-ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতেও এই ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যে একাত্মতা গড়ে উঠে তার ভিত্তিতে গোষ্ঠী সংহতির সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, গোষ্ঠী মানুষের প্রথম উন্মেষ সূচিত হয় পরিবার ও গোত্রীয় আত্মীয়তাবোধের মাধ্যমে। তারপর গোত্রীয় এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এভাবে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ধারায় এই সংহতি গড়ে উঠে। একটিমাত্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মানুষের স্থলে একাধিক গোষ্ঠী মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু একটিমাত্র মানুষ যখন অন্য সব মানুষের উপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয় তখনই যথার্থ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ অন্য সব ক্ষমতাকে পরাভূত করে প্রাধান্য বিস্তার করে। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রই যেহেতু অন্য সব রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌম কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং নতুন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে।

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল

ইবনে খালদুন রাষ্ট্র বা সরকারকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করে উহাদের মধ্যে পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। যথা–

১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা দীনিয়া)

২) যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা আক্কলীয়া) এবং

৩) দার্শনিক রাষ্ট্র (সিয়াসা মাদানীয়া)

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত আইনের দ্বারা শাসন করা হয় এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্য শাস্তি ও পুরস্কারের ভিত্তিতে শাসিতের (জনগণের) আনুগত্য দাবি করা হয়। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র মানবিক যুক্তির আলোকে রচিত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এধরনের শাসনব্যবস্থায় পুরস্কারের আশায় আনুগত্য দাবি করা হয়। দার্শনিকের রাষ্ট্র যেখানে প্রজাসাধারণের নিজ নিজ প্রকৃতি, গুণাবলি অনুযায়ী তাদের করণীয় নির্ধারণ করা হয়। একে প্লেটোর সুরে আদর্শ রাষ্ট্রও বলা হয়। তবে প্লেটো যেমন কল্পনার রথে বিচরণ করে আদর্শ রাষ্ট্রের নীল নকশা অংকন করেছেন তেমনি ইবনে খালদুনও মনে করেন বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র সম্ভব নয়।

এবারে রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে তিনি বলেন, জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে রাষ্ট্রের আয়ুষ্কালের কিছু তারতম্য হতে পারে। তাঁর মতে, স্বাভাবিকভাবে কোন রাষ্ট্র তিন যামানার (যুগের) বেশি টিকতে পারে না। এক যামানা ৪০ বছরের সমান। সে অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র একশত বিশ

www.pathagar.com

বছর টিকতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলও এরূপ মত পোষণ করেছেন। রাষ্ট্র পরিবর্তনের পাঁচটি পর্ব অতিক্রমনের মাধ্যমে তিন যামানা শেষে বিলীন হয়ে যাবে। উক্ত পাঁচটি পর্ব নিম্নরূপ।

প্রথম পর্ব, শাসকদের মধ্যে গোষ্ঠী সংহতি এতটাই প্রবল থাকে যে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুকে পরাজিত করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেই সাথে গোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী শাসকগণ নাগরিকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে। জনগণ রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্ব, এ পর্বে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করে কোন প্রকার সহযোগিতা ছাড়াই একা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে নাগরিকের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ক্ষমতা শাসক পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত হয়। নগর সভ্যতার ফলে গোষ্ঠী সংহতি শিথিল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় পর্ব, এটা ভোগ-বিলাসের পর্ব। আরাম-আয়েশের বশে শাসক নিজেই শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করতে চায়। সে স্মৃতিস্তম্ভ ও কীর্তি স্থাপনে অধিক মনোনিবেশ করে। এ সময় শাসকের শক্তি হ্রাস পায় ফলে অন্য কোন সুযোগ সন্ধানী সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন করে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

চতুর্থ পর্ব, পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে শত্রু-মিত্র সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চায় এবং অভিজাত্য ও দম্ভ প্রকাশে ব্যস্ত থাকে।

পঞ্চম পর্ব, রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের সূচনা পর্ব। শাসকগণ বিলাসিতা ও অপচয়ের কারণে সাহসিকতা হারিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে ভয় পায়। তারা দুশ্চরিত্রবান, অমিতব্যয়ী ও লম্পটে পরিণত হয়। ভোজ সভায় অর্থব্যয়, সুহৃদদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনের কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্যদের নিযুক্তির ফলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনীর বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা বিদ্রোহ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়। মোট কথা, শাসক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য-অসৎ লোকদের নিয়োগ দিয়ে তাদের চিত্তজয়ে মনোনিবেশ করেন। বিপরীতে সমাজের সম্ভ্রান্ত ও গুণীদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং তাদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সূচনা ঘটে। শাসক আমোদ-ফূর্তিতে মেতে উঠেন। এখানেই রাজ বংশের অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে, আর রাষ্ট্রও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের সাথে জীবদেহের স্বাভাবিক বিবর্তন ধারা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রাকৃতিক জীবদেহের ন্যায়; জীবদেহের ন্যায়ই তার বিকাশ পূর্ণতা ও পতন হয়। তবে রাষ্ট্র বা রাজবংশের স্থায়িত্ব কখনো সহাস্রাব্দ হতে পারে না বরং একশত বিশ বছরেই উহার বিলুপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি

Prof. Rosenthal মনে করেন, "আমার জ্ঞানে ইবনে খালদুন হচ্ছেন মধ্যযুগীয় প্রথম চিন্তানায়ক, যিনি রাষ্ট্রনীতিতে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংগঠিত যে কোন সমাজের সামগ্রিক জীবনে অর্থনীতির গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি করেন।" অর্থাৎ যে কোন দেশের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

স্থিতিশীলতার (Political Stability) মূল চাবিকাঠি হল তার সুদৃঢ় অর্থনীতি। গোষ্ঠী সংহতির ঐক্যে যখন ফাটল ধরে তখন রাজা বা শাসককে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয়। আর এই ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী পালতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সংগৃহীত হয় কর (Tax) আদায় এবং কখনো কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে। এতে কিছু দিনের মধ্যেই রাজার হাতে বিপুল অর্থের সমাবেশ ঘটে। ফলে তিনি আমোদ-ফূর্তি তথা লাগামহীন বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন; যার পরিণতিতে রাষ্ট্র অনিবার্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে যা পরিশেষে তাঁর ও তাঁর বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

অর্থনীতির উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সুষম বাজেট স্থিতিশীল রাষ্ট্রনীতির মেরুদণ্ড। তিনি আরো বলেন, করভার যখন লঘু হয় তখন মানুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। কিন্তু করভার যখন গুরু হয় তখন মানুষের কর্মস্পৃহা হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের মাত্রাও হ্রাস পায়। এর ফলে জীবন যাত্রার মানে নিম্নগতি দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সেই সাথে ইবনে খালদুন মূল্য, চাহিদা, যোগান, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গভীর আলোকপাত করেছেন। তবে তাঁর মতে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিই আদর্শ অর্থনীতি যেখানে শরীয়াহ মোতাবেক যাকাত, জিযিয়া, খারাজ ব্যতীত অন্য কোন গুরুকর আরোপ করা হয় না। H.K Sherwani'র ভাষায়, "আমরা যদি ইবনে খালদুন প্রবর্তিত অর্থনীতিক তত্ত্বগুলোর গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি তাঁর যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন। বলতে গেলে একদিক দিয়ে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের ভাষাই আওড়িয়ে গেছেন।"

ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে। বস্তুত চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি ইতিহাসের যে যুক্তিবাদী ও অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করেন তার উপর ভিত্তি করে অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক মহল ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতাত্ত্বিক বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার' তথা বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 'মুকাদ্দিমা'র প্রারম্ভে তিনি ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক, বস্তুতাত্ত্বিক ও যুক্তিবাদী (সংস্কারমুক্ত) বিশ্লেষণ প্রদান করেন যা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁকে স্থায়ী গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন করেছে। প্রাচীন ইতিহাসে প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকদের কথিত পুরাণ কথা, দেব-দেবীর প্রভাব আর মধ্যযুগের ইতিহাসে পোপ শাসিত ইউরোপে বাইবেলের একচেটিয়া প্রভাব ইতিহাসকে নিছক কাহিনী নির্ভর করে তোলে। কিন্তু ইবনে খালদুন প্রাচীন ও মধ্যযুগের এসব কাহিনী নির্ভর ইতিহাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনে ইতিহাসকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বংশ ও কালের প্রেক্ষিতে বিচার না করে

www.pathagar.com

শাশ্বত ও সর্বজনীন মানবতার (সমাজতন্ত্রের আলোকে) প্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মূলত তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসের বিবর্তন ধারা অবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ইতিহাসের বিবর্তনবাদী প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইতিহাস অর্থ শুধু রাষ্ট্র বা ধর্মের কাহিনী নয়, ইতিহাস হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলির বিবরণী সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী। মানব সমাজের প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত অলক্ষ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করা এবং তার যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ঐতিহাসিকদের কাজ। সমাজের এ পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে, বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। নগর সামাজিকতায়, কিংবা ধর্মীয়, জাতীয় বা গোষ্ঠী সংহতিতে নতুন নতুন শ্রেণীর উত্থান-পতন, বিপ্লব-বিদ্রোহ, রাজ্যজয় রাষ্ট্রগঠন বা রাষ্ট্র পরিবর্তনই তার দৃষ্টান্ত। মানুষের আহার-বিহারের অভাব পূরণ, জীবন যাত্রার জন্য বিভিন্ন শিল্পকলার উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন এই পরিবর্তনেরই স্বাক্ষ্য। ইতিহাস তাই মানব সমাজের সার্বিক জীবনযাত্রার ও এর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত। এই পরিবর্তন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই সাধিত হয় এবং এতে ব্যক্তি বিশেষের বড় একটা হাত নেই।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস সম্পর্কিত এ যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার প্রচ্ছন্ন প্রভাব ইতিহাসের আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার উপর লক্ষ্যণীয়ভাবে বিদ্যমান। বস্তুত প্রাচীনযুগের দেব-দেবীর আখ্যান আর মধ্যযুগের বাইবেলের কাহিনী নির্ভর ইতিহাসের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়ে ইবনে খালদুন বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করেন। ফলশ্রুতিতে ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু, গীবন প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তানায়ক ইতিহাসকে যুক্তিবাদী ও বস্তুতাত্ত্বিক বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রাষ্ট্র ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ অমানবীয় (আধিভৌতিক) শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় না। বরং এর মূল চালিকা শক্তি হল কতগুলো নিয়ম যা সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির ফল। এই নিয়মগুলো সর্বোতভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকরী। স্থান ও কালের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন বাস্তব পরিবেশ ও কাঠামোতে গঠিত সমাজে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন একই নিয়ম অনুকরণ করতে বাধ্য। ইতিহাসের এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূলত তিনি মানব সমাজের সঠিক ইতিহাস রচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক

ইতিহাসকে দেব-দেবীর এবং বাইবেলের কাহিনী নির্ভরতা মুক্ত করে ইবনে খালদুন সর্বপ্রথম আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। তাঁর মতে, যে ঐতিহাসিক ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তার পক্ষে যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে গণ্য করেন। এই দৃষ্টিকোণে তাঁর 'মুকাদ্দিমা' কে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান উভয় জ্ঞানভাণ্ডারের অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি মানুষের জীবনযাত্রার রীতি-নীতি উদ্ভাবনে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব রূপায়ণে বর্ণ,

www.pathagar.com

জলবায়ু, প্রকৃতিজাত পণ্য প্রভৃতির প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার বিজ্ঞানসম্মত ও বিশদ ব্যাখ্যা দেন। এ দৃষ্টিকোণে তিনি সমাজবিজ্ঞানের জনক এবং বিখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী Buckle'র (বাকলের) পথ প্রদর্শক।

সমাজ ও মানুষের উপর ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রভাব

ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের সূত্রধরে সমাজের মানুষের চরিত্র গঠন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের উপর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে এক মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, যে কোন দেশের সমাজ ও সরকারের উপর সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থা এবং আবহাওয়ার প্রভাব শুধু অধিক নয়, প্রগাঢ়ও। এসব পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও সমাজ সংস্থার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য মানুষের চরিত্র গঠন ও কর্মক্ষমতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তবে এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত 'The spirit of the laws' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন ইবনে খালদুন তা তিনশত বছর পূর্বেই তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'মুকাদ্দিমা'য় বলেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর যে অংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত সেখানে প্রধান প্রধান বিজ্ঞান ও কলার উদ্ভব হয় এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীরা জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে যে সব দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন সে সব দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি নিম্নমানের হয়ে থাকে। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের অবস্থানের দরুন মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবং মানুষের অভ্যাস, আচরণ ও রীতিনীতিতেও পার্থক্য দেখা যায়। বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীগণ অত্যধিক গরমের কারণে প্রগতি অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁর মতে, চরম উষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি কম হওয়ার কারণ সেখানে জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। আর নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা সংযমী, মিতব্যয়ী ও কৃষ্টিবান হয়। এজন্য সেখানে নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে উঠে এবং তারা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়। গ্রিক, রোমান, পারসিয়ান, আরবরা নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে বলে তারাও কৃষ্টি ও সভ্যতায় অনেক বেশি অবদান রাখতে সক্ষম। আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দার্শনিক জিন বোডিন, মন্টেস্কু প্রমুখ ইবনে খালদুনের এই চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক

এরিস্টটল রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। ইবনে খালদুনও উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "বস্তুর সাথে বস্তুর আকারের যে সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে সমাজের সম্পর্কও তেমন। সমাজের বাইরে রাষ্ট্রকে যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজও টিকতে পারে না।" অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, একটির ব্যতিক্রম ঘটলে অন্যটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তিনি মনে করেন, শাসকবর্গের

www.pathagar.com

পরিবর্তনে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না; কারণ শাসকবর্গ অস্থায়ী। কিন্তু কোন সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংহতি যখন ভিন্ন ধরনের সংহতি দ্বারা অপসারিত বা প্রভাবিত হয় তখনই ঐ সমাজের শাসক শ্রেণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি

ইবনে খালদুন মনে করেন যে, রাষ্ট্রের শাসনভার একক হাতে ন্যস্ত থাকাই শ্রেয়। এর ফলে রাষ্ট্রীক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতিও সাধিত হবে। রাষ্ট্রীক ক্ষমতা বহুধা বিভক্ত হলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কারণ তাঁর মতে, মানুষের স্বভাবে ও প্রকৃতিতে পশুসুলভ মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল। আর এর ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়। তাই পাশব প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য এককেন্দ্রিক শক্তিশালী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োজন। পরবর্তী কালের রাষ্ট্রদার্শনিক হবসের চিন্তাধারায়ও এই একই সুরের ব্যঞ্জনা লক্ষ্যণীয়। হবস রাষ্ট্রীক ঐক্য সাধনের জন্য এক শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন অনুভব করেন; যার হাতে থাকবে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা। সমাজের স্থায়িত্বের জন্য একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন যিনি জনগণকে আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিরত রাখবে। এই শক্তিশালী ব্যক্তির অপরিসীম ক্ষমতার প্রয়োগকে 'সার্বভৌম ক্ষমতা' (Sovereign Power) বলে। পরবর্তীকালে জিন বোডিনও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তবে ইবনে খালদুন নিরংকুশ সার্বভৌম শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও আসাবিয়াকেই রাষ্ট্রশাসনের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শনের মূল্যায়ন

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইবনে খালদুন রাষ্ট্রদর্শনে মৌলিক অবদানের জন্য প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুধীমহলে 'Aristotle of the East' হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইবনে খালদুন যে জ্ঞানগর্ভ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি আসাবিয়াত বা গোষ্ঠী সংহতি। আর পারস্পারিক নির্ভরশীলতা থেকে এই গোষ্ঠী সংহতির উৎপত্তি। অর্থাৎ মানুষ জীবন ধারণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অনুভব করে। গ্রিক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক Aristotle এর ন্যায় তিনিও বলেন, মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। আর সামাজিক মানুষ একাকী বাস করতে পারে না। পারস্পারিক নির্ভরশীল সামাজিক জীবনের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, চরম উন্নতি ও অবনতির মূলে রয়েছে গোষ্ঠী সংহতি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, যেই আসাবিয়াত বা গোষ্ঠী সংহতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সেই রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব একজন শাসকের হাতে ন্যস্ত হওয়াই শ্রেয়। কারণ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পশুবৎ। পাশবিক প্রবৃত্তির কারণে সমাজে কলহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে সামাজিক

www.pathagar.com

সংহতি বিনষ্ট হয়। তাই পশুবৃত্তি দমনের জন্য অবশ্যই শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীক সংহতি সুদৃঢ়করণের মানসে ইবনে খালদুন যে সূত্রটি আবিষ্কার করেন তাহল রক্তের সম্পর্ক। রক্তের সর্ম্পক পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরব বেদুঈনদের কথা উল্লেখ করেন যারা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করছে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে।

চতুর্থত, রাষ্ট্র ও সংহতির মূলে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবকে তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীক সংহতির মূলে রয়েছে ধর্ম। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কোন জাতির ও সম্প্রদায়ের মননে সাহসিকতা ও বীরত্বের স্পৃহা সঞ্চার করে। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ ধর্মবিশ্বাস শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়ক।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য তিনি অভ্যন্তরীণ সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সংহতি সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী চেতনা ও একাত্মতার ফলে। কখনো কখনো অনেক গোষ্ঠীর মাঝে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে সংহতি সাধন করে। আবার এই সংহতি সৃষ্টিতে কোন কোন প্রভাবশালী বংশ বা পরিবারের অবদানও থাকতে পারে; যেমন আরবের ইতিহাসে কুরাইশ বংশের প্রভাব।

ষষ্টত, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা ইবনে খালদুনকে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে স্থায়ী গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইতিহাস যে কেবল দেব-দেবী আর বাইবেলের কাহিনী নির্ভর হয়ে পড়েছিল তা থেকে মুক্ত করে তিনি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন। তিনি ইতিহাসকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বংশ বা যুগের প্রেক্ষিতে বিচার না করে বরং শাশ্বত ও সর্বজনীন মানবতার প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। মূলত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইতিহাস সম্পর্কে পূর্বের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

সপ্তমত, রাষ্ট্রনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক বিষয়ে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর মতে, কোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকা শক্তি হল তার বলিষ্ঠ অর্থনীতি। তিনি রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যাকাত, খারাজ, জিযিরা ইত্যাদি স্বাভাবিক করের (Tax) উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সেই সাথে অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন-মূল্যতত্ত্ব, যোগানতত্ত্ব , চাহিদাতত্ত্ব, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, "সুষম বাজেট স্থিতিশীল রাজনীতির মেরুদণ্ড।"

অষ্টমত, ইবনে খালদুন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করলেও তিনি শেষে স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। একটির ব্যতিক্রম হলে অপরটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অর্থাৎ বস্তুর সাথে বস্তুর আকারের যে সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে সমাজেরও সেই সম্পর্ক।

নবমত, সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। যে ঐতিহাসিক ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তার পক্ষে সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

দশমত, সমাজ ও মানুষের উপর ভৌগোলিক অবস্থা ও জলবায়ুর যে প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে তা ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছেন। সমাজে মানুষের চরিত্র গঠন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের উপর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, উষ্ণমণ্ডল ইত্যাদি অঞ্চলভেদে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি যেমন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় হয় তেমনি শাসনব্যবস্থায়ও ভিন্ন প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষ, উপরিউক্ত বিশদ, সারবান, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার নিরিখে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় কতগুলো মৌলিক অবদানের জন্য ইবনে খালদুন রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছেন যার জন্য 'Aristotle of the East' হিসেবে খ্যাত হয়েছেন, তেমিন তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা পরবর্তীকালের অনেক দার্শনিক যেমন হবস, মন্টেস্কু, ভল্টেয়ার গীবন প্রমুখ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ইবনে রুশদ
Ibn Rushd or Averroes [1126-1198 AD]

দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ যিনি ইউরোপীয় দর্শনের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন তিনি হলেন ইবনে রুশদ বা Averroes. বিরল প্রতিভার অধিকারী ইবনে রুশদ পূর্বোক্ত আল-ফারবীর সমগোত্রীয় দার্শনিক। প্রাচ্যের রাষ্ট্রদর্শনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ইবনে রুশদ স্পেনের কর্ডোভায় ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ। তাঁর পিতা ও পিতামহ কর্ডোভায় নামকরা আইনজীবী ছিলেন। তারা তৎকালীন আল মুবাবীদ ও আল মোহাদ সুলতানদের আমলে কাজীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সে সময় তারা সরকারী প্রশাসনে সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইবনে রুশদ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোরআন হাদিস ও ফেকাহসহ দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ইবনে রুশদ পাশ্চাত্যে এভেরুজ নামেও পরিচিত।

ইবনে রুশদের জীবন ও কর্ম

ইবনে রুশদ যখন বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেন তখন স্পেনের আল মোহাদ খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ও তদীয় পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মুনসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসময় তিনি রাজ পরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান দিয়েই নয় ইবনে রুশদ ফিকাহ ও দর্শনের জ্ঞান দিয়েও খলিফার মন জয় করেন। তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আল মোহাদ খলিফাদের সাহচার্যে নিয়ে আসে। গ্রিক দর্শনে তার অগাধ এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে সুলতান ইয়াকুব ইউসুফ তাকে প্লেটো ও এরিস্টটলের মূল গ্রন্থ সমূহের ভাষা রচনার নির্দেশ দেন। এর ফলে প্লেটোর "রিপাবলিক" ও এরিস্টটলের

www.pathagar.com

"নিকোমেকিয়ান এথিকস"-এর পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেডিলের এবং ২ বছর পর কর্ডোভার কাজী নিযুক্ত হন। ১১৮২ সালে তিনি আন্দালুসিয়ার কাজী উল কুযযাতের পদও অলংকৃত করেন।

আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল মুনসুর খলিফা নিযুক্ত হলে তার সাথেও ইবনে রুশদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ইবনে রুশদের দর্শনের ভুল ব্যাখ্যায় আলেম সমাজ বিক্ষুপ্ত হয়ে উঠলে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অবশেষে ১১১৪ সালে খলিফা আল মুনসুর তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। শাহী দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি কর্ডোভায় বসবাস করতে থাকেন। পরে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা পুনরায় তাকে শাহী দরবারে ফিরিয়ে আনেন এবং পূর্ব পদে বহাল করেন। পূর্ব পদে ফিরলেও ইবনে রুশদের মনমানসিকতা ভেঙ্গে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত তিনি ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর রচনাবলি
His Books

ইবনে রুশদের কতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার সঠিক কোন হিসাব নেই। অধ্যাপক রোজেন্থালের মতে, সম্ভবত ইবনে রুশদের বহু রচনা এখনও উত্তর আফ্রিকার লাইব্রেরী গুলোতে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে। এ পর্যন্ত তার যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে প্লেটোর 'রিপাবলিক' ও এরিস্টটলের "নিকোমেকিয়ান এথিক্স" এর ভাষ্য। কিতাবুল ফালসুফা, ফসল আলমাকাল, তাহাফুত আল তাহাফুত, এবং কুল্লিয়াত ফিততীব তার মহা মূল্যবান গ্রন্থ। তাহাফুত আল তাহাফুত ইমাম আল গাজ্জালীর তাহাফুত আল ফালসুফা'র প্রতিবাদে লিখেন তিনি। ভেষজবিদ্যা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কুল্লিয়াত ফিততীব গ্রন্থে।

ইবনে রুশদের রাষ্ট্রচিন্তা
Political Thought of Ibn Rushd

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কাছে ইবনে রুশদের চিন্তা চেতনা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ইবনে রুশদের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ান এথিক্স এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। ইবনে রুশদের দর্শন ও চিন্তায় অসাধারণ প্রতিভার ছাপ দেখে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এসময় কেউ কেউ তাকে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যের পণ্ডিত বলেই মনে করেন।

ইবনে রুশদের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে অতীতে বহুদিন পর্যন্ত "দ্বৈত সত্য তত্ত্বের" যে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল বর্তমানে তা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য পণ্ডিত মাত্রই এখন স্বীকার করেন যে, তিনি এক ও অভিন্ন সত্যের কথাই প্রচার করেন এবং সে সত্য হচ্ছে মূলত শরীয়ার সত্য। তাহাফুত আল তাহাফুত গ্রন্থে আল গাজ্জালীর

www.pathagar.com

বিরোধিতা করে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাতে তিনি 'ওহি' ও রেসালাতের সত্যকে অস্বীকার তো করেন নি, এমনকি তাকে দর্শনের সত্যের সাথে এক পংক্তিতেও সংস্থাপন করেন নি। আদর্শ রাষ্ট্রের সংবিধানে তিনি শরীয়ার বিধানকেই চূড়ান্ত বিধান বলে স্বীকার করেছেন। সেন্ট টমাস একুইনাস ইবনে রুশদের দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, তিনি দর্শনের প্রতিটি বিভাগে গ্রিক কাঠামোর উপর ইসলামী প্রত্যাদেশের চূড়ান্ত সংস্থাপন করেন। মন্টেগোমারী ওয়াটের মতে, তাঁর জীবন ও চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুতে একই প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা অনুরণিত হতে থাকে এবং তা হল এই যে "দর্শন ও প্রত্যাদেশ উভয়ই সত্য"। ইবনে রুশদ এরিস্টটলের মধ্যযুগীয় প্রামাণ্য ভাষ্যকার হিসেবে যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটুকুই ইসলামের ধর্মীয় দার্শনিক হিসেবেও তার গুরুত্ব সমান।

ইবনে রুশদের রাষ্ট্র দর্শনে প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী (Concept of Profecy) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তিনি প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র এবং ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হন।

ইবনে রুশদের মূল্যায়ন
Evaluation of Ibn Rushd

মধ্যযুগীয় মুসলিম চিন্তানায়কদের মধ্যে ইবনে রুশদই ইউরোপীয় চিন্তাধারার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান হল এই যে, তিনি প্লেটো এবং এরিস্টটলের রাষ্ট্রদর্শনকে সঠিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেন এবং ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্রের সাথে গ্রিক মনীষীদের কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের যে কোন পার্থক্য নেই এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র এবং গ্রিক মতবাদের কল্পিত রাষ্ট্রের মধ্যে দৈব্য প্রত্যাদেশের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর আরেকটি অবদান হল, তিনি গ্রিক আদর্শ রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্রের তুলনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এই সব রাষ্ট্র প্লেটো, এরিস্টটলের আদর্শ বিচ্যুত রাষ্ট্রের বেশি আর কিছুই নয়।

নিজাম-উল মুল্ক তুসী
Nizam-Ul-Mulk Tusi [1063-1072]

তুস ও খাবু শানের নিকটবর্তী রাদকান গ্রামে ১০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল নিজাম উল মুলক তুসী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আলী আল হাসান ইবনে আলী ইবনে ইসহাক আল তুসী। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি নিজাম উল মুল্ক তুসী নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর পিতা ছিলেন গযনবী রাজ্যের একজন কর আদায়কারী। পিতামহ ইসহাক ছিলেন বায়কাহের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একজন গ্রাম্য কৃষক। সালজুক সুলতান আরসালান ও মালিক শাহ'র প্রসিদ্ধ উজির হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন নিজাম উল মুল্ক তুসী।

www.pathagar.com

তাঁর শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবন

নিশাপুরের প্রসিদ্ধ শাফেয়ী আলেম হিবাতুল্লাহ আল মুল্‌ক তুসীর মুয়াফফাক এর কাছে তিনি শিক্ষালাভ শুরু করেন। একসময় খোরাসানের বিরাট অংশ সালজুকদের হস্তগত হলে নিজাম উল মুল্‌ক এর পিতা আলী তুস হতে পলায়ন করে নিঃস্ব অবস্থায় স্বীয় জন্মভূমি বায়হাক-এ চলে এসে গাযনার পথ ধরেন। এসময় নিজাম উল মুল্‌ক তুসী তাঁর পিতার সাথেই ছিলেন। এসময় তিনি সরকারী চাকুরী পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বালখ এর সেনাপতি চাখরী বেগ এর অধীনে কাতিব হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি নিজ যোগ্যতাবলে সালজুক সুলতান আল্‌প আরসালানের অধীনে মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। পরে হামিদুল মুল্‌কের মৃত্যুর পর তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ধারণা করা হয়, এ সময় তিনি নিজামুল মুল্‌ক উপাধী ধারণ করেন।

কর্মজীবনে নিজাম উল্‌ মুল্‌ক তার মূল্যবান ভূমিকা ও কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলির জন্য আল্প আরসালানের ও মালিক শাহ'র কাছ থেকে সম্মান জনক খেতাব লাভ করেন। বাগদাদের নামমাত্র খলিফা আল কাইমও তাঁকে সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত করেন। বহুবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের খেতাব যথেষ্ট নয় মনে করে তৎকালের মহান সাধক শেখ আব্দুল মালিক আল জাওয়ানী তাঁকে বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য আরও কতিপয় বীরত্বব্যাষ্টিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

অক্সাস ও জাক্সেরটাস থেকে বসফরাস পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তিনি শুধু সুপরিচিত ছিলেন না বরং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত সুগভীর মতামত তাঁকে পৃথিবীব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছিল। তিনিই বাগদাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়া ইস্কাহাল নিশাপুর, মার্ভ, মসিল, হিরাট, বসরা, তুস প্রভৃতি স্থানে তিনি অসংখ্য কলেজ স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ বিস্তার করেন।

নিজাম উল মুল্‌ক তুসীর রচনাবলি

শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে নিজাম উল মুল্‌ক তুসী "সিয়াসত নামা" ও "মাজমাউল ওয়াসায়া" নামক দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি সিয়াসত নামা রচনা করেন। এ গ্রন্থটি নিজাম উল মুল্‌ক এর জ্ঞান গরিমার স্বাক্ষর বহন করে। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উঠে এসেছে সিয়াসত নামায়। ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত সিয়াসত নামা'র শেষ অধ্যায়ে শেষ পৃষ্ঠায় এর নামকরণ করা হয়েছে "কিতাব সিয়াসাত"। নিজাম উল মুল্‌ক এর সিয়াসত নামা সিয়ারুল মুলক নামেও পরিচিত।

কিতাবুল ওয়াসায়া নামের প্রসিদ্ধ বইটিও নিজাম উল মুল্‌ক এর গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এটি "দাসতারুল উযারা" নামেও পরিচিত। এ গ্রন্থে তিনি মন্ত্রিপরিষদ, তার

www.pathagar.com

সমস্যা ও সম্পর্ক বিষয়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন। এটি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটি সংকলন। এছাড়াও নিজাম উল মুলক ভ্রমণ কাহিনীসহ আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা
His Political Thought

রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজাম উল-মুলককে মেকিয়াভেলির পূর্বসূরী বলা হয়। উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তার বাস্তবতা বড় নির্মমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে ম্যাকিয়াভেলির সাথে নিজাম উল মুল্‌ক এর পার্থক্যও আছে যথেষ্ঠ। নিজাম উল মুলক এর নীতি প্রধানত সর্বসাধারণের কল্যাণ অভিসারী। অপরপক্ষে মেকিয়াভেলির নীতি রাজা ও রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশি যত্নবান।

রাষ্ট্রপতি বা খলিফা

রাষ্ট্রপতি বা খলিফা সম্পর্কে নিজাম উল মুলক তুসী বলেন, আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক নির্বাচন করে বিশ্বের মানুষের জন্য সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত তথা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির ভার অর্পণ করেন। দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মূলত তিনিই দায়ী। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমন করে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে সুখ শান্তি নিরাপত্তা বিধান করা তাঁর দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

তিনি আরও বলেন যে, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই শাসনকার্য পরিচালনা করাই শ্রেয়। শাসন কর্তাকে একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদা সে সকল শাসন কর্তাকেই ভালবাসেন যারা ন্যায়বিচার ও মহানুভবতা দ্বারা জনগণকে সেবা করেন।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। তিনি বলেন, যারা আইন শাস্ত্রে পরাদর্শী এবং যারা সব রকমের সন্দেহমুক্ত তাদেরকেই বিচার কাজের মত দূরূহ কাজে নিযুক্ত করতে হবে। বিচারকের উচ্চ বেতন ভাতা ও সর্বোচ্চ সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথাও তিনি বলেন।

রাজা ও রাজদরবার

নিজাম-উল-মুলক রাজার বন্ধু বান্ধবকে রাষ্ট্রীয় পদ দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তার মতে

www.pathagar.com

রাজার বন্ধু বান্ধব থাকবে তবে তাদের সাথে মেলা মেশার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে। রাজদরবার থেকে কথায় কথায় নির্দেশ দান না করে কেবল অতি জরুরী এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশ জারির পক্ষে মত দেন। রাজ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিজাম উল মুল্‌ক তুসী শাসন কর্তাকে তীক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী হতে বলেন। যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের ও মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারেন কেবল তাদেরকেই রাজ কার্যে নিয়োগ দেবার পরামর্শ দেন। অসৎ এবং অকর্মণ্য লোক দিয়ে কোন দিনও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সরকারি কর্মচারী

সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা, সৈনিক নিয়োগ এবং সৈনিকদের বেতন ভাতা নিয়েও তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। রাজার নিজস্ব প্রহরী এবং রক্ষী সম্পর্কে খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিমান রাজারা এবং চতুর মন্ত্রীরা কোনকালেই এক ব্যক্তিকে দুই পদে নিয়োগ দিতেন না বা দুই ব্যক্তিকে একই পদে নিযুক্ত করতেন না।

গুপ্তচর বিষয়ে

তুসী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গুপ্তচর নিয়োগের বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলেছেন। গুপ্তচররা কিভাবে চলাফেরা করবে এবং তারা নিজ দেশের স্বার্থে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে সেসব পদ্ধতিও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন কলা কৌশলের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা শোনা একজন সফল রাজার কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

কর্মচারিদের আচরণ

একজন শাসক তার রাজকর্মচারীর প্রতি কিরূপ আচরণ করবেন তাও তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন। রাজার প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আচার ব্যবহার সবকিছুই নিজাম উল মুলকের বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা

তিনি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাঁর মতে, কখনোই নারীর হাতে রাজ ক্ষমতা দেয়া উচিৎ হবে না। তিনি বলেন, নারীর হাতে ক্ষমতা দিলে অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। রাজার স্ত্রীরা যখন ক্ষমতায় আসীন হয় তখন স্বার্থান্বেষীদের

www.pathagar.com

কথামতই তারা দেশ পরিচালনা করেন। যে যুগের স্ত্রীরা রাজার উপর কর্তৃত্ব করেছেন সে যুগেই অপযশ, মতভেদ এবং দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

তাঁর মতে, সুলতানদের দুটি রাজকোষ থাকতে হবে, একটা সঞ্চয় রাজকোষ এবং অন্যটা ব্যয় রাজকোষ। তিনি প্রদেশসমূহের রাজস্ব আয় ব্যয়ের হিসাব রাখারও উপদেশ দেন। অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হলে রাজাকে ন্যায়পরায়ণ হবার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, রাজার মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার মধ্যেই কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভর করে।

পরিশেষে নিজাম উল মুলক তাঁর ধৈর্য্য এবং প্রজ্ঞা দিয়ে অল্প সময়েই সাধারণ মানুষের মন যেমন জয় করেছেন তেমন শাসকদেরও প্রিয়জন হয়েছেন। তিনি শাসন কার্যের যাবতীয় বিশ্লেষণ করে বাস্তব সম্মত পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর মত ও নির্দেশিত পথ একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আভাস দেয়। এজন্য নিজাম উল মুলক রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে একজন আদর্শ মুসলিম দার্শনিক হিসেবেই মূল্যায়িত হচ্ছেন।

আল মাওয়ার্দী
Al-Mawardi [972-1058 AD]

আল মাওয়ার্দী ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বসরার এক প্রাচীন আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল মাওয়ার্দী। বাল্যকাল হতেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, হাদিস, তাফসীর, ফিকহ, আইনশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। বসরার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শাফেয়ী আলেম ও আইনবেত্তা আব্দুল ওয়াহেদ আস সাইমারীর নিকট তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্র ও শরীয়া সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। বসরার পল্লবিত গোলাপের মতই তাঁর সৌরভ, ধর্মশক্তি ও প্রজ্ঞার দীপ্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বসরায় পড়াশোনা সমাপ্ত করে তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে বিভিন্ন জ্ঞান সাধকের নিকট ব্যাকরণশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ও কাব্য বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জনে সফল হন।

আল মাওয়ার্দীর জীবন ও কর্ম

ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী আল মাওয়ার্দীকে অর্থনৈতিক রাজনীতি বিজ্ঞানী ও আইনবেত্তা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে আল মাওয়ার্দী প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হিসেবে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। আল মাওয়ার্দী খেতাব গ্রহণের পেছনে তার পিতৃকুলের গোলাপ নির্যাসের ব্যবসায় প্রধানত দায়ী বলে মনে করা হয়।

www.pathagar.com

আল মাওয়ার্দীর জ্ঞানার্জনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ছিল। তাঁর ওস্তাদ তৎকালের প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা হাসান আলী জাবালী একজন বিজ্ঞজন। তিনি আল মাওয়ার্দীর জ্ঞান লাভের প্রয়াসে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে আল মাওয়ার্দী হাদিস তাফসির, ইসলামী আইনতত্ত্ব ও মহানবীর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

প্রথমে ইসলামী আইনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন জন্মভূমি বসরাতেই। পরে বাগদাদে গমন করেন অধ্যাপনার জন্য। আইনশাস্ত্রে তার জ্ঞানের গভীরতা তাকে আকাশচুম্বী যশ এনে দেয়। ফলে তাকে বাগদাদের কাজী উল কুযযাত পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয় পরে তাকে আফজাল উল কুযযাত বা সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারপতি খেতাবে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারন ক্ষমতার কোন মোহ তাঁর মধ্যে ছিল না।

আল মাওয়ার্দী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাগদাদের বিচারপতি পদে আসীন ছিলেন এবং এখানেই ছিয়াশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জীবনীকারগণ উচ্ছসিত প্রশংসা করে কখনো তাকে মহান কখনো অত্যন্ত বিজ্ঞ নেতা এবং শাফী মতবাদের একজন সেরা অনুসারী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আল মাওয়ার্দী কেবল আদর্শ বিচারপতিই ছিলেন না, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আইন শাস্ত্রেও তার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে সৎপ্রকৃতির ছিলেন বলে যা কিছু অন্যায় ও শরীয়ত বিরুদ্ধ তা নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। তাছাড়া স্বাধীন চিন্তা ও বলিষ্ঠ মতবাদের জন্য তিনি বিদগ্ধ সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

তাঁর রচনাবলি
His Books

আল মাওয়ার্দীর রচনাবলির মধ্যে রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর রচিত ৪টি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থগুলো হল—১. আহকামউস সুলতানিয়া বা রাষ্ট্রনীতি ২. নাসিহাতুল মূলক বা বাদশাহর জন্য উপদেশ ৩. কাওআনিনুল উখারত বা মন্ত্রীবিষয়ক আইন ৪. তাহমিনুল নসর ফি তাযমিয় যাকর বা জয়লাভের জন্য দৃষ্টিশক্তির নিয়ন্ত্রণ। এছাড়াও তিনি আলামুন নবুওয়ত, দালাইলুল-নবুয়াহ গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি আইন শাস্ত্রের উপরেও কিতাবুল হাবিফিল ফরু নামক ৩০ খণ্ডের একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনবেত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তীকালে তিনি "আল ইক্না" এবং "আদাবুদ দুনিয়া ও দীনে" রচনা করেন।

আল মাওয়ার্দীর রাষ্ট্রচিন্তা
Political thought of Al-Mawardi

আল মাওয়ার্দীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা

www.pathagar.com

যায়। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোরআন, মহানবী (স) এর বাণী তথা হাদিসের মূল ভিত্তি হতেই ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বগত পরিচয় পাওয়া যায়।

আল মাওয়ার্দীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রে ইমাম বা রাষ্ট্রনেতা সকলের উর্ধে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রনেতা আল্লাহ প্রদত্ত আইন মোতাবেক সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করবেন এবং সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবেন এটাই কাম্য। তার নীতি হবে সকলের ঈমান ও রাজনৈতিক বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলা এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী সকল বিরোধ নিস্পত্তি করা। তার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তিনি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবেন আইনভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান করবেন, কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন ভাতা ও সুবিধাদি যাতে ঠিকমত পেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। তিনি সবসময় যোগ্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন এবং সকল বিলাসিতা বর্জন করবেন।

আল মাওয়ার্দীর মতে, রাষ্ট্রনেতা হবেন সমগ্র সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এদিক হতে রাষ্ট্রনেতাকে একটি অবিমিশ্র ন্যায়বোধসম্মত প্রতিনিধিও বলা যেতে পারে। তবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রনেতার নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত কিনা সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট কোন আভাস দেন নি। তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে দু'প্রকার পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে যেমন : ১. রাষ্ট্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন এবং ২. বিদায়ী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনয়ন। জ্ঞানী ব্যক্তিদের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাদের ন্যায় অন্যায় শুভ ও অশুভ এবং যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পার্থক্য করার বিচার ক্ষমতা থাকতে হবে। সুতরাং কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিক হলেই রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্যান্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার পেতে পারে না। এর জন্য বিচারশক্তি ও ন্যায় বুদ্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে।

আল মাওয়ার্দীর মূল্যায়ন

আল মাওয়ার্দীর মত বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞান সাধকদের মৃত্যুতে ইবনে বলতান নামক সমসাময়িক একজন বিখ্যাত খ্রিস্টান চিকিৎসক বলেন, "তাদের অকাল মৃত্যুতে শিক্ষার মশাল সহসা নিভে গেল আর মানুষের জ্ঞান গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল।"

আল মাওয়ার্দী একজন পুত পবিত্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁর স্বভাব মধুর এবং ব্যবহার সহৃদয় নম্র ও অমায়িক ছিল। খিলাফতের আফফাল কুযযাত বা সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের পদে আজীবন অধিষ্ঠিত থাকায় এবং বহুবার খলিফার বিশ্বস্ত দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় তার খ্যাতি ও সম্মান যেমন অসামান্য ছিল সেরকম তার অর্থ সম্পদও প্রচুর ছিল। কিন্তু এসবের দরুন তার বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না।

আল মাওয়ার্দী বাক সংযমী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর শালীনতা জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। মাওয়ার্দী অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন এবং যা অন্যায় তা নিঃসংকোচে প্রকাশ করে অন্যায়কে কখনো মেনে নিতেন না।

আল মাওয়ার্দী বলিষ্ঠ মতবাদের জন্য সেকালের বহু আলিম তাকে মুতাযিলা পন্থী বলে দোষারোপ করেছেন। তারপরও আমরা আল-মাওয়ার্দীর চিন্তাধারার আলোকে বিজ্ঞতার সাথে

www.pathagar.com

বলতে পারি যে তিনি রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ মতামত ব্যক্ত করেছেন রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহার উহার গুরুত্ব অপরিসীম।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. আল ফারাবীর রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss AL-Farabi's views regarding the state.]

২. আল ফারাবীর মতে রাষ্ট্র প্রধানের কি কি গুণাবলি থাকা উচিত?
[What are the qualities of a head of the state should possess according to Al-Farabi?]

৩. আল ফারাবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of AL-Farabi]

৪. রাষ্ট্রদর্শনে আল ফারাবীর অবদান মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the political philosophy of Al-Farabi.]

৫. ইবনে সিনার রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Inb-Sina.]

৬. রাষ্ট্রদর্শনে ইবনে সিনার অবদান আলোচনা কর।
[Discuss the contribution of Ibn-Sina to political philosophy.]

৭. আল গাজ্জালীর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Al Gazzali.]

৮. ইমাম আল গাজ্জালীর মতে যোগ্য শাসকের কি কি গুণ থাকা উচিত?
[What qualities a ruler should have according to Immam Al-Gazzali?]

৯. ইমাম আল গাজ্জালীর রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the political philosophy of Imam Al-Gazzali.]

১০. রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মতামত ব্যাখ্যা কর।
[Explain Ibn-E-Khaldun's views regarding the origin and development of the state.]

১১. ইবনে খালদুনের মতে রাষ্ট্রশাসনের ভিত্তি কি? রাষ্ট্রের কার্যকাল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[What is the basis of government according to Ibn-E-Khaldun? Explain views regarding the tenure of the state.]

১২. ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়াত' বা গোষ্ঠী সংহতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss Ibn-E-Khaldun views of Asabiyat.]

১৩. ইবনে খালদুনের আবহাওয়া ও জলবায়ু তত্ত্ব আলোচনা কর।
[Discuss the theory of weather and climate of Ibn-E-Khaldun.]

www.pathagar.com

১৪. সমাজ ও জনগণের উপর জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব সম্পর্কে ইবনে খালদুনের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
[Explain the concept of Ibn-E-Khaldun about the influence of climate and topography on a society and people.]

১৫. ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Inb-E-Khaldun]

১৬. রাষ্ট্রদর্শনে ইবনে খালদুনের অবদান মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the contribation of Ibn-E-Khaldun to political philosophy.]

১৭. ইবনে রুশদ এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা কর।
[Explain the political thouhgts of Ibn Rushd.]

১৮. ইবনে রুশদ এর রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the political philosophy of Inb Rushd.]

১৯. নিজাম-উল মুলক তুসীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Nizamul Mulk Tusi.]

২০. আল মাওয়ার্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of AL-Mawardi.]

২১. আল মাওয়ার্দীর রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর।
[Evaluate the political philosophy of AL-Mawardi.]

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ
Indian Political Thinkers

❑ প্রাক-কথা, অতীশ দীপংকর, কৌটিল্য, আল্লামা আবুল ফজল, মহাত্মা গান্ধী, ড. আল্লামা ইকবাল, মানবেন্দ্র নাথ রায়

প্রাক-কথা
Introduction

প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্রচিন্তার চারণক্ষেত্র হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা স্বকীয় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় যে অগ্রগতি অর্জন করে তাকে কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং ভারতকে পরিণত করে পরাধীন উপনিবেশে। এই সুযোগে পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যমন্ডিত ইতিহাসকে অস্বীকার করে। কিন্তু যে কারণে পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাকে অস্বীকার করেন তা নিতান্তই অযৌক্তিক। ভারতের মত বৃহৎ একটি দেশে রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ঘটেনি তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের ভাষ্যকার বিনয়কুমার সরকার মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এমন কোন শাখা ছিল না যেখানে রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিষয়ক গ্রন্থাবলি মানগত দিক দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে তুলনীয় ছিল। সুতরাং প্রাচীন ভারতে যে উন্নতমানের রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা নিম্নের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতীশ দীপংকর
Atish Dipankar [980–1053 AD]

অতীশ দীপংকর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মগুরু ও দার্শনিক। বাংলাদেশে পাল বংশের শাসনামলে যে বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অগ্রগতি সাধিত হয় তার মূলে ছিলেন অতীশ দীপংকর। মহাপণ্ডিত অতীশ দীপংকর পাল যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দশম-একাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার

www.pathagar.com

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে এক রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কমল এবং মাতা প্রভাবতী দেবী। তাঁর বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি পিতা মাতার মেজো ছেলে ছিলেন। অতীশের বড় ভাই পদ্মগর্ভ ছোট ভাই শ্রীগর্ভ।

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম এখনও রয়েছে। তবে এখন আর তার তেমন কোন ঐতিহ্য নেই। এখানে এখনও অতীশের ভিটা নামে একটি স্থান আছে। তবে এখানকার লোকজন এখনও গর্বের সাথে উচ্চারণ করে যে অতীশ দীপংকর এ গ্রামেরই সন্তান ছিল।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন : মায়ের নিকট এবং স্থানীয় বজ্রাসন বিহারে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধগুরু জেতারির নিকট 'বৌদ্ধধর্ম' ও দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ঠিক এ সময়ই তার জীবনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। যার প্রভাবে তিনি সংস্কারের প্রতি বিরাগ বশত গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের সংকল্প করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহারে গিয়ে রাহুল গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গুহ্য বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। মগধের ও দন্তপুরী বিহারে মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তার নামকরণ হয় 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান'। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি আচার্য ধর্মরক্ষিত কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীভূক্ত হন। এরপর তিনি মগধের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আচার্যের নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করে শূন্য থেকে জগতের উৎপত্তি এই তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত এ তত্ত্ব শূন্যবাদ নামে পরিচিত।

এরপর ১৯১১ সালে শতাধিক শিষ্যসহ দীপংকর মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে চলে যান। সেখানে তিনি আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট ১২ বছর বৌদ্ধশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং ৪৩ বছর বয়সে ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে মগধে ফিরে আসেন। মগধের তখনকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও বিতর্ক হয়। বিতর্কে তাঁর বাগ্মিতা, যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁরা পরাজিত হন। এভাবে ক্রমশ তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের স্বীকৃতি লাভ করেন।

অতীশ দীপংকরের পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তায় অভিভূত হয়ে বাংলাদেশের পালরাজ প্রথম মহীপাল সসম্মানে তাঁকে বিক্রমশিলা (ভাগলপুর, বিহার) মহাবিহারের আচার্যপদে নিযুক্ত করেন। বিক্রম শিলাসহ দন্তপুরী ও সৌমপুর বিহারে দীপংকর ১৫ বছর অধ্যাপক ও আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সোমপুর বিহারে অবস্থানকালেই তিনি মধ্যমকর রত্নপ্রদীপ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এ সময় মহীপালের পুত্র নয়পালের সঙ্গে কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের যে যুদ্ধ হয়, দীপংকরের মধ্যস্থতায় তার অবসান ঘটে এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এ সময় বৌদ্ধ রাজা লাঃ লামা ইয়োসি হোড় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি কামানায় দীপংকরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বর্ণ উপহার ও পত্রসহ বিক্রমশীলায় দূত প্রেরণ করেন। দূত জানান যে, দীপংকর তিব্বতে গেলে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান জানান হবে। কিন্তু নির্লোভ নিরহংকার দীপংকর এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজা লাঃ লামার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাং চুব জ্ঞানপ্রভ তিব্বতের রাজা হন। তাঁর একান্ত অনুরোধে ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতসহ দীপংকর মিত্র বিহারের পথে

www.pathagar.com

তিব্বত যাত্রা করেন। মিত্র বিহারের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এই দলকে অভ্যর্থনা জানান। এছাড়াও পথিমধ্যে অনেক জায়গায় তারা অভ্যর্থিত হন। নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি দীপংকরকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন। তিনি সেখানে খান বিহার নামে একটি বিহার স্থাপন করেন এবং নেপালের রাজপুত্র পদ্মপ্রভকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

তিব্বতরাজ চ্যাং চুব দীপংকরের শুভাগমন উপলক্ষে এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করেন যার দৃশ্য সেখানকার একটি মঠের প্রাচীরে আজও আঁকা আছে। সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে শুধু দীপংকরের উদ্দেশ্যেই 'রাগদুন' নামক এক বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। এ সময় রাজা চ্যাং চুব প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে, দীপংকরকে তিব্বতের মহাচার্য ও ধর্মগুরু হিসেবে মান্য করা হবে। পরবর্তীতে দীপংকর তিব্বতে এ সম্মান পেয়েছেনও।

তিব্বতে থোমলিং বিহার ছিল দীপংকরের মূল কর্মকেন্দ্র। এই বিহারে তিনি দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখান থেকেই তিনি তিব্বতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ব্যভিচার দূর হয় এবং বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মাচার্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে তিনি মহাযানীয় প্রথায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করেন এবং বৌদ্ধ কদম্ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতবাসীরা তাঁকে বুদ্ধের পরেই শ্রেষ্ঠ গুরু হিসেবে সম্মান ও পূজা করে এবং মহাপ্রভু হিসেবে মান্য করে। তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী লামারা নিজেদের দীপংকরের শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীপংকরের প্রভাব আজও বিদ্যমান। তিব্বতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি তিব্বতের একটি নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে জনহিতকর কাজেও অংশগ্রহণ করেন।

দীপংকর তিব্বতের ধর্ম, রাজনীতি, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রনামসহ ত্যঞ্জুর নামে এক বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাই অতীত তিব্বতের যে কোন বিষয়ের আলোচনা দীপংকরকে ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। এসব গ্রন্থ তিব্বতে ধর্মপ্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

তিব্বতে তিনি তিব্বতীদেরকে বৌদ্ধধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্মে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে গেলে আগে দরকার নৈতিক উন্নতি। এ লক্ষ্যে তিব্বতে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'বোধি-পথ-প্রদীপ। এ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের কথা যত না লেখা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে নীতির কথা। তিনি ধর্ম সংস্কারের চেয়ে নৈতিক সংস্কারের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তার গ্রন্থে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা বলেন। এই তিন শ্রেণীর মানুষ হল—

(ক) উত্তম মানুষ

(খ) মধ্যম মানুষ ও

(গ) অধম মানুষ।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের লক্ষণ নিম্নরূপ :

উত্তম মানুষ : উত্তম তাকেই বলা হয়, যে নিজেকে কষ্ট দিয়ে সর্বদা অন্যের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

মধ্যম মানুষ : এ শ্রেণীর মানুষ সংসার সুখের প্রতি উদাসীন আর কোন পাপ কাজও করে না অথচ যে শুধুই নিজের ভালোর কথা চিন্তা করে।

অধম মানুষ : এ শ্রেণীর মানুষ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ আর সংসার সুখের জন্য কাজ করে।

এভাবে তিব্বতে সমাজ, সংসার ও রাজনীতিতে অতীশ দীপংকর এক বিশাল প্রভাব বলয়ের সৃষ্টি করেন এবং তিব্বতকে বিশ্ববাসীর নিকট একটি শান্তির পাদপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এ সকল মহান কীর্তি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্ত দুটি লাইনের মাধ্যমে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন –

"বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপংকর।"

বাংলার এ মহান ব্যক্তিত্ব ও ধর্মগুরু সুদীর্ঘ ১৩ বছর তিব্বতে অবস্থানের পর ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতের লাসা নগরের নিকটস্থ লেখান পল্লীতে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিস্থল লেখানে তিব্বতিদের তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন দীপংকরের পবিত্র চিতাভস্ম চীন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয় এবং বর্তমানে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত আছে।

সবশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অতীশ দীপংকর ছিলেন মানবতার পূজারী, যার কোন দেশকালপাত্রভেদ ছিল না। বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষকে তিনি নিজের দেশ, নিজের মানুষ বলে ভাবতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানবজাতির মুক্তির পথ প্রদর্শন করে গেছেন।

কৌটিল্য
Kautilya

কৌটিল্যের মহামূল্যবান গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র (Arthashastra) ভারতীয় রাজশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ হলেও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত যে এই গ্রন্থ থেকে হয়েছিল সেকথা বলা যায় না। ধারণা করা হয়, গ্রন্থ রচনার সময় কৌটিল্যের সামনে অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ঐতিহ্য অবশ্যই ছিল এবং পূর্বকালীন আচার্যগণের দণ্ডনীতিবিষয়ক চিন্তাভাবনার মধ্যে সমন্বয় করে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় স্পষ্ট ভাষায় তাঁর পূর্বসূরীগণের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন।

কৌটিল্যের পরিচয়

কৌটিল্যের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে তাঁর তিনটি নাম পাওয়া যায়। যথা : চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত এবং কৌটিল্য।

এক, খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-এ চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন। চাণক্যকে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী এবং তার পূর্ববর্তী নন্দবংশের ধ্বংসকারীরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। চাণক্য

www.pathagar.com

তক্ষশীলায় এক বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবে যেদাদিসহ নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চণক ঋষি, এজন্য তাঁর নাম হয়েছিল চাণক্য। অথবা, চণক নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল চাণক্য, এই অভিমতও কেউ কেউ পোষণ করেন।

দুই, কৌটিল্যের দ্বিতীয় নাম বিষ্ণুগুপ্ত। কামদকীয় নীতিসার, দণ্ডীর দশকুমার চরিত, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটক ইত্যাদি গ্রন্থে অর্থশাস্ত্র রচয়িতা হিসেবে বিষ্ণুগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণানুযায়ী, বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্যের পিতৃপ্রদত্ত নাম।

তিন, বিষ্ণুগুপ্ত তথা চাণক্যের একটি তৃতীয় নামরূপে 'কৌটিল্য' এই সংজ্ঞাপদটির উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। বস্তুত 'কৌটিল্য' এই বিশেষ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেও 'ইতি কৌটিল্যঃ' বা 'নেতি কৌটিল্যঃ' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা অর্থশাস্ত্রের প্রবক্তারূপে কৌটিল্য নামটিই উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, কৌটিল্যপদটি 'কুটিল' শব্দ থেকে বুৎপন্ন ভাববাচক বিশেষ্য এবং এর অর্থ কুটিলমতিত্ব।

তবে এই বিবরণটিই সর্বজনবিদিত যে, বিষ্ণুগুপ্ত, চাণক্য এবং কৌটিল্য তিন নামের এই ব্যক্তিই তাঁর কূটবুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের ধ্বংস ঘটিয়ে মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন এবং অর্থশাস্ত্র ঐ সময়েই অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
Kautilya's Arthashastra

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তু রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা ও তত্ত্বনির্ণয় হলেও গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'অর্থশাস্ত্র'। গ্রন্থের পুঁথিতে রচয়িতা গ্রন্থটিকে 'অর্থশাস্ত্র' নামেই উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য গ্রন্থের প্রারম্ভে মানবজাতির প্রধান কাম্য যে অর্থ বা সম্পদ তার আধারস্বরূপ ভূমির অর্জন এবং পালনবিষয়ক যে শাস্ত্র তাকেই অর্থশাস্ত্র বলেছেন। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত রাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা এর বর্ণনীয় বিষয়। সমগ্র অর্থশাস্ত্রগ্রন্থে এই বিষয়বস্তুকে পনেরোটি অধিকরণে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কেবল বিশেষ কোন দেশের বিশিষ্ট শাসনপদ্ধতির বর্ণনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মতো কোনো বিজিগিসু-নরপতি কিভাবে স্বীয় রাজশক্তির প্রভাবে স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন, আপন প্রভুশক্তিকে কিভাবে স্বীয় রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য রাজারা কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারেন, সে বিষয়ে কৌটিল্য যেমন সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেছেন, তেমনি আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা একীকরণ করে কিভাবে বিজিগিসু-নরপতি এক মহাশক্তি হয়ে উঠতে পারেন তার ইঙ্গিতও কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে রেখেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি ৩২টি ডিভিসনে, ১৫টি পার্টে এবং ১৫০টি চেপ্টারে বিভিক্ত। প্রত্যেকটি চেপ্টারে এক একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি লেখার মূখ্য উদ্দেশ্য তখনকার রাজা চন্দ্রগুপ্তকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

ও সফল রাজায় পরিণত করা, তাই তিনি তার গ্রন্থে রাজনীতি, প্রশাসন নীতি, কূটনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কৌটিল্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য বিষয়সমূহকে অবলম্বন করে লিখিত। কৌটিল্য সরাসরি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ না করলেও রাষ্ট্র যে জনগণ নিয়ে গঠিত, ভূখণ্ড বা ভৌগোলিক ভিত্তি এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকে কৌটিল্য শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থক ও ধারক। প্রাচীন নীতিশাস্ত্র লেখকেরা রাষ্ট্রকে সপ্তাঙ্গ বা সাতটি প্রকৃতিযুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন। কৌটিল্যের রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

(১) স্বামী, (রাজা বা শাসক)
(২) অমাত্য, (মন্ত্রিবর্গ)
(৩) জনপদ,
(৪) দুর্গ,
(৫) কোষ,
(৬) বল (সেনাবাহিনী)
(৭) মিত্র।

নিম্নে উক্ত অঙ্গসমূহের বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হল।

১. স্বামী (রাজা) : এখানে স্বামী অর্থ রাজা। প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহ-শক্তিযুক্ত রাজাই হবে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ সর্বপ্রধান প্রকৃতি।

রাজার বৈশিষ্ট্যসমূহ : (ক) যথার্থ রাজকীয় গুণ অর্জনের জন্য রাজাকে যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যুক্তিবিদ্যা, ধর্ম ও অধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার এই চারধরনের শিক্ষা রাজাকে অর্জন করতে হবে।

(খ) রাজাকে ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ, গর্ব ও হর্ষ এই সপ্ত রিপুর প্রতি আসক্তি বর্জনের মাধ্যমে রাজাকে ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে। কৌটিল্যের মতে, জিতেন্দ্রিয় রাজার উন্নতি অবধারিত, কিন্তু যে রাজা ইন্দ্রিয়কে আয়ত্তে আনতে পারেন না এবং ধর্মপালন করেন না, সেই রাজা চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীর মালিক হলেও অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন।

(গ) রাজাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অমাত্য, মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গকে নিয়োগ দিতে হবে। রাজা তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের সাথে আলোচনা করবেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করবেন। রাজার হাতে বল প্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় তিনিই সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা। একমাত্র রাজার কর্তৃত্বই জনসমাজের সকল কর্মকাণ্ডের একমাত্র উৎস। কেননা রাষ্ট্রের সকল কিছুরই উত্থান-পতন রাজার উপরই নির্ভর করে। রাজার সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি। রাজার দুরবস্থা রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনে। রাজাই সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। রাজাই অমাত্য নিয়োগ করেন। সেনাবাহিনী পোষণ করেন এবং মিত্র নির্বাচন করেন। তিনি জনগণের স্বার্থ দেখাশোনা করেন এবং বিপদের হাত হতে রক্ষা করেন। রাজা দুষ্টের শাস্তি বিধান এবং গুণীর

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সুতরাং রাজাই সকল উপাদানের শীর্ষে অবস্থান করেন এবং তিনিই মধ্যমণি। তাই রাজাকে অবশ্যই জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অধিকারী ও ইন্দ্রিয় সংযমী হতে হবে।

২. মন্ত্রিবর্গ (অমাত্য) : যারা রাজাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। কৌটিল্যের মতে, রাজ্য শাসন সহকারীগণের সাহায্য নিয়েই স্বনির্ভর রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়। সুতরাং রাজার উচিত রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য অমাত্যবর্গ নিয়োগ করা। রাজা প্রশাসন ব্যবস্থার মূল ব্যক্তি হিসাবে সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী হলেও একক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়। তাই জনপদ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক কার্য পালনের জন্য রাজা অমাত্যবর্গের উপরই নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, কর আদায় করা ইত্যাদি কার্য অমাত্যদের মাধ্যমেই পালিত হয়। সেজন্য অমাত্যদের অবশ্যই সুদক্ষ, সাহসী ও অনুগত হতে হবে। কৌটিল্যের মতে, অমাত্যদের রাজ্যের স্থানীয় অধিবাসী উচ্চ বংশজাত, সুশিক্ষিত, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও রাজার প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত হওয়া উচিত।

৩. জনপদ : জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা প্রাপ্তি। কৌটিল্য জনপদ বলতে ভূখণ্ড (Territory) ও জনসমষ্টি (Population) উভয়কেই বুঝিয়েছেন। জনপদ রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কারণ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপরই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। জনপদ দুর্গ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনপদই দুর্গের নির্মাণ সামগ্রী, রাজস্ব, সৈন্যবাহিনীর লোক, কৃষি, গো-সম্পদ ইত্যাদির উৎস।

৪. দুর্গ : প্রতিটি রাষ্ট্রের সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকবে। কৌটিল্যের মতে, রাজাকে অবশ্যই তার রাজ্যের চারিদিকে দুর্গ নির্মাণ করতে হবে। রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধ পরিচালনা মিত্রের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সব কিছুই দুর্গের উপর নির্ভর করে। দুর্গ সুরক্ষিত না হলে অন্যেরা রাজকোষ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কৌটিল্য মনে করেন, সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজা রাজস্ববিহীন অবস্থায় থাকলেও তাকে নির্মূল করা যায় না।

৫. কোষ : কৌটিল্য রাজকোষকে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান বলে গণ্য করেন এবং রাজকোষ পূর্ণ রাখার জন্য রাজার সর্বদাই চেষ্টা চালানো উচিত বলে মন্তব্য করেন। রাজকোষে প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করার কথা বলেন।

রাজার সমৃদ্ধ কোষ থাকা উচিত এবং এই কোষ সৎপথে অর্জিত হওয়া উচিত। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে অনাথ শিশু নিঃসন্তান ও বিধবা, বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ, আকস্মিক দুর্যোগের হাত হতে জনগণকে রক্ষা, গুপ্ত অপরাধী ও রাষ্ট্রের শত্রুদের নির্মূল, প্রশাসনের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো, উন্নত প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনের সময় কৃষকদের বীজ, গবাদিপশু সরবরাহ ইত্যাদির জন্য রাজাকে কোষ বৃদ্ধির উপদেশ দেন।

৬. সৈন্যবাহিনী বা বল : রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং দেশের মধ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সৈন্যবাহিনী বা বল প্রয়োজন।

৭. মিত্র : দেশের কোন বিপদ বা দুর্যোগের মোকাবেলা করার জন্য মিত্র দেশের প্রয়োজন যারা দেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

কৌটিল্যের মতে, এই সাতটি উপাদানের যেকোন একটির অনুপস্থিতিতে কোন রাষ্ট্র তার পরিপূর্ণ নাম ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন বা সফলতার সম্ভাবনা থাকে না।

কৌটিল্যের মতে, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা পুলিশী তৎপরতা চালানোই রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, বরং ব্যক্তিকে তাঁর আত্মবিকাশে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা একটি মহত্তর লক্ষ্য। রাজতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন তিনি। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই ছিল তাঁর আদর্শ। কারণ এটাই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর মানবিক প্রতিষ্ঠান।

কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি স্পষ্টতই বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই অনাথ শিশু, নিঃসন্তান মহিলা এবং বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। কৌটিল্য রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রয়োজনের সময় কৃষককে বীজ, গবাদিপশু এবং অর্থ সাহায্য দিতে রাজাকে উপদেশ দেন। একইভাবে নতুন সেচ ব্যবস্থা এবং খাল খননও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কৌটিল্যের শাসন তত্ত্ব

কৌটিল্য শাসন তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্বতন অর্থশাস্ত্রে ব্যক্ত ধারণাকেই বিকশিত করেন। রাষ্ট্রের সাতটি শ্রেণীর কার্যাবলিকে বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করেন। রাজাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তী শ্রেণীগুলোকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় রূপে উপস্থাপন করেন।

রাজা :

কৌটিল্য রাজাকেই রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেন।

রাজার কর্তব্য :

১. সহিংসতা দমন করে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা;
২. নিরপেক্ষতার সাথে ন্যায় পরিচালনা করা অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে আইন প্রয়োগ করা;
৩. কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা;
৪. জনগণকে পুঁজিপতিদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং
৫. ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের সাহায্য করা।

অমাত্যবৃন্দ :

কৌটিল্যের মতে, রাজা প্রশাসনব্যবস্থার মূল ব্যক্তি হিসেবে সকল ক্ষমতার অধিকারী হলেও কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র প্রশাসন চালানো অসম্ভব। সেজন্য রাজাকে বিভিন্ন মন্ত্রী (সচিব) নিয়োগ এবং তাদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। তাছাড়া, জনপদ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক কার্যপালন অমাত্যদের উপরই নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, গ্রামাঞ্চলের দুর্যোগের প্রতিকার করা, কর আদায় করা ইত্যাদি অমাত্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে অমাত্যদেরকে অবশ্যই দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

জনপদের প্রতি অমাত্যদের কাজ :

১. দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে জনগণের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

২. ভাষণ প্রদান ও ধৈর্য ধারণ

৩. বাগ্মীতা

৪. গল্প বলা

৫. সহনশীলতা

৬. খাঁটি - মেকী পরীক্ষণ

অমাত্যদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ হল :

(ক) প্রজ্ঞা

(খ) উদ্দেশ্যের সততা

(গ) সাহস

(ঘ) আনুগত্য

মূলত স্বামী বা রাজা এবং অমাত্য যদি দুর্নীতি মুক্ত থেকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করেন তবে রাষ্ট্রের কোন সমস্যা হবে না। তবে রাজা যেহেতু জনপদে যেতে পারেন না তাইঅমাত্যদেরকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতে হবে।

দণ্ড

কৌটিল্যের মতে দণ্ডই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কর্তব্য পালনে বাধ্য করে সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। তিনি দণ্ডকে মানুষের সমগ্র স্বার্থ অর্জনের উপায় বলে ঘোষণা করেন। মানুষ লোভ, লালসা, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। দণ্ডই তাদের এ থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে কৌটিল্য মনে করেন। কৌটিল্য বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার আদেশকেই চূড়ান্তভাবে বৈধ বলে ঘোষণা করেন।

কৌটিল্য বিভিন্ন গবেষক এবং পণ্ডিত দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। তিনি রাজতন্ত্রকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন যা সর্বদা স্বীকৃত নয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সফলতার প্রেক্ষিতে রাজতন্ত্রভুক্ত দেশের সংখ্যা খুবই কম। সকল রাজাই নীতিগতভাবে শুদ্ধ থাকবেন এমনটি আশা করা দুরূহ।

বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও কৌটিল্যের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের প্রতিফলনস্বরূপ। একটি রাষ্ট্রের শাসন, প্রশাসন, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, ধর্ম, দর্শন তথা প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কৌটিল্যীয় কূটনীতি

একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পর্যন্ত সর্বত্রই কৌটিল্যের সুচিন্তিত তাত্ত্বিক রচনা বিরাজমান। তাঁর মতবাদ অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পরিচালিত হয়

www.pathagar.com

কূটনীতির দ্বারা। কৌটিল্যের কূটনীতির মূল লক্ষ্য ছিল কিভাবে ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করা যায়। তাঁর সময়ে ভারত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এসব রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। তাঁর লক্ষ্য ছিল কিভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়।

কৌটিল্যের কূটনৈতিক মতবাদকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় :

১. মণ্ডলার ধারণা।

২. পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি আচরণ।

৩. কূটনৈতিক হাতিয়ার।

মণ্ডলার ধারণা

মণ্ডলার ধারণাটি ভৌগোলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মণ্ডলা বলতে তিনি রাষ্ট্রের চরকে বুঝিয়েছেন। মণ্ডলার প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে একজন কেন্দ্রীয় রাজা, যাকে তিনি বিজিগিসু (Vijigisu) রাজা বলে আখ্যায়িত করেছেন, সুবিন্যস্ত রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত হয়ে কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। রাজার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ ও শান্তি অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেন, "শক্তি হচ্ছে ক্ষমতা এবং সমাপ্তি হচ্ছে শান্তিতে (Strength is power and happiness is its ends)"। বিজিগিসু রাজা রাষ্ট্রবেষ্টিত যে অবস্থায় অবস্থান করেন তাকে তিনি অভিহিত করেন 'মাৎস্যন্যায়' হিসেবে। অর্থাৎ, মৎস্যনীতির মত যেখানে বৃহৎ মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। সুতরাং বিজিগিসু রাজা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাজাকে 'মাৎস্যন্যায়' ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই একজন মহাপরাক্রমশালী বিজেতা হতে হবে।

মণ্ডলার ধারণায় তিনি ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় রাজার প্রতিবেশী দেশ সবসময়ই তার শত্রু। আবার শত্রুরাজার পার্শ্ববর্তী দেশ সংশ্লিষ্ট শত্রুরাষ্ট্রের শত্রু। সুতরাং, বিজিগিসু রাজার শত্রুর শত্রু বিজিগিসু রাজার মিত্র। এখানে কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন, "My enemies enemy is my friend."

কৌটিল্য কূটনীতির এই মডেলে দশটি রাষ্ট্রের বিভাগ দেখিয়েছেন। (১) কেন্দ্রীয় রাজা বা বিজিগিসু রাজা (২) শত্রু রাষ্ট্র (৩) বন্ধু বা মিত্র রাষ্ট্র (৪) বন্ধুর শত্রু (৫) বন্ধুর বন্ধু (৬) শত্রুর বন্ধুর বন্ধু (৭) দূরবর্তী শত্রু (৮) দূরবর্তী বন্ধু (৯) দূরবর্তী শত্রুর বন্ধু (১০) দূবরর্তী বন্ধুর বন্ধু।

মণ্ডলার ধারণায় কৌটিল্য এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরেও আরো দু'ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। এগুলো হল মধ্যমা এবং উদাসীন।

মধ্যমা : মধ্যমার অবস্থান বিজিগিসু রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থান। এটি একইসাথে উভয়কেই সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন : ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মধ্যমা হিসেবে বেলজিয়ামের অবস্থান।

উদাসীন : এই রাষ্ট্র হবে নিরপেক্ষ বা বিযুক্ত রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র বিজিগিসু রাষ্ট্র, শত্রু রাষ্ট্র কিংবা মধ্যমা সব শ্রেণীর রাষ্ট্র থেকেই দূরে অবস্থিত। উদাসীন রাষ্ট্র এতই শক্তিশালী যে রাষ্ট্রটি উপরিউক্ত তিনটি রাষ্ট্রের সকলকে একত্রে বা আলাদাভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন-ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি আচরণ

কৌটিল্য প্রতিবেশী বা পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি আচরণ সম্পর্কে বলেছেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন রাজা সাফল্য লাভ করতে পারে, যদি সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হবে তা কৌশলগতভাবে ঠিক করতে পারে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর বিজয় অর্জন এবং ক্ষমতা অর্জন করার জন্য কৌটিল্য 'ষড়গুণ্য' বা ছয়টি ধাপবিশিষ্ট কৌশলের কথা বলেন। এগুলো হল :

১. সন্ধি, ২. বিগ্রহ,
৩. নিরপেক্ষতা, ৪. অগ্রাভিযান,
৫. মিত্রতা, ৬. দ্বৈতনীতি।

এক, সন্ধি : কোন রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তুলনায় দুর্বল হলে কৌটিল্যের মতে ঐ রাষ্ট্র প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করবে। অর্থাৎ, সন্ধির মাধ্যমে সহাবস্থানের দিকে অগ্রসর হবে। যেমন- পিএলও এবং ইসরায়েলের মধ্যকার সীমিত স্বায়ত্বশাসন চুক্তি এই নীতির সাম্প্রতিক প্রতিফলন।

দুই, বিগ্রহ : প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলে যুদ্ধায়োজন করবে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

তিন, নিরপেক্ষতা : রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রকে আঘাত করতে পারবে না এবং ঐ রাষ্ট্রও তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তাহলে, এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের সাথে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।

চার, অগ্রাভিযান : রাষ্ট্রের যদি প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য থাকে এবং জনগণের সমর্থন থাকে তাহলে রাষ্ট্র অগ্রাভিযান অর্থাৎ, আগে আক্রমণ পরিচালনা করবে।

পাঁচ, মিত্রতা : রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা এবং প্রতিপক্ষ শত্রুকে মোকাবেলা করার মতো শক্তি যদি না থাকে তাহলে রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্র, বিশেষত অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী জোট গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা নিশ্চিত হবে।

ছয়, দ্বৈতনীতি : রাষ্ট্রের যদি একাধিক শত্রু রাষ্ট্র থাকে এবং কোনো শত্রু রাষ্ট্রকেই যদি মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তি রাষ্ট্রের অনুপস্থিত থাকে, তাহলে একটি শত্রু রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং ঐ রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

এই নীতিমালা সাজানো হয়েছে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি সাপেক্ষে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে। আচরণগত কৌশলসমূহ অবলম্বন করতে হবে রাষ্ট্রের সামরিক সামর্থ এবং ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে। উল্লেখ্য যে, কৌটিল্যের এই কৌশলগুলো স্থির নয়, বরং গতিশীল। কৌটিল্যের মতানুসারে রাষ্ট্রকে নিজ শক্তি ও সামর্থের অবস্থান অনুযায়ী ছয়টি নীতির একটি গ্রহণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিদ্যমান অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজস্ব নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

কূটনৈতিক হাতিয়ার

কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য কৌটিল্য পাঁচটি কূটনৈতিক পন্থা বা উপায়ের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল :

১. সমঝোতা (sama),
২. উপঢৌকন বা উপহার (dana),
৩. বিভক্তিকরণ (bheda),
৪. মায়া ইন্দ্রজাল (maya-indrajala),
৫. দ্বন্দ্ব (danda).

এক, সমঝোতা : রাষ্ট্রের যখন সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে তখন আপোষ বা সমঝোতায় যেতে হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে যুদ্ধকালীন সময়েও শাসক সমঝোতার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যেমন- বাংলাদেশ ভারতের সাথে ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে সমঝোতায় যেতে বাধ্য হয়েছে।

দুই, উপঢৌকন : প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র যদি দুর্বল হয় কিংবা বিক্ষুব্ধ জন-সাধারণের ক্ষেত্রে এ নীতি অত্যন্ত কার্যকর। দান বা উপহার প্রদান করা হয় রক্তপাতহীন বিজয় লাভের জন্য। এই দান বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন-ভূমি, বস্তু, নারী-বিবাহ, ভয়ের আশঙ্কা দূর প্রভৃতি। বর্তমানের বৈদেশিক সাহায্যের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

তিন, বিভক্তিকরণ : প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের হুমকিকে অকেজো করে দেয়া বা তাকে দুর্বল শক্তিহীন করার লক্ষ্যে যদি 'উপঢৌকন' নীতি ব্যর্থ হয় তাহলে কৌটিল্য 'বিভক্তিকরণ' নীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শত্রুকে দুর্বল করতে হবে। এই জন্য গুপ্তচরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সমসাময়িক 'devide and rule policy'-র সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

চার, মায়াইন্দ্রজাল : রাষ্ট্র কতগুলো নির্দিষ্ট কৌশলগত নীতিমালা গ্রহণ করবে যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে মোহাবিষ্ট করা যায়। এই ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে সাপুড়ের ধারণার থেকে, যেখানে ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষকে আগ্রাসনমূলক কার্যক্রম ছাড়াই নিজের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা যায়। আধুনিক কালের হলুদ সাংবাদিকতা এরকম একটি উপায়।

পাঁচ, দ্বন্দ্ব : অন্যান্য সকল কূটনৈতিক পন্থা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখন প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বন্দ্বে যেতে হবে অর্থাৎ সরাসরি আক্রমণ করতে হবে। এটি হবে চূড়ান্ত অবস্থা। তবে দ্বন্দ্বে যাবার পূর্বে প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে।

কৌটিল্য কূটনৈতিক তাৎপর্যে পরামর্শ দেন যে, বিজিগিসু রাজা তার সাথেই শান্তি স্থাপন করবে যে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আবার তার সাথে যুদ্ধ সংঘটন করা উচিত যে তার চেয়ে কম শক্তিশালী। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে কৌটিল্য তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছেন, যথা- শান্তি, ক্ষমতা ও সময়। মূলত ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি

www.pathagar.com

রাজাকে সবসময় শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের জনগণের উপর বিজয় অর্জনের জন্য কোন সহিংসমূলক পন্থা গ্রহণ করতে না হয়। এই ধারণাকে সামনে রেখে কৌটিল্য একটি সুষ্ঠু এবং সুগঠিত বিশেষ বার্তাবহ দূত শ্রেণী গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আনুষ্ঠানিক এবং অ-আনুষ্ঠানিক শ্রেণীতে কাজ করবে।

কৌটিল্যীয় কূটনীতির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

তৎকালীন সময়ে মৌর্য রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায়করণ ছিল কৌটিল্যের প্রধান লক্ষ্য। এর প্রেক্ষিতে কৌটিল্যের যে কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তা সমসাময়িক আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক ব্যবস্থায়ও গুরুত্ববাহী। সমসাময়িক কূটনৈতিক তাৎপর্যে কৌটিল্যীয় নীতির প্রাসঙ্গিকতা ও সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়।

এক, কূটনীতির বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি : কৌটিল্য তাঁর কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সবসময়ই ছিলেন স্পষ্টভাষী। তাঁর মতে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাবে। যদি কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তবে তার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি পাবে, পরিবর্তিত হবে। কূটনীতির সাথে শক্তির সম্পর্ক অভিন্ন। এক্ষেত্রে বর্তমানকালের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কৌটিল্যের পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের মতে, শক্তিই দুজন রাজার মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, দুটো লোহার টুকরাকে যদি একইভাবে উত্তপ্ত করা হয় তবেই তারা পরস্পর জোড়া লাগে।

দুই, পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্যে সম্পর্ক : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ দু'টির মধ্যে ব্যবধান টানা কঠিন। কৌটিল্যের মতে, কূটনীতি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে বাস্তবায়ন করার উপায় নয়, বরং প্রায়শই কূটনীতি নিজেই পররাষ্ট্রনীতির রূপ পরিগ্রহ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্বে হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মান রাষ্ট্রে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

তিন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সন্দেহ : কৌটিল্য যে লক্ষ্য নিয়ে তাঁর মডেলের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন তা এখনো প্রচলিত। বর্তমান বিশ্বে বেশ কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সন্দেহ বা অবিশ্বাস থেকে মুক্ত। যদিও প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক কোনো রাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রধান বিষয় নয়, কিন্তু এটি মূল্যবান বিষয়গুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বহুদিনের সম্পর্ক, সন্দেহ, অবিশ্বাস দূর করতে বিশেষ সতর্কতা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে, বর্তমানের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে উপমহাদেশে এবং আশির দশকের দুই পরাশক্তির মধ্যকার স্নায়ু যুদ্ধের মধ্যে যে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি হয় তার মূল লক্ষ্যও ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস যথাসম্ভব হ্রাস করা, যদিও শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি দৃঢ় হয় নি।

চার , বিসমার্কের সাথে সাদৃশ্য : কৌটিল্যের দ্বৈতনীতি এবং আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা অটোভন বিসমার্কের কূটনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করার জন্য তারা দুজনই একই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশীর সাথে কোন প্রকার বৈরী সম্পর্ক রাখা যাবে না। কৌটিল্যের দ্বৈতনীতি তাঁর মণ্ডলা ধারণারই সংজ্ঞা যার দ্বারা আমরা বিসমার্কের কূটনৈতিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। কৌটিল্যের মতো বিসমার্কও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়ে শত্রু-রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে তারপর আঘাত হানার ব্যাপারে জোর দেন। এই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমেই বিসমার্কের নেতৃত্বাধীন জার্মান জাতি সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

পাঁচ, কূটনীতিকের শ্রেণীবিভক্তকরণ : কৌটিল্য কূটনীতিকদের কয়েকভাগে বিভক্ত করেছে। আধুনিককালেও তার অনুরুপ বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৪ সালে ভিয়েনা কনভেনশনে কূটনীতিকদের ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - অ্যাম্বাসেডর, এনভয়, চার্জ দ্য আফেয়ার্স। এই বিভাজনের সাথে কৌটিল্যের বিভাজনের মিল রয়েছে।

ছয়, গুপ্তচরবৃত্তির উপযোগিতা : বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে সকল রাষ্ট্র পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী তাদের প্রত্যেকেরই গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক রয়েছে। কৌটিল্য একে পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অভিহিত করেন। বর্তমানকালে কোন যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য গোয়েন্দা তথ্য যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; খ্রিস্টপূর্ব চারশত সালেও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা তাদের সরবরাহকৃত তথ্যের উপর সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি নির্ভর করে।

সাত, মুক্ত ও গুপ্ত কূটনীতির ধারণা : আধুনিক কূটনৈতিক চিন্তাধারায় মুক্ত ও গুপ্ত কূটনীতির যে প্রভেদ তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আরম্ভ হয়। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তির নীতি কিংবা মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের '১৪ দফা' মুক্ত কূটনীতির ধারণাকে পরিস্ফুট করে এবং গুপ্ত কূটনীতি যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে প্রচলিত ছিল তা বন্ধ করার আহ্বান জানায়। আবার প্রেসিডেন্ট উইলসন নিজেই ইতালির সাথে গোপন চুক্তি করেন এবং স্ট্যালিন হিটলারের সাথে চুক্তি করেন। কৌটিল্যও এ ধরনের কূটনীতিরই প্রবক্তা ছিলেন। কৌটিল্যের মতে, কূটনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভর করবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলি

কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজা চন্দ্রগুপ্তের একজন মন্ত্রী এবং তার অর্থশ্রাস্ত্র নামক গ্রন্থ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে শক্তিশালী ও সফল রাজায় পরিণত করা। বলা হয়ে থাকে যে রাজা চন্দ্রগুপ্তের উৎসাহ ও সাহচর্যেই কৌটিল্য তার বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলি যদিও দুজন দুই সময়ে এবং ভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ ছিলেন কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে উভয়েই চেয়েছিলেন রাজাকে শক্তিশালী ও সফল শাসক হিসাবে দেখতে। মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' নামক গ্রন্থে তখনকার ইটালির রাজাকে সফলভাবে রাজত্ব করার কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মেকিয়াভেলি প্রিন্সকে গ্রন্থ না বলে কেউ কেউ এটিকে

www.pathagar.com

একটি দীর্ঘ চিঠি বলে উল্লেখ করেছেন যাতে রয়েছে রাজা কিভাবে কোন নীতি গ্রহণ করে দেশ শাসন করবেন। উভয়েরই অভিজ্ঞতা ছিল তাদের স্ব স্ব রাজার অধীনে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও কূটনীতিক হিসাবে কাজ করার এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকেই উভয়ে তাদের রাজাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলিকে রাজনৈতিক দার্শনিক বলা যায় না বরং তারা উভয়ই ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক বাস্তববাদী। মেকিয়াভেলি তদানিন্তন ইটালীর আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আলোকে রাজাকে শক্তিশালী হওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'A prince should combined by the qualities of a fox and a lion.' অর্থাৎ শাসককে হতে হবে শৃগালের মতো ধূর্ত এবং সিংহের মতো সাহসী। রাজনৈতিক প্রশাসনিক নীতিতে কৌটিল্যও একই Policy গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজা চন্দ্রগুপ্তকে। যদিও উভয়েই রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং প্রশাসনে রাজার বাস্তবধর্মী Policy গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু কৌটিল্য যেখানে রাজার পরামর্শে ও অনুকূলে তার অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন সেখানে মেকিয়াভেলি তাঁর প্রিন্স গ্রন্থ স্বউদ্যোগে রচনা করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রকে পরাক্রমশালী করতে কৌটিল্য যে কূটনৈতিক মতবাদ তৈরি করেছিলেন আধুনিক যুগেও তার গুরুত্ব হ্রাস পায় নি। বরং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা কৌটিল্য প্রবর্তিত তাত্ত্বিক ধারণারই প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত।

আল্লামা আবুল ফজল
Abul Fazal [1551-1602 AD]

মুঘল সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম, সুপণ্ডিত, ইতিহাসবেত্তা রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যশিল্পী আল্লামা আবুল ফজল ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি ভারতের আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ মুবারক আলী তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। শায়খ মুবারক আলী নগোরীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন আবুল ফজল। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম শায়খ ফৈজী।

আবুল ফজলের শিক্ষা ও কর্মজীবন

বড় ভাই শায়খ ফৈজীর তত্ত্বাবধানে এবং পিতার সাহচর্যে আবুল ফজল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই এই মনীষী তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টেনে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। বড় ভাই শায়খ ফৈজীর মাধ্যমে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজল মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে স্থানলাভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান গরিমা এবং বুদ্ধি কৌশল দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্রাট আকবরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। তাঁর প্রতিভা ও প্রশাসনিক দক্ষতার গুণে প্রথমে তাকে কেরানীগিরির দায়িত্ব দেয়া হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি

www.pathagar.com

আকবরের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়ে যান। এরপর তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বলেই তিনি সদরুস সুদুর বা সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প সময়েই তার প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বলে সম্রাট আকবরের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার স্থান লাভ করেন।

আবুল ফজলের প্রভাবেই সম্রাট আকবর ধর্মীয় বিষয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতে শুরু করেন। এ সময় সম্রাট আকবর বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামের একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। আবুল ফজল ছিলেন আকবরের প্রবর্তিত দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রধান ধর্মযাজক। তিনি নামাজ, রোজা, হজ্ব ও অন্যান্য ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন ও সেগুলোকে উপহাস করেন। আবুল ফজল ও কতিপয় আখেরাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তি আকবরকে প্রভাবিত করে বিভ্রান্তিকর নতুন ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রবর্তন করান।

ইসলাম সম্পর্কে আবুল ফজলের ধারণা

ইসলাম ধর্ম সর্ম্পকে সম্রাট আকবর এবং আবুল ফজলসহ অন্যান্য দরবারীদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করেছিল যে, তারা ইসলামের প্রতি ছিলেন চরম বিদ্বেষী। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে ইসলামের শাশ্বত বিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ইসলাম ধর্মের চরম অবমাননা করেন। সুদ, জুয়া এবং মদকে হালাল, দাড়ি কেটে ফেলার ফ্যাশন প্রবর্তন করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামের বিধান অমান্য করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। তারা জিদের বশবর্তী হয়ে ইসলামে হারাম ঘোষিত শুকরকে পাক এবং পবিত্র প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করেন। এসবই ছিল সম্রাট আকবরের চাতুরী এবং আবুল ফজলের ধুর্তপনা। বস্তুত তারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মকে এক করে ভারতের শাসন কার্যে চিরস্থায়ী আসন পাকাপোক্ত করার ফন্দি এঁটেছিলেন।

আবুল ফজলের রচনাবলি

আবুল ফজলের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আকবর নামা' বা 'আকবরের শাসন ও ইতিহাস'। এটি ফারসি ভাষায় রচিত। দুখণ্ডে রচিত আকবর নামায় আকবরের পূর্ব পুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার ৪৬ বছরের বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'আইন-ই-আকবরী'

আবুল ফজলের আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কেউ কেউ আইন ই আকবরীকে বিখ্যাত গ্রন্থ আকবর নামার অংশ বিশেষ হিসেবে উল্লেখ করার প্রয়াস পেলেও আইন-ই-আকবরীর ইংরেজি অনুবাদক এইচ ব্লখম্যান এই গ্রন্থকে ভারতে মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে বর্ণনা করেন। আইন-ই-আকবরীতে মুঘল সাম্রাজ্যের আইন কানুন, শাসন পদ্ধতি

www.pathagar.com

ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ আছে। ব্লখম্যান (H. Block Mann) উল্লেখ করেন, "আইন-ই-আকবরীতে আকবরের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এমন সব তথ্য আছে, যা সূক্ষ্ম অর্থে ঐতিহাসিক না হলেও সেই সময়কাল সঠিকভাবে অনুধাবন করার পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং আইন-ই-আকবরীতে এমন সব তথ্য আছে যার জন্য আমরা আধুনিক সময়ে প্রশাসনিক রিপোর্ট, পরিসংখ্যান সংকলন বা গেজেটিয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত করতাম। আইন-ই-আকবরীতে আকবরের আইন (শাসন রীতি) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং ইহা প্রকৃত পক্ষে ১৫৯০ সালের দিকে প্রচলিত তাঁর সরকারের প্রশাসনিক রিপোর্ট ও পরিসংখ্যান বিবরণী। তাই আইন-ই-আকবরীতে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।" আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল মোঘল সাম্রাজ্যের ধর্মীয় অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে সমাপ্ত। এগুলোতে নিচের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে—

(i) দরবার ও হেরেম (ii) সভাসদবর্গ (iii) ইলাহী বর্ষ অর্থ সম্পদ এবং প্রদেশসমূহের শাসন কর্তাদের বিবরণ। (iv) হিন্দু সম্প্রদায় এবং তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদের প্রতিষ্ঠা ভারত উপমহাদেশের উপর বৈদেশিক আক্রমণ পর্যটক ও মুসলিম সুফী। (v) আবুল ফজল সংকলিত সম্রাট আকবরের বাণীসমূহ। এছাড়াও রয়েছে সামরিক-বেসামরিক সার্ভিস, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ সক্রান্ত বিধি-বিধান, ভূমি জরিপ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা।

আবুল ফজলের আরও যেসব গ্রন্থাবলি উল্লেখযোগ্য সেগুলো হল ইয়ার ই দানিশ, দীবচাহ-ই, রাযম নামাহ, বা মহাভারতের ফারসি অনুবাদের ভূমিকা, ইনজীল (বাইবেলের ফারসি অনুবাদ) মুনাজাত, (একটি দীর্ঘ কবিতা) ইনশা-ই-আবুল ফজল বা মাকতুবাদই আবুল ফজল। এটি আবুল ফজলের পত্রাবলীর সংকলন, এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। রুচেআত ই আবুল ফজল বা আবুল ফজলের ব্যক্তিগত পত্রাবলীর সংকলন। দীবাচা-ই তারিখই আলকী এটি ছিল তারিখ ই আলকীর ভূমিকা।

আবুল ফজলের রাষ্ট্রচিন্তা

আবুল ফজলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজতন্ত্র। তিনি রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক। রাজা ও রাজতন্ত্র সুষ্ঠু শাসনের জন্য অপরিহার্য বলে তিনি মত পোষন করেন। ন্যায়বিচার এবং বাদশাহ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাদশাহের ন্যায়বিচারের আলোকে কেউ কেউ আনন্দের সাথে আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে আর অন্যরা শাস্তির ভয়ে অপরাধ হতে বিরত থাকে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সংশোধিত হবার পথ বেছে নেয়।

আবুল ফজল শাসকদের প্রতি প্রজাদের আনুগত্যকে শক্তিশালী করার জন্য বাদশাহী পদের সাথে অতি প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত করেন। তিনি বাদশাহীর পদকে খোদার নিকট থেকে নিঃসৃত আলোক বিশেষ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন বাদশাহ খোদার ছায়া। তিনি খোদার নিকট থেকে সরাসরি আলোক লাভ করেন। বাদশাহ কেবল খোদাকেই ভয় এবং বিশ্বাস করেন। তিনি খোদার সাহায্য কামনা করেন ও তা লাভ করেন। এবং খোদার অনুগ্রহেই তার সাফল্যের কারণ বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

আবুল ফজল ধর্মীয় আইনের স্থলে বাদশাহর বিবেকের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। বাদশাহ খোদার আইন বলতে যা বুঝেন আবুল ফজল তার উপরই আস্থা স্থাপন করেন। ত্রিপাটি বলেন যে, আবুল ফজলের মতবাদ হতে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌমের বিবেক খোদার দ্বারাই নির্দেশিত হয়। আবুল ফজল বাদশাহ বা রাজার বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। আবুল ফজল বলেন, রাজার অধিকার সূর্যের নিকট হতে লব্ধ।

বাদশাহর গুণাবলী কেমন হবে তার নির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন আবুল ফজল। তিনি বলেন, বাদশাহর পদ খোদার দান এবং তিনি কয়েক হাজার মহান গুণের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত বাদশাহ হতে পারেন না। তাঁর মতে, রাজার গুণাবলীগুলো নিম্নরূপ—

১. মহানুভবতা
২. দয়া
৩. বিরাট সামর্থ
৪. সহনশীলতা
৫. বোধ শক্তি
৬. সাহস
৭. ন্যায়পরায়ণতা
৮. কঠোর পরিশ্রমী
৯. যথোচিত আচরণ
১০. ক্ষমাশীলতা

আবুল ফজল মনে করেন, যুক্তিই বাদশাহর পথ প্রদর্শক। ধর্ম সম্পর্কে একজন বাদশাহর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আদর্শ বাদশাহ এবং স্বার্থপর বাদশাহর চরিত্রও অংকিত হয়েছে আবুল ফজলের মতবাদে।

আবুল ফজলের রাষ্ট্রদর্শনের মূল্যায়ন

আবুল ফজল আকবরের উদ্ভট ধর্মনীতিকে ও ইলাহী ধর্ম প্রবর্তনকে মৌখিক সমর্থন করলেও একাজে তার অন্তরের সমর্থন কতটা ছিল তা ঐতিহাসিকদের কাছে বিতর্কের বিষয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক বাদাউনী এ বিষয়ে আলোচনাকালে তাকে বলেন "এসব কুফুরী কার্যকলাপে আপনার চেয়ে আর কার বেশি সমর্থন আছে"। এর জবাবে হাসিমুখে আবুল ফজল বলেছিলেন, আহা চটছেন কেন? খেলার ছলে কিছুদিন কুফরীর মুলকে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। তার এই জবাবে আকবরের দ্বীন ই ইলাহীর প্রতি তার মনের গভীরে পোষা বিদ্রুপেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তুযক ই জাহাঙ্গীরের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আকবরের ইলাহী ধর্ম প্রচারের সময় একদিন শাহজাদা সেলিম সহসা আবুল ফজলের বাড়িতে উপস্থিত হন ও চল্লিশজন নকল বীমাকে কোরআন নকল করতে দেখে অবাক হয়ে যান। এখেকে বুঝা যায় তিনি ইসলাম ধর্মের অনেক কিছুই ওয়াকিবহাল ছিলেন। আবুল ফজল উদারমতবাদী মুসলিম ছিলেন এটাই ঐতিহাসিকদের চূড়ান্ত মত।

www.pathagar.com

মহাত্মা গান্ধী
Mohatma Gandhi [1869 – 1948 AD]

মানুষ তার প্রজ্ঞা, প্রতিভা, সৃষ্টি ও কর্মের দ্বারা জীবনকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলে। মহাত্মা গান্ধী এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি স্বীয় কর্মের দ্বারা নিজেকে মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষের দিকনির্দেশনায় এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। তাঁর বিরোধিতাকারীরাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। বিশ্ববাসী তাকে সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করে। তবে প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

জন্ম ও শিক্ষা

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাটের সমুদ্রতীরে পোরবন্দরে তাঁর জন্ম। পোরবন্দরের অপর নাম সুজামাপুরী। পোরবন্দরের গান্ধীরা হিন্দু বৈষ্ণব, জাতিতে গন্ধবণিক। তাঁদের পেশা ছিল মুদি ব্যবসা। এই গান্ধী বংশের উত্তমচাঁদ গান্ধী ওরফে উতা গান্ধী পোরবন্দরের দেওয়ান হয়েছিলেন। উতা গান্ধীর পঞ্চমপুত্র ছিলেন করমচাঁদ গান্ধী ওরফে কাবা গান্ধী। তিনি পোরবন্দরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কাবা গান্ধীর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন পুতলী বাঈ। পুতলী বাঈ-এর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। ছোট ছেলের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর মা পুতলী বাঈ ছিলেন প্রণামী বা প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের অনুগামী। এ সম্প্রদায় সর্বধর্মের সমন্বয় বা মিশ্রণে বিশ্বাসী ছিল বলে তাদের মন্দিরে সকল ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। এমনকি পোরবন্দরের প্রাণনাথী মন্দিরের দেয়ালে কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ ছিল। পিতা অপেক্ষা মাতার ধর্মাদর্শই গান্ধীজিকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল।

গান্ধী পোরবন্দরের পাঠশালায় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। এ পর্যায়ে তার বাবা পোরবন্দর ত্যাগ করে রাজকোটে চলে আসেন যখন তার বয়স ছিল ৭ বছর। গান্ধীকে এখানে একটি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এখানকার পড়া শেষ হলে তিনি প্রথমে রাজকোটের তালুক বিদ্যালয়ে এবং পরে কাথিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।

গান্ধীর বয়স মাত্র ১৬ বছর তখন তার পিতা কাবা গান্ধী মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৮৭ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে কিছুদিন পড়ালেখা করার পর তার বড় ভাই তাকে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেতে পাঠাতে মনস্থির করেন। ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর গান্ধী বোম্বাই থেকে জাহাজযোগে বিলেতে যাত্রা করেন। বিলেতে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন। ব্যারিস্টারী পাস করে ১৮৯১ সালে তিনি একুশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন।

গান্ধী মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল কস্তুবরা। তিনি স্বামীর সমবয়সী ছিলেন। তঁদের চার ছেলে হরিলাল, মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস। হরিলাল ছিলেন অসৎ ও মন্দপ্রকৃতির, পরবর্তীতে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

গান্ধীজী ব্যারিস্টারী শেষ করে ভারতে ফিরে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তাঁহার দৃঢ় নৈতিক মনোভাবের জন্য এ পেশায় প্রসার লাভ করিতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি বড়ভাইয়ের কাছে রাজকোর্টে ফিরে যান। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মোকদ্দমায় ব্যারিস্টার হিসাবে কাজ করার আমন্ত্রণ পান। দাদা আব্দুল্লাহর কোম্পানির বিরাট কারবার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার এক আদালতে চল্লিশ হাজার পাউন্ডের পাওনা আদায়ের জন্য তারা অপর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। এই মামলা পরিচালনার জন্য তিনি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৮৯৩ সালের মে মাসে তিনি জাহাজযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর ডারবানে উপস্থিত হন। পরবর্তীতে এখানে তিনি আইন পেশার পরিবর্তে রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণে মর্মাহত হন এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইংরেজদের উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকাংশ ভারতীয়ই শ্রমিকের কাজ করত। ইংরেজরা ভারতীয়দের কুলী বলে সম্বোধন করত, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরিচয় ছিল কুলী ব্যবসায়ী। গান্ধীর নাম হয়ে গেল কুলী ব্যারিস্টার। এই কুলী জাতের মানুষেরা এখানে শ্বেতাঙ্গদের নিকট জন্তু জানোয়ারের মত ব্যবহার পায়। রাস্তায় তাদের ফুটপাতের উপর দিয়ে চলাচল নিষেধ, রেলগাড়িতে থার্ড ক্লাশ ছাড়া ফার্স্ট ক্লাশ বা সেকেন্ড ক্লাশে চড়ার অধিকার ছিল না। ইংরেজদের পরিচালিত হোটেলে ঢুকে খাওয়ার অধিকার নেই। স্বদেশবাসীর এ অপমান ও দুর্দশায় গান্ধীর অন্তর বিচলিত হয়ে উঠে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার কিছু দিন পরেই আবদুল্লাহ শেঠের মামলার কাজে গান্ধীজী প্রিটোরিয়া যাত্রা করেন। মামলা সেখানকার আদালতে চলছিল। তাই আবদুল্লাহ শেঠ ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনে গান্ধীকে ট্রেনে তুলে দেন। রাত ন'টায় ম্যারিজবুর্গ স্টেশনে একজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব যাত্রী হিসেবে এসে গান্ধীর কামরায় প্রবেশ করে একজন শ্যামলা লোক দেখে নেমে যায়। মিনিট কয়েক পরে শ্বেতাঙ্গ লোকটি দুজন কর্মচারীকে নিয়ে গান্ধীকে থার্ড ক্লাসে যেতে বলে। গান্ধী জানালেন, তাঁর প্রথম শ্রেণীর টিকেট রয়েছে এবং তিনি কামরা থেকে নামবেন না। শ্বেতাঙ্গ সাহেব একজন কুলীর স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে পুলিশ ডাকেন। একজন কনস্টেবল গান্ধীকে ধাক্কা মেরে কামরা থেকে নামিয়ে দেয় এবং তার জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে। গান্ধী এতে যথেষ্ট অপমানিত ও ক্ষুদ্ধ হলেন এবং সম্ভবত এখানেই তিনি অধিকার আদায়ের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। পরের দিন গান্ধী আনুপূর্বিক ঘটনা টেলিগ্রাম করে রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে জানালে তিনি নিরাপদে গান্ধীকে প্রিটোরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

www.pathagar.com

এ ডব্লিউ বেকার নামে প্রিটোরিয়াতে আবদুল্লাহ শেঠের একজন শ্বেতাঙ্গ আইনজীবীর সাথে গান্ধীর উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইতোমধ্যে দাদা কোম্পানীর মামলার নিষ্পত্তি হলেও গান্ধী সেখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতীয়দের দুর্গতি ও অপমানের অবসান এবং কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এসময় তিনি ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। দেখতে দেখতে গান্ধী প্রবাসী ভারতীয়দের নেতা হয়ে উঠেন। তিনি নাটোলে ভারতীয়দের সম্মেলন ডেকে "নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস" সংগঠন গড়ে তোলেন। গান্ধী এই সংগঠনের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং অন্যান্য ভারতীয়রা এর সদস্য হিসেবে নাম লেখাতে শুরু করেন।

গান্ধী দু'টি মূল্যবান বই লিখেন। লেখার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত ভারতীয়দের দুঃখদুর্দশা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজদের এবং ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রচার করা। বই দুটি হল –

(1) An Appeal to Every Brito in South African

(2) The Indian Francaize : An Appeal

গান্ধীজী তিন বছর অবস্থানের পর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতে আসেন। দেশে এসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্বন্ধে আরেকটি বই রচনা করেন। বইটির কয়েক হাজার কপি প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা জেনে খুবই ব্যথিত হয় এবং সজাগ হয়ে উঠে। গান্ধী কিছুদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সফর করে দক্ষিণ আফ্রিকার হতভাগ্য নিপীড়িত ভারতীয়দের দুর্দশার কথা প্রচার করেন। এরপর তিনি স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান।

আন্দোলনের সূচনা

১৯০৩ সালে গান্ধী ট্রান্সভালের রাজধানী জোহান্সবার্গে এসে তার আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পাস করে "এশিয়াটিক ল এমেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স"। ভারতীয়রা এ আইনের নাম দেন "The Black Act", বা কালো আইন। এ আইনে নারী এবং সাত বছরের বেশী বয়সের ছেলে মেয়েকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করতে হলে নাম রেজিস্ট্রি করে সার্টিফিকেট নিতে হবে। এ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পুলিশ যখনই দেখতে চাইবে দেখাতে হবে। এ সার্টিফিকেট না দেখালে জেল জরিমানা হবে।

গান্ধীজী এই ঘৃণ্য আইন রদ করার সংকল্প করেন। তিনি দু'বার ইংল্যান্ডে গিয়ে এ আইনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আপত্তি জানান। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। এরপর গান্ধী এ আইনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয়দের নিয়ে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি এক নতুন ধরনের বিদ্রোহ সংগঠন গড়ে তোলেন। গান্ধী এই বিদ্রোহের নাম দিলেন "সত্যাগ্রহ", আর বিদ্রোহে যারা সৈনিক গান্ধী তাদের নাম দিলেন সত্যাগ্রহী। গান্ধী এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিশোধ অপেক্ষা ভালবাসার, হিংসা

www.pathagar.com

অপেক্ষা অহিংসার শক্তি বেশী। অন্যায়কে যদি আমরা না মানি, শাস্তির ভয়ে এমনকি প্রাণের ভয়েও কাতর না হয়ে যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ করি তাহলে অন্যায় ধ্বংস হবেই। অন্যায়কারীকে মারার দরকার নাই।" গান্ধীর অক্লান্ত চেষ্টা ও শিক্ষায় হাজার হাজার ভারতীয় নরনারী সত্যাগ্রহী হলেন। গান্ধী নিজে এই আন্দোলনে তিনবার জেলে গিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে হরিলাল গান্ধী ও রামদাস গান্ধী এবং স্ত্রী কস্তুবরাও কাবাবরণ করেছেন। অসংখ্য ভারতীয় সত্যাগ্রহী এই আন্দোলনে সকল নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেন। কোথাও প্রতিশোধ নেননি বা ভয়ে পালিয়ে যাননি। দীর্ঘ আট বছর এই আইন বাতিলের দাবীতে আন্দোলন করেন। অবশেষে শাসক গোষ্ঠী হার মানে। ১৯১৪ সালে শ্বেতাঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয়দের উপরে যে সব অবমাননাকর আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল তা উঠিয়ে নেয়ার।

জয় হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের, হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার। এতে গান্ধীর নাম ছড়িয়ে পড়ল। প্রমাণিত হল যে রাজনৈতিক বিদ্রোহ হিসাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অসীম শক্তিশালী এবং কার্যকর আন্দোলন।

গান্ধীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯১৫ সালে গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। একুশ বছর আগে যখন তিনি ভারত ত্যাগ করেন তখন ছিলেন অতি সাধারণ তরুণ ব্যারিস্টার, আর যখন ভারতে ফিরে এলেন তখন এলেন বিশ্বখ্যাত হয়ে।

ভারতে ফিরে তিনি প্রায় এক বছরকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে জন্মভূমির প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। মানুষের সেবা করার মানসিকতায় তিনি খুবই সাধারণ পোশাক এবং সামান্য শ্রমিকের ন্যায় পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশে বোলপুর শান্তিনিকেতনেও এসেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় তাকে 'মহাত্মা' বিশেষণে ভূষিত করেন এবং সমগ্র মানুষ তাঁকে মহাত্মা বলে ডাকতে থাকে। অনেকে তাকে মহাত্মাজী বলেও সম্বোধন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রায় পঁচিশজন সহকর্মী গান্ধীর সঙ্গে ভারতে আসেন। নিজের স্ত্রী-পুত্রের মত এরাও ছিলেন নিজের পরিবারভুক্ত। মহাত্মা গান্ধী আহমদাবাদ শহরের কাছে সবরমতী নদীর তীরে কিছু জমি নিয়ে একটি আশ্রম স্থাপন করে সেখানে স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মহাত্মাজী এই আশ্রমের নাম দেন সত্যাগ্রহী আশ্রম। আশ্রমের বাসিন্দারা সকলেই অতি দীনভাবে জীবনযাপন করে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও অবদান

গান্ধী জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করার অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধী রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হওয়ার সময় হতেই সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে যোগ দিতে শুরু করে। গান্ধী বিশ্বাস করেন

www.pathagar.com

যে, কোন ব্যক্তিই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, যে পর্যন্ত তিনি তাঁদের সঙ্গে একান্ত হতে পারেন না। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করলেই কেবল তাঁরা প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেয়।

গান্ধী জাতীয়তাবাদকে গণমানুষের জন্য একটি বাস্তব ও বোধগম্য মতবাদে পরিণত করেন। তিনি কেবল শহরবাসী শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থের কথাই তুলে ধরেন নি, তিনি কৃষক ও অশিক্ষিতদের স্বার্থের কথাও বলেন। এছাড়া গান্ধী সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আবেদন জানান।

অহিংস অসহযোগবাদী আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা। তাঁর নীতি ছিল সত্যাগ্রহ বা ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের প্রতি দৃঢ়তা ও কৃচ্ছ সাধনের মানসিকতা। তাঁর প্রধান রাজনৈতিক কৌশল ছিল অসহযোগ অহিংসা আন্দোলন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। ১৯২০ সালের ১০ মার্চ তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ। যথা-

১. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিচার।
২. খিলাফত আন্দোলনকারীদের দাবি বাস্তবায়ন এবং
৩. স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।

এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারী উপাধি, অবৈতনিক পদ ও অনুষ্ঠান বর্জন। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সন্তানদেরকে এনে স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, ব্রিটিশ আদালত বয়কট করে বেসরকারী ক্ষণস্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন আইনসভা বয়কট করা, বিদেশী পণ্য বয়কট করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করা এবং মেসোপটেমিয়ায় চাকরি করতে সেনাবাহিনী, কেরানী ও শ্রমিক শ্রেণীর অস্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করা।

গান্ধী তার আন্দোলনের প্রথম থেকে আন্দোলনকে অহিংসার পথে পরিচালনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থার মূল ভিত্তি ছিল অহিংসা নীতি। গান্ধীজীর ডাকে সমগ্র ভারতের মানুষ সজাগ হয়ে উঠে। তারা অসহযোগ আন্দোলনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯২১ সাল থেকে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।

মূলত গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতি শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি ভারতে ফিরে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিতও মর্মাহত হন। তাঁর আন্দোলন তীব্রতর হয় যখন ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালের ২১ মার্চ রাওলাট আইন পাস করে। ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়। রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি বলেন, আমি বিবেকসম্মতভাবেই এ মত পোষণ করি যে, এ বিলের ধারাগুলো ন্যায়নীতির পরিপন্থী, স্বাধীকার ও ন্যায়বিচারভিত্তিক নীতিমালার পক্ষে অনিষ্টকর এবং মৌলিক মানবাধিকারের জন্য

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক; আমাদের দৃঢ় শপথ এই যে, বিলটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তাহলে যে পর্যন্ত এ আইন প্রত্যাহার করা না হবে ততদিন আমরা প্রতিবাদ করব। এ সংগ্রামে আমরা সত্যাগ্রহী থাকব এবং জীবন, ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর হামলা থেকে বিরত থাকব।"

প্রকৃতঅর্থে অহিংস আন্দোলনের অপর নাম সত্যাগ্রহ। গান্ধী সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করেন এ বিশ্বাসে যে অহিংসার অস্ত্র দিয়েই হিংসা দমন করা যায়। কেবল তাই নয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কাজে উত্তরণের শ্রেষ্ঠপথ অহিংসার পথ। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সহিংস সন্ত্রাসমূলক পন্থায় শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাঁর মতে, Violent means will give violent swaraj". যে স্বাধীনতা হিংসার পথে আসে তা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। গান্ধী অহিংসাকে পরমধর্ম জ্ঞান করেছেন; অহিংসার অর্থ ভালবাসা ও কল্যাণ চিন্তা। হিংস্রতা ও বর্বরতার মোকাবিলা করা উচিত কল্যাণ চিন্তা দ্বারা। তাঁর মতে, কালের পরিবর্তন ঘটে, প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়, কিন্তু অহিংসার ভিত্তিমূলে যা গড়ে উঠে তার ক্ষয় নেই। একঅর্থে অহিংসা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও বটে। স্বাধিকার অর্জনের উত্তম পদ্ধতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive resistance', নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তার পক্ষেই সম্ভব যে দুরূহ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করার শক্তি রাখে। গান্ধী বলেন, সন্তান বেঁচে থাকবে এ আশায় মা কষ্ট সহ্য করেন। অর্থাৎ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্যদিয়ে সার্থকতা অর্জনের যে শাশ্বত বিধান রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করা না হলে দাসত্বের কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাবে না।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২২ সালে বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার কথা ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে সরকারের সঙ্গে পুনরায় একটি আপোষ রফার প্রস্তাব উঠে। তবে বড়লাট এই প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র সাড়া না দেয়ায় গান্ধী তাকে একটি চরমপত্রে বারদৌলা সত্যাগ্রহের কথা জানান। এই চরমপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, অবিলম্বে সমস্ত দমননীতি বন্ধ না করলে, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার না করলে, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং খিলাফত আন্দোলন চালানোর সুযোগ না দিলে বারদৌলা তালুকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দেশ আন্দোলনের সাজে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ঠিক এই সময়ে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে নিরস্ত্র শোভাযাত্রীর উপর পুলিশের আকস্মিক গুলি চালানোর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং প্রায় চল্লিশ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এ খবর পাওয়ামাত্র গান্ধী "দেশ এখনও অহিংসা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়নি" বলে সারা ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেস সরকারীভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে সমগ্র ভারতবাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এর একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। তখন কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই কারাগারে। তারা একযোগে গান্ধীর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সুভাষচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেন, "গান্ধীজীর এভাবে বার বার ভুল করায় দেশবন্ধু দুঃখে ও ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠলেন। বারদৌলিতে এই পশ্চাদপদাপসরণ একটি প্রচণ্ড আঘাত ছিল"।

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে লুই ফিশার বলেন, "গান্ধীর একটি কথাতেই ভারতবর্ষ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারত। কিন্তু তাঁর সেই কথাটির পরিবর্তে সমগ্র আগ্রহ ও আত্মদানের প্রচেষ্টাকে অহিংসা মতবাদের যুপকাষ্ঠে বলি দেয়া হল"। লালা লাজপৎ রায় কারাগার থেকে তীব্রতর ভাষায় গান্ধীর প্রতিবাদ করে ৭০ পৃষ্ঠার এক চিঠি প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়, গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে শাস্তি দেয়া হল।

চিত্তরঞ্জন কারাগার থেকে বলেন, বারদৌলা গণআইন অমান্য বন্ধ রাখার যে কোন কারণ গান্ধীজীর থাক না কেন, বাংলাদেশে যেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ সরকারকে প্রায় অচল করে তুলেছে, সেখানে স্বেচ্ছাবেসকদের কাজ বন্ধ করার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

এই আন্দোলন প্রত্যাহারে ব্যথিত হয়ে সুদূর ফ্রান্স থেকে রোমা রোলা লিখেন, "একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হলে তাঁর যে কতখানি অপপ্রয়োগ হতে পারে এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।" গান্ধীর সিদ্ধান্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যতই থাকুক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদকে গান্ধী ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর কাছে স্বরাজ বা স্বাধীনতার চেয়ে অহিংসার স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। অহিংসা ছিল গান্ধীর একমাত্র নীতি। গান্ধী কেন এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন তার কারণ নিয়ে প্রধানত তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

প্রথমত, জওহরলাল তার আত্মচরিতে লিখেন, ১৯২২ সালে অহিংস প্রতিরোধ নীতি বর্জনের কারণ কেবল চৌরীচৌরা নয় যদিও অধিকাংশ লোকের তাই ধারণা। ঐ সময় গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সংগঠন দৃশ্যত শক্তিশালী এবং গণভিত্তিক হলেও কার্যত এর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাছাড়া জনগণকে স্বত:স্ফূর্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার শিক্ষাও দেয়া হয়নি। এরূপ অবস্থায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা ছাড়া গান্ধীর অন্য কোন উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়ত, সুভাষচন্দ্র বসু তার 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইতে এই মত পোষণ করেন যে, বারদৌলিতে গান্ধীর কর বন্ধের কর্মসূচি ব্যর্থ করে দেবার জন্য সরকার গোপনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে। ইতোমধ্যে ঐ অঞ্চলে নির্ধারিত করের একটি বৃহৎ অংশ আগাম হিসেবে আদায় করা হয়। গান্ধীর প্রতি সহানুভূতিশীল সরকারী কর্মচারীরা এই বিষয়ে তাকে অবহিত করেন এবং জানান যে, কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করা হলে তা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গান্ধী ব্যর্থতা অপেক্ষা আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নেয়াই শ্রেয় মনে করেন এবং চৌরীচৌরাকে একটা অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

তৃতীয়ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ শাহেদ উল্লাহ, এম এন রায় প্রমুখ মার্ক্সবাদীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করা সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, গান্ধীর মত বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর তা গণভিত্তিক হয়ে উঠে এবং বোম্বে, মালাবার, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলা প্রদেশে তা কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এতে কংগ্রেস নেতৃত্ব জয় পেয়ে যায়। সে সময়ে দেশের মধ্যে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, তাকে তাঁরা স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না। কারণ

www.pathagar.com

এ ধরনের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান সাফল্য অর্জন করলেও তাদের হাত থেকে জাতীয় আন্দোলনের গতিকে সবসময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে চাইতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তা করা হয়।

গান্ধীর নেতৃত্বের নানারকম সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বলা হয়ে থাকে গান্ধীই ভারতের প্রথম নেতা যিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে গণমুখী করেন। দেশের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও শ্রেণীগত বিরোধ তিনি সমাধানের আশা করেন আপসের পথে, নৈতিক প্রচার মারফত বুঝানের মাধ্যমে।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ আদায়ের জন্য অহিংস পথে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য গান্ধীকে ক্ষমতা দান করে। সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের আরোপিত লবণ কর আইন লঙ্ঘন করে গান্ধী এ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি অসংখ্য অনুসারী নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করে ২৪১ মাইল অতিক্রম করে সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাণ্ডিতে যান। সেখানে তিনি সরকারী আইন লঙ্ঘন করে একমুঠো লবণ কুড়িয়ে নেন। এই ঘটনা বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচার পায় এবং এর মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

গান্ধী আপোস করার বিরোধী ছিলেন না। ১৯৩১ সালে তিনি কারাগার হতে মুক্তি লাভের পর রাজনৈতিক আলোচনার সমীপে তাঁর সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড আরউইনের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। "গান্ধী-আরউইন চুক্তি" অনুযায়ী কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে এবং সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নে ভবিষ্যৎ আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়। অপরদিকে, ব্রিটিশ সরকার রাজবন্দীদের মুক্তি এবং লবণ তৈরির অনুমতি দেয়।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের নতুন পরিকল্পনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এক সাময়িক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। রোয়েদাদে হিন্দু সাধারণ হতে অনুন্নত শ্রেণীগুলোকে পৃথক করা হয় বলে এর বিরুদ্ধে গান্ধী তীব্র প্রতিবাদ জানান। এতে জাতীয় ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর প্রতিবাদে ফলোদয় না হওয়ায় তিনি রোয়েদাদ সংশোধনের দাবিতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরণ অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ভীমরাও আম্বেদকরসহ অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুনায় এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণীর ভোটারগণ যৌথ নির্বাচনী এলাকায় অন্যান্য হিন্দুর সঙ্গে ভোটদান করবেন। পুনা চুক্তি নামে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হয়।

১৯৩১ সলের ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর গান্ধী দেশের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং সরকারের বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থায় উদ্বিগ্ন হন। একপর্যায়ে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন করার প্রস্তুতি নেন এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে।

www.pathagar.com

সে সময়ে গান্ধী অস্পৃশ্য হরিজনদের মর্যাদার উন্নতি সাধনে ব্রতী হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ সালের মধ্যভাগে সরকার গান্ধীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। এরপর কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতিবাদে গণঅমান্য আইন স্থগিত করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালের ১ আগস্ট গান্ধীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে ৪ আগস্ট মুক্তি দেয়া হয় এবং পুনা শহরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সরকারী আদেশ অমান্য করায় তাঁকে এক বৎসর কারাদণ্ড দেয়া হয়। গান্ধীর কারাগারে থাকাকালীন অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান চালানোর সুযোগ দিতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করলে তিনি ১৬ আগস্ট অনশন শুরু করেন। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক হয়ে পড়লে তাঁকে ২৩ আগস্ট মুক্তি দেয়া হয়।

গান্ধী ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা, অস্পৃশ্যতা দূর করা, মৌলিক শিক্ষার প্রসার, দেশীয় চরকা শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি জাতি-গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইংল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যোগদান করে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই ভারতকেও ঐ যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় ১৯৪২ সালে গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার প্রস্তাব করেন এবং ভারত হতে অবিলম্বে ব্রিটিশ শক্তির সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত প্রত্যাহার দাবি করেন। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতে অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবিতে বিখ্যাত "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীসহ কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সমগ্র দেশে "ভারত ছাড়" আন্দোলন তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করে।

১৯৪৪ সালে কারাগার হতে মুক্তি লাভের পর গান্ধী ভারত বিভাগের প্রবল বিরোধিতা করেন। তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' সৃষ্টি পরিহার করতে চেষ্টা করেন। গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য ১৯৪৪ সালে জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। কিন্তু গান্ধী ও জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কারণে তাঁদের আলোচনা ব্যর্থ হয়।

গান্ধী ১৯৪৬ সালে সূচিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং দাঙ্গা বন্ধ করার প্রয়াসে দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নেয়। ১৯৪৮ সালে ৩০ জানুয়ারী পুনায় নাথুরাম গডসে নামক একজন ধর্মান্ধ হিন্দু চরমপন্থীর গুলিতে গান্ধী নিহত হন।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর স্থান

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অনন্য যুগের সূচনা করে। তিনি ভারতের জনজীবনে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। নিম্নে তাঁর অবদান নিয়ে আলোকপাত করা হল।

www.pathagar.com

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান

গান্ধী ১৯১৯ সালের অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের পর ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি তিন দশক ধরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কিভাবে অহিংসপথে বিদেশী শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তিনি সেই শিক্ষা দেন।

রাজনীতিতে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্তকরণ

রাজনীতিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্রতি আগ্রহ দেখাতে থাকে। গান্ধীর নেতৃত্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) প্রথমবারের মত একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। তিনিই কংগ্রেসকে গড়ে তোলেন এবং সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষকে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর আন্দোলন গ্রামীণ ভারতে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

গান্ধী সব ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশেষত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যান এবং দেশের অনুন্নত বা অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলোর পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরেন। গান্ধীর স্বাধীনতা অর্জনের কর্মসূচি ছিল বৈপ্লবিক। তাঁর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতারা সাংবিধানিক সংস্কারের অর্থেই কেবল ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন। গান্ধীই সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা দূর করার বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার করেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীর উদ্যোগে গৃহীত এক প্রস্তাবে অস্পৃশ্য শ্রেণীগুলোর সকল অসামর্থ দূর করার প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায়যুক্ততা অনুধাবন করার জন্য ভারতীয় জনগণের প্রতি আহবান জানান হয়।

গান্ধীজীর বাংলা প্রীতি

বাংলাদেশের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর ছিল প্রবল ভালবাসা। কারণ বাংলাদেশ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে খুব অগ্রণী আর শিক্ষাদীক্ষাতেও ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বাংলার কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহাত্মাজী খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাকে বলতেন

www.pathagar.com

গুরুদেব। গান্ধীর "সবরমতী" আশ্রমে একবার রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন এবং গান্ধীকে "অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর তর হে" এ গানটি গেয়ে শোনান। গান্ধীও কর্মোপলক্ষ্যে এসেছিলেন কবির শান্তি নিকেতনে।

এছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক। আর তাই চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে তিনি খুব কষ্ট পান এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তের লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে প্রেরণ করেন। সেই টাকাতে কলিকাতায়" 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।

নোয়াখালীতে গান্ধী

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পূর্বে নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। দাঙ্গাতে বহু লোক খুন হয়, অনেকের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। গান্ধীজী নোয়াখালীতে আসতে মনস্থ করলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরগণ তাঁকে বারণ করেন কিন্তু তিনি এতে কর্ণপাত না করে কোন প্রকার সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থা ছাড়াই নোয়াখালী এসে পৌছান। দিনের পর দিন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনগণকে শান্ত করতে থাকেন। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে নোয়াখালীর পরিস্থিতি। তাঁর কর্মতৎপরতায় ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে গান্ধীর অবদান

মহাত্মা গান্ধী কেবল তৎকালীন উপমহাদেশের রাজনীতিতে অনন্য সাধারণ ভূমিকাই পালন করেননি বরং তিনি রাজনৈতিক চিন্তাধারার জগতেও মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

রাজনীতির আধ্যাত্মিকরণ

"রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক রূপদানের প্রচেষ্টাই ভারত ও বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গান্ধীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান" বলে এম এ বুচ মনে করেন। গান্ধী শুরুতেই ঈশ্বর ও শাশ্বত নৈতিক শৃঙ্খলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি তাঁর সমগ্র ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় জীবনকে এরূপ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালবাসাই চিরন্তন ধর্ম। আর ধর্ম ছিল তাঁর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি। গান্ধীর মহান বিশ্বাস এই যে, সত্যিকারের মতপার্থক্য সমগ্র মানবতার ধারণার নীচে, ঈশ্বরের ধারণার নীচে স্থান দিতে হবে এবং এ ধারণার সঙ্গে সমন্বিত করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ

গান্ধী রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন, যা ছিল রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁর মহান অবদান। তিনি রাজনীতি হতে নৈতিকতাকে পৃথক রাখার নীতির যৌক্তিকতা মেনে নেন নি। নৈতিকতাকে রাজনীতির নিম্নে স্থান দেয়া যায় বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের পথ নির্দেশক বা মানদণ্ড হিসেবে নৈতিক বিধিবিধানকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। এটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। গান্ধী যে কোন উপায়েই লক্ষ্য অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। লক্ষ্যকে উপায় হতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, গান্ধীর এ মতবাদকে নেহেরু জনজীবনে গান্ধীর শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করেন।

অহিংসা মতবাদ

গান্ধী সত্য ও বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তাঁর অহিংসা মতবাদ প্রণয়ন করেন এবং এতে তাঁর গভীর মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস পথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায় প্রদর্শন করে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ও রীতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন বলে এম এ বুচ উল্লেখ করেন। গান্ধী হিংসা, বিদ্রোহ, যুদ্ধ ও ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ হিংসা আরো প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং এ হিংসা-প্রতিহিংসার কখনও অবসান ঘটবে না। ঘৃণা ঘৃণার জন্ম দেয় এবং ভালবাসা ভালবাসার জন্ম দেয়। এটাই অহিংসার নতুন মনস্তত্ত্বের মূলনীতি। যেকোন মূল্যে এমনকি সম্পূর্ণভাবে আত্মাহুতি দিয়ে হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভয়াবহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, কিন্তু আপনার বিপক্ষের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা নিয়েই এই সংগ্রাম করুন - এটি ছিল গান্ধীর রাজনৈতিক দীক্ষা।

স্বরাজের উন্নত ধারণা

স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীর ধারণায় নির্যাতিত ও অবহেলিত কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের কথাই তুলে ধরা হয়। তাঁর এ ধারণা ঔপনিবেশিক শোষণ হতে মুক্তিলাভের সাধারণ ধারণায় ছিল প্রথম। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, ভারতে বিদেশী শাসনের পাশাপাশি ব্যাপকমাত্রায় সামাজিক অন্যায় অবিচার ও শোষণ বিদ্যমান। স্বরাজ বলতে তিনি কেবল বিদেশী শাসনের অবসানই বুঝাননি, উপরন্তু সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিলোপ সাধনও বুঝিয়েছেন। সমাজে স্বরাজ অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে নারী-শোষণ ও অস্পৃশ্যতা দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি স্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে প্রসারিত ও গভীরতর করে তুলেছেন। এটি কোটি কোটি মানুষের জন্য আশা ও মুক্তির বাণী বহন করে। ফলে

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ ব্যাপকহারে স্বরাজ্যের সংগ্রামে যোগ দেয়। এভাবে স্বরাজের সংগ্রাম ব্যাপক অর্থে মানবিক স্বাধীনতার এক গণ-সংগ্রামে পরিণত হয়। গান্ধীর পূর্বে এরূপ ঘটে নি।

নারীস্বার্থের প্রতি সমর্থন দান

রাজা রামমোহন রায়ের পর গান্ধীই নারীস্বার্থের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। নারী কোন দিক দিয়ে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট একথা মেনে নিতে গান্ধী অস্বীকার করেন। নারীরা যেসব সামাজিক অনাচারের কারণে দুর্দশা ভোগ করছে, তিনি কেবল সেগুলোর নিন্দাই করেন নি বরং তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর পূর্ণসাম্যের সমর্থক ছিলেন।

ব্যক্তিসত্তার উপর গুরুত্বারোপ

গান্ধী যান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন, তাতেই তাঁর অন্যতম অবদান নিহিত। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তির ভূমিকা ক্ষীণ হয়ে পড়ে বলে গান্ধী উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। জাতি, রাষ্ট্র ও জনগণের মত বিমূর্ত ধারণায় ব্যক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিকে তাঁর নিজস্ব কল্যাণের নামে নির্মূল করা হচ্ছে। বস্তুবাদ মানবতাবাদের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। বস্তুবাদ ব্যক্তির আত্মা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা করাতেই বিশ্বের চিন্তাধারায় গান্ধীর সবিনয় অবদান নিহিত। বর্তমান বিশ্বের দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও জোর-জবর দস্তির স্থলে স্বেচ্ছামূলক ব্যক্তিগত সহযোগিতা প্রবর্তন করাই ছিল তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পরিশেষে, উপরিউক্ত বিশদ, বস্তুনিষ্ঠ, সারবান আলোচনার নিরিখে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র মহাত্মা গান্ধী। তাঁর অসামান্য অবদান ভারত বর্ষকে যেমন বৃটিশ উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে তেমনি ভারতবাসীর সামগ্রিক জীবন মানের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এজন্য গান্ধী সকল শ্রেণীর সুধী মহলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

ড. আল্লামা ইকবাল
Dr. Allama Iqbal [1877 – 1938]

ড. আল্লামা ইকবাল একাধারে একজন মহাকবি, দার্শনিক, অবহেলিত এবং অবজ্ঞাত মুসলিম সমাজের রেনেসাঁর কবি ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন মুক্তিপাগল মানবতার পরম বন্ধু। চিন্তাবিদ, দার্শনিক মাত্রই সমকালীন ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হন। তৎকালীন

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে ঘনঘোর অমানিশা আর মহাদুর্যোগ বিরাজ করছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এবং ধ্বংসের ভস্মস্তূপের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন, তদুপরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার মত একজন কবির আত্মপ্রকাশ শুধু বিস্ময়করই নয় কল্পনাতীত। আধুনিক যুগ বিস্তর দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত। এ দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কল্পিত রূপের সাথে আদর্শিক জগতের দ্বন্দ্ব। যার ফলে বিশ্বের মুসলিম সমাজ আজ অবহেলিত প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের শিকার হয়ে নির্যাতিত, নিপিড়িত হচ্ছে। বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের স্বর্ণযুগের আদর্শকে ভিত্তিরূপ গ্রহণ করে ড. আল্লামা ইকবাল তাঁর দর্শন প্রচার করেন। তাঁর দর্শন 'স্বীয় উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত' ছিল না। তিনি মানুষকে উদাত্তভাবে আহ্বান করে কোরআন-হাদিসের বিশুদ্ধ অধ্যাবসয়ের প্রতি। তাই তাঁর প্রচারিত দর্শন 'খুদী দর্শন' কখনও কাব্যের মাধ্যমে কখনও বক্তৃতার মাধ্যমে এবং কখনও বিবৃতির মাধ্যমে প্রচার করেন। তাঁর দর্শনের মধ্যে সামান্যতম গোঁড়ামী ছিল না বরং ধ্বনিত হয়েছে তৌহিদের বাণী। আল্লামা ইকবাল উর্দু এবং ফারসি সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট সমধিক প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হন।

জন্ম, পারিপার্শ্বিকতা ও রচনাবলি

আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাব ও কাশ্মীর এর সীমান্তবর্তী স্থান ঐতিহাসিক শিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ শতকে মহাকবি ইকবালের পূর্বপুরুষগণ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নুর মোহাম্মদ (১৮৩৭ – ১৯৩০) একজন ব্যবসায়ী ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। তাঁর মাতাও ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। পরিবার থেকেই ইকবাল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন।

শৈশব থেকেই মহাকবি ইকবাল মক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন এবং এখান থেকেই তিনি মাওলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেবের সাথে পরিচিতি লাভ করেন, যিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইকবালের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাঁর নিকট হতেই ইকবাল আরবি ও ফারসি ভাষার প্রতি আগ্রহ অর্জন করেন। শৈশবেই ইকবাল উর্দু ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর পড়াশোনা করেন যা তাঁর পরবর্তী জীবনের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে। মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করে সৈয়দ মীর হাসানের উপদেশ মতে ইকবাল শিয়ালকোট মিশন স্কুলে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৪ বছর বয়সে আল্লামা ইকবাল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে আল্লামা ইকবাল লাহোর সরকারী কলেজ থেকে আরবি ও ইংরেজি বিষয়ে অনার্স পাস করেন এবং দর্শনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

কলেজ জীবনে আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক টমাস আরনল্ড (১৮৬৪ – ১৯৩০) এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন যা তার পরবর্তী জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৈয়দ মীর হাসান ইকবালকে প্রাচ্যের দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন এবং পরবর্তীতে অধ্যাপক আরনল্ড তাঁকে পাশ্চাত্য দর্শনের উপর জ্ঞান দান করেন যা

www.pathagar.com

ইকবালের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের পর আল্লামা ইকবাল কিছু দিন লাহোরের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৯০৫ সালে আল্লামা ইকবাল অধ্যাপক আরনল্ড দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং ইংল্যান্ড গমন করে উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাশায় তিন বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে আল্লামা ইকবাল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে E.G. Browne এবং R.A. Nicholsonদের মত শিক্ষকদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যারা ফারসি সাহিত্যের সুপণ্ডিত ছিলেন। ক্যামব্রিজ হতে জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং Persian Mysticism উপর গবেষণা করে Ph.D ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "The development of Metaphysics in Persia." একই সাথে তিনি lincoln Inn-এ আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এবং ১৯০৮ সালে ব্যারিস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইউরোপের দিনগুলোতে আল্লামা ইকবাল ইউরোপীয় সমাজ নিয়ে পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনটি বিষয় তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

প্রথমত, ইউরোপের মানুষের ক্লান্তহীন কর্ম, শক্তি, উদ্যোগ, সামর্থ এবং আবিষ্কার।

দ্বিতীয়ত, ইকবাল বুঝতে পারেন যে ইউরোপের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যা ইউরোপকে বিশ্বের প্রভূত্বে পরিণত করেছে।

তৃতীয়ত, তিনি দেখতে পান সেখানকার উন্নত জীবন যাপন, মানুষের সাথে মানুষের প্রতিযোগিতা যা পুঁজিবাদের মৌলিক নীতি। ইউরোপীয়রা আরও বিশ্বাস করত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা। প্রত্যক্ষ করলেন যে এই ধরনের আক্রমণাত্মক তথা উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর দ্বারা ইকবাল Capitalism এবং Nationalism এর প্রতি বিশ্বাস হারালেন। তিনি এও প্রত্যক্ষ করলেন যে বর্ণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন যা মানুষের সমতার বিরুদ্ধ নীতি। তারপর থেকেই মহাকবি আল্লামা ইকবাল এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ পূর্বক তার দর্শন প্রকাশ করেন। ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল এই মহান দার্শনিকের জীবনাবসান ঘটে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে আসরারে খুদী, পস্ চহ্ বায়দ করদ, The reconstruction of religious thought in Islam, Ramuz, Payan-i-Mashriq, Bang-i-Dara, Zabur-i-Ajam, Javid Nama, Ball-i-Jibril, Armughan-i-Hijaz ইত্যাদি।

ইকবালের দর্শন

আল্লামা ইকবাল মনে করতেন, আধুনিক যুগের সকল অশান্তি-অনাচারের মূল হল ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। এর ফলে মানব জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বংশীয় এবং আঞ্চলিক অন্ধ বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্বের কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয় এবং অসংখ্য মানুষের জীবনপাত ঘটে, সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বর্তমান যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে ড. আল্লামা ইকবালই সর্বপ্রথম অশান্তি-অনাচার সৃষ্টিকারী এ ব্যাধির বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী তাঁর "ইকবাল ও পাকিস্তান" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "আল্লামা ইকবাল জাতির জন্য যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তা হল তিনি জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তা ও জাতিপূজার উপরে দারুন আঘাত হেনেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে যদি জাতিপূজা, জাতীয়তাবাদ এবং জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তার উপর সময়মত আঘাত না করতেন, তাহলে পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের একাকার করে দেয়ার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাঁর থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা যেত না। বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন উলামায়ে দ্বীনের কেউ কেউ মুসলমানদের কে জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং বড় মুত্তাকী আলেমগণও একথা বলা শুরু করেছিলেন যে, জন্মভূমির ভিত্তিতে যে জাতীয়তা গড়ে ওঠে তা দ্বীন ইসলামের জন্য কোন রূপ ক্ষতিকর নয়। এ অবস্থায় ইকবাল একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সর্বশক্তি দিয়ে এ মারাত্মক ধারণা খণ্ডন করেন এবং মুসলমানদেরকে বলিষ্ঠ ভাষায় বলেন যে, জন্মভূমি এক দেবতা এবং জন্মভূমির পূজাও ঠিক তেমনি শিরক, যেমন কোন দেবতা বা প্রতিমার পূজা করা শিরক। যথা সময়ে ইকবাল যদি এ শিক্ষা না দিতেন, তাহলে পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ যে গণসংযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল যে আন্দোলনে উলামা এবং সমাজতন্ত্রীগণ শামিল ছিলেন তা হলে সে আন্দোলন মুসলমানদেরকে হিন্দুদের মধ্যে এমনভাবে গলিয়ে মিশিয়ে দিত যেমন লবণ পানির মধ্যে গলে যায়। কিন্তু ইকবাল মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করেন যে, জাতীয়তা দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে হয় না, বরং দ্বীন ও আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়। তিনি মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করেন যে, মুসলমানগণ এক বিশেষ আকীদা পোষণকারী এবং এক সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক। যেসব জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও পথ মুসলমানদের থেকে ভিন্নতর, তাদের জাতীয়তা মুসলিম জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।"

সুতরাং জাতীয়তা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল যে ইসলামী ধারণা ব্যক্ত করেন, তার ফলে একদিকে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উন্নয়নের জন্য পৃথক আবাসভূমি লাভ করার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার বিরাট প্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি আল্লামা ইকবাল বিশ্বাস করতেন এক বিশ্ব জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ আধুনিককালে একে অনেকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া খুদী দর্শন, ব্যক্তিত্ববাদ এবং ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কতিপয় মতবাদ।

ইকবাল সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী মৌলিক নীতিমালা নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করবে তার অন্তর্গত সত্তা অধিকতর বলিষ্ঠ ও গতিবান হয়ে উঠবে এবং চিরন্তন জীবন লাভ করবে। এই সমাজ ব্যবস্থা মুমিনদের নিয়ে গঠিত এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে যেখানে সার্বভৌমত্ব থাকবে আল্লাহ্‌র হাতে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইকবালের অন্যতম ব্রত। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে তাওহীদ থেকে পাওয়া স্বাধীনতা, সাম্য, সংহতি এবং বিশ্বাসীদের ঐক্য। ইসলামের একটা অন্যতম শিক্ষা আল্লাহর আনুগত্য। এরই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত বিশ্বে ঐক্য আসতে পারে এবং ইসলামী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করবে।

www.pathagar.com

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা
His political thought

আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখিয়েছেন। ইসলামী মূল্যবোধের চেতনা উদারভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। তিনি চিন্তাশীল মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। ইকবালের আজীবন লক্ষ্য ছিল ইসলামী আদর্শের সযত্ন অধ্যয়ন ও তা লালন করা। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে ইসলামের নীতিমালা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তার তমুদ্দুন তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে।" ইসলামকে তিনি দেখেছেন ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও অনুভূতিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর মতে Islam is a complete and comprehensive code of life. তাই তিনি রাজনৈতিক দর্শনকেও ভেবেছেন এই জীবন দর্শনের এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে। পরিণত বয়সে ইকবাল যা কিছু লিখেছেন ইসলামী মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কোরআন-হাদিস এবং ইজমা-কিয়াসের আলোকে। সুতরাং ইসলামী জীবনাদর্শই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং তাঁর লেখনীতে তারই স্ফুরণ ঘটেছে। তাঁর দর্শনের উৎস মূল ছিল এটাই।

ধর্ম ও রাজনীতি
Religion and politics

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। তাঁর মতে, ধর্ম যেহেতু মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত সেকারণে রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজনীতিকে যারা ইসলামের মূল্যবোধের খেলাপ বলে মত পোষণ করেন তাদের কারণেই দেশে বিদেশে ইসলাম পরিপন্থি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। যার পরিপেক্ষিতে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, সুবিধাবাদিতা আজ নাগরিক জীবনকে অশান্তির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। ইকবালের মতে, ধর্ম হচ্ছে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তাঁর মতে, "Islam, as a polity, is only a Practical means of Making this Principle (of Tawheed) living factor in the intellectual and emotional life of Mankind. It demands loyalty to Allah and not to thrones. And Since Allah is ultimate spiritual basis of all life, loyalty to Allah actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature." (Allama Iqbal-reconstruction of religious thought)

অর্থ্যাৎ এ নীতিকে (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) মানুষের চিন্তাজগতে এবং ভাবজগতে জীবন্তরূপ দেয়াই কার্যত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম

www.pathagar.com

সবসময় দাবি করে তাঁর প্রভুর প্রতি আনুগত্য, কোন রাজকীয় মুকুটের প্রতি নয়। আর আল্লাহ্ই হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল ভিত্তি, তাই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর।

আল্লামা ইকবাল সবসময়ই ধর্মহীন রাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁর মতে মার্টিন লুথার খ্রিস্টবাদের ভয়ানক শত্রু ছিলেন, কেননা তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দুটি ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র ও ধর্ম দেহ ও আত্মার সমতুল্য এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। "জরবে কলীম" গ্রন্থের একটি কবিতায় ধর্মহীন রাজনীতি কে ইকবাল 'ভূতের কন্যা' ও 'পংকিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন এবং পাশ্চাত্য রাজনীতির কাণ্ডারীদেরকে 'শয়তানী প্রথার প্রতিনিধি' বলে উল্লেখ করেছেন। ইকবালের মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈতবাদ মানবতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এ ভুল মতাদর্শের গোলক ধাঁধা হতে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম এ দ্বৈতবাদকে ক্ষুণ্ন করে মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাষ্ট্র শক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দিয়েছে। ইকবাল রাষ্ট্রকে নৈতিক নিয়মবিধান হতে মুক্ত দেখতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ও অনুগত হতে হবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আদর্শ রাষ্ট্র
Ideal State

ইকবাল কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন যার সাথে বর্তমান পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ১৯৩২ সালে ইকবাল একবার বলেছিলেন, প্রতীচ্য যে উপার্জন সর্বস্ব অর্থনীতি গড়ে প্রাচ্য জাতিসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে এশিয়ার জাতিসমূহের বিদ্রোহ অনিবার্য। আপনারা যে ধর্মের অনুসারী তাতে ব্যক্তির মূল্যের স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে নিয়মের অধীনে আনা হয় তার সর্বস্ব আল্লাহ্ ও মানুষের খেদমতে বিলিয়ে দেবার জন্য। তার সম্ভবনা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এ জীবন দর্শন এখনো এমন এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার জাতি, বর্ণ অথবা অর্জিত সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং তা নির্ধারিত হয় জীবনের ধরন দ্বারা, যেখানে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের সাম্যের উপর নয় বরং আত্মার সাম্যের উপর যেখানে একজন অচ্ছুৎ বিয়ে করতে পারে একজন শাহানশার কন্যাকে, যেখানে ব্যক্তি সম্পত্তি একটি আমানত, যেখানে সম্পদ উৎপাদনকারীদের উপর আধিপত্যের জন্য পুঁজি জমা করবার অধিকার দেয়া হয় না।

আদর্শ সমাজের জন্য আল্লামা ইকবাল ৭ টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) সমাজ হবে একেশ্বরবাদ-রূপ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) এর জীবনায়োজন হবে নবুওয়্যতরূপ ঐশী প্রেরণা লব্ধ নেতৃত্বের অধীনে।

www.pathagar.com

(৩) এর দৈনন্দিন প্রগতির জন্য একটি সর্বস্বীকৃত নীতিমালা থাকবে।

(৪) এর একটি সর্বজনীন কেন্দ্র থাকবে।

(৫) এ সমাজের একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে যার প্রতি সমগ্র সম্প্রদায় সর্বদা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে।

(৬) এমন শক্তিমান হবে যাতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো হবে এর আজ্ঞাধীন।

(৭) এ সম্প্রদায়ের কার্যক্রম এমন হবে যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেভাবে বিকাশ লাভ করে তেমনিভাবে এর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে থাকে।

এগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইকবালের ধারণা একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হল একেশ্বরবাদ। এক ঈশ্বর ধারণার অপ্রতিরোধ্য পরিণতি হল অবিভাজ্য একক এবং মানুষ মানুষের সাথে ধর্ম, বর্ণ, জাতি প্রশ্ন-নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর এ ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করার জন্য তিনি মুসলিম যুব সম্প্রদায় কে বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের সামনে দুটি উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন।

এক : মুক্তির জন্য সংগ্রাম

দুই : ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

স্বাদেশিকতাবাদ

আল্লামা ইকবাল এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "দেশাত্মবোধ একটি পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি এবং তার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে মানুষের নৈতিক জীবনে। তথাপি যার জন্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের উদ্বেগ, তা হচ্ছে মানুষের মত করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এবং এরই জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে। সেই ভূখণ্ডের জন্য নয়, যার সাথে অস্থায়ীভাবে মানুষের আত্মার সংযোগ ঘটেছে।"

আল্লামা ইকবাল সংকীর্ণ স্বাদেশিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ আর ধর্মের ভাষায় একে একটি 'নরসৃষ্ট দেবতা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সংকীর্ণ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতাবাদের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের জন্য বিশ্বমানবতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম একদিকে যেমন বর্ণ, গোত্র ও বংশীয় আভিজাত্যকে নিস্তনাবুদ করেছে অন্যদিকে স্বাদেশিকতার বিগ্রহকেও চুরমার করে দিয়েছে। মানুষ যে ভূখণ্ডে বসবাস করে সে ভূখণ্ডের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ও টান থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষের পবিত্র আত্মা ও হৃদয় মন স্বদেশের মাটিতে সংকীর্ণ খাচাঁয় এমন ভাবে বন্দি হবে যে এর স্বাভাবিক ও মানসিক মুক্ত পক্ষ সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। তাঁর মতে, আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষবিষাক্ত স্বাদেশিকতাবাদের পরিণতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। এ হিংসাত্মক ও অন্ধ স্বদেশ প্রেম মানুষকে কোন দিনই হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ দেয় না। আর মানুষ যদি এ মহান গুণ হতে বঞ্চিত হয় তাহলে কোন দুষ্কৃতিই আর তার সাধ্যাতীত থাকে না।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ
Nationalism

ইকবাল ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; যা ব্যক্তি মানুষকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান দলে বিভক্ত করে। ইকবালের কাব্য পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে ইকবাল প্রচলিত জাতীয়তাবাদী ধারনার ঘোর বিরোধী এবং বিশ্বের সর্বজনীনতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষকে এ অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য ধাচের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি মুসলিম জনগণকে হুশিয়ার করে বলেছেন, "ইউরোপ জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় আমি তার বিরোধী। তার কারণ এই নয় যে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করা হলে তাতে মুসলিমদের বাস্তব লাভের সম্ভাবনা কম থাকবে। আমি এর বিরোধী কারণ আমি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি নাস্তিকতামূলক জড়বাদের জীবাণু যাকে আমি আধুনিক মানবতার পক্ষে বৃহত্তম বিপদ-সম্ভাবনা বলে মনে করি।" ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এক উন্নততর ও মহত্তর-ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। তার কাব্যে একদিকে যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র প্রতিবাদী সুর আর অপরিসীম ঘৃণা অন্যদিকে রয়েছে ইসলামী জাতীয়তাবাদের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, সেই সাথে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে। ইকবাল ছিলেন বিশ্বজনীন ও বিশ্বপ্রেমিক। এ জন্য বিশ্বজনীনতার বিরোধী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

গণতন্ত্র
Democracy

পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্রের প্রতি আল্লামা ইকবাল কখনও অনুকূল মত পোষণ করেননি। তিনি আজীবন ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। সততা, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা, নির্বাচিত সরকার এসব অর্থে আল্লামা ইকবাল গণতন্ত্রকে পূর্ণ সমর্থন করতেন। ইকবাল এ গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন পার্থক্য দেখেননি। ইকবালের মতে, শাসক ও শাসিতের মধ্যকার পার্থক্য দূর করে সাম্য, মৈত্রী, প্রেম-ভ্রাতৃত্ব, শান্তি-নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকারের বাস্তব সওগাত নিয়ে ইসলামই সর্ব প্রথম বিশ্ব মানবতার সামনে প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্মবাণী উপস্থাপন করে। মহান সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা হচ্ছেন ইসলামী গণতন্ত্রের প্রবর্তক আর তা বাস্তবায়ন করেন শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর একনিষ্ঠ সাহাবাগণ। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের চিত্তাকর্ষক শ্লোগানের মাধ্যমে মূর্খ, জ্ঞানী, সৎ, অসৎ ও নারী পুরুষ সবাইকে একই মাপকাঠিতে বিচার করে যে গণতন্ত্রের ডাক দেয়া হয় সে গণতন্ত্রকে ইসলাম মোটেই স্বীকার করে না। কারণ এসব গণতন্ত্রে নির্বাচনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে জনগণকে নিছক ধোঁকা ও প্রতারণা করা হয়। ইকবালের মতে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কোন উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়। এ গণতন্ত্রে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার বিচার হয় না। শুধু অর্থসম্পদ, বংশমর্যাদা ও প্রভূত্বের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। অন্যদিকে দলীয় কোন্দল, দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষ সমাজ দেহকে নোংরা করে তোলে। অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিরাই অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করে। ফলে এ ধরণের গণতন্ত্র উন্নত পরিবেশ ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেপারে না। উন্নত ও অনুন্নত সকল দেশেই এ প্রবণতা দেখা যায় যা সত্যিকার গণতন্ত্র নয়। আল্লামা ইকবাল বলেন ইসলামী গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ আর তাওহীদের ভিত্তি হচ্ছে 'আল-কোরআন'। আল-কোরআনই হল সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথ প্রদর্শক।

সমাজতন্ত্রের প্রতি অনীহা

আল্লামা ইকবাল আজীবন তাওহীদের জয়গান গেয়েছেন। তাকে ইসলামী রেঁনেসার কবি বলা হয়। সুতরাং তাঁর মতাদর্শ ইসলামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ইকবালের মতে ইসলামী আদর্শের প্রকৃত শিক্ষা শুধু পারলৌকিক জীবনের সম্ভাবনার কথাই বলা নয়, আর্থসামাজিক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও মানুষের দীর্ঘস্থায়ী জাগতিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও নিয়োজিত। ইকবাল ছিলেন গভীরভাবে ধর্মীয় ভাবাপন্ন এবং সে কারণেই তিনি নিরীশ্বরবাদী কমিউনিজমের সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, আদি অকৃত্রিম ইসলাম একটি আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আজও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা করা হলে মুসলিম বিশ্বে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম ইত্যাদি তন্ত্র মন্ত্রের প্রয়োজন হবে না। ইসলামের অতীত গৌরব সে ন্যায় ও ইনসাফের ভাবধারার ফল, যা প্রতিটি নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমানের জন্য নিশ্চিত করেছিল। তিনি উদরের সাম্যতায় বিশ্বাস করতেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়নতা ও নিরাপত্তায়, যা মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বদা সহায়ক হয়।

আদর্শ মানব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শর্ত

আল্লামা ইকবালের মতে আদর্শ মানব সৃষ্টির জন্য তিনটি গুণ আয়ত্ত করা অপরিহার্য যথা- (১) সাহস (২) পরমতসহিষ্ণুতা (৩) ফকর। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল।

সাহস : একটি আদর্শ, পরিপূর্ণ এবং বিকশিত মানবজীবন চর্চার অন্যতম উপাদান হল সাহস। মানব জীবনের গতিশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা আনয়নের পক্ষে সাহস একটি সহায়ক শক্তি, প্রেম যেমন আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও সাহসী করে, ভীতি তেমন আত্মাকে করে অবদমিত। এ আত্মা তখন মানব জীবনের কলঙ্ক হিসাবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ্‌ভীতি ব্যতীত অপর সব ধরনের ভীতি যাবতীয় মন্দ কাজরে জন্ম দেয়। ইকবাল মনে করেন, একমাত্র তাওহীদই পারে মানুষকে ভীতিমুক্ত জীবন নির্বাহে উৎসাহ যোগাতে। কারণ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এর অর্থ হল

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত বিশ্বজগতের যাবতীয় শক্তিকে উপেক্ষা করা, যা মানুষের কল্যাণের পথে চরম প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

পরমতসহিষ্ণুতা : আল্লামা ইকবাল তার পরিপূর্ণ আদর্শ মানবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্বারোপকারী চিন্তা চেতনার সমৃদ্ধির জন্য সুস্থ, সুন্দর সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি বলেন, মানুষের কর্মপ্রবণ আত্মার মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজের আত্মমর্যাদাবোধ ও অন্যের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ। তাঁর ভাষায়, একমাত্র তাওহীদের শিক্ষার মাধ্যমে এই গুণ অর্জন সম্ভব। কোন প্রত্যয়হীন মূল্যবোধ থেকে এ গুণ অর্জন সম্ভব নয়।

ফকর : পরিপূর্ণ মানবের তৃতীয় গুণ হচ্ছে ফকর। ফকর এর মূল বক্তব্য হচ্ছে মুমিনকে জড় বিশ্বকে জয় করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগান, কিন্তু নিজে জড় বিশ্বের দাসে পরিণত হবেনা।

ভারতীয় মুসলমানদের অনুপ্রেরণা দান

ভারতীয় মুসলমানদের আত্মিক ও পার্থিব জীবনের মধ্যে সংযোগ উপলব্ধি করে আল্লামা ইকবাল নতুন আকাঙ্খা ও আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের সম্পূর্ণ মানসিকতাকে ঢেলে সাজাবার উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন "ভারতীয় মুসলমানগণ সুদীর্ঘকাল ধরে তার আত্মার গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে। তার ফলে জীবনের পূর্ণদীপ্তি ও জৌলুস নিয়ে সে বাঁচতে পারছে না। পরিণামে সে এমন শক্তির সাথে অমানুষোচিত আপোস করার বিপদ-সম্ভবনার সম্মুখীন হয়েছে।"

উপরিউক্ত সমস্যা চিহ্নিত করে আল্লামা ইকবাল কোরআন এর আলোকে জাতির পথ নির্দেশ করে বলেছেন," সুনির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে যতক্ষণ না কোন জাতি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তন আনয়নের জন্য উদ্যমশীল হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্‌ তায়ালা সে জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না। ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবনের আযাদীর উপর সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। একমাত্র এই ঈমানেই জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার লক্ষ্যের প্রতি এবং তাদের কে বাঁচিয়ে রাখে চিরন্তন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে।"

মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লামা ইকবালের কবি মানসে সর্বপ্রথম রেখাপাত করেছিল। কবি ইকবালের চিন্তার ফসল ছিল একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। তাঁর মতে, ভারতের বুকে এক মুসলিম ভারত গড়ে তোলার জন্য উত্থাপিত মুসলিম দাবি ছিল যুক্তি সঙ্গত, কারণ এই দাবি স্বীকৃতি লাভ করলে ভারতীয় মুসলিম তার নিজস্ব ভারতীয় আবাসভূমিতে নিজস্ব তাহজীব তমুদ্দুন (ইতিহাস ঐহিত্য)

www.pathagar.com

অনুযায়ী বলিষ্ঠ প্রত্যয় সহকারে ঘোষণা করলেন 'ভারত দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশে সাংস্কৃতিক শক্তি হিসাবে ইসলামের জীবন সব চাইতে বেশি করে নির্ভর করে তাকে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূতকরণে।' স্বাপ্নিক আদর্শবাদী কবি ইকবালের স্বপ্ন সাধনার বাস্তব রূপায়নের গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব রাজনীতিবিদ কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্।

শেষকথা

আল্লামা ইকবাল ইসলামী আদর্শের নিবেদিত প্রাণপুরুষ। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মহান শিক্ষা ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যে, বক্তৃতায় এবং সংলাপে। যে কোন সংকটময় মুহুর্তে মুক্তির জন্য সাহায্য নিয়েছেন আল কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ্‌র এবং এ দুয়ের নির্দেশ মোতাবেক সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম জাতির ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধির যার অভাবে মুসলিম জাতি বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত ও নিপীড়িত। মুসলিম জাতির দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে পাশ্চাত্যের বিপরীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে মহান দর্শন প্রচার করেছিলেন তা আজও অমর ও অবিকৃত অবস্থায় ইতিহাস হয়ে আছে। আল্লামা ইকবাল কখনো কবি, কখনো দর্শন কখনো রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে যে মহান দর্শন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রচার করেছিলেন তা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই আজকের এই অশান্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ক্ষত-বিক্ষত বিশ্বব্যবস্থায় ইকবালের দর্শন ও আদর্শের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম এন রায়)
Manavendra Nath Roy [M N Roy 1887 – 1954 AD]

এক অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এম এন রায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ নেয়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। পরবর্তীকালে মেক্সিকো ও চীনের বিপ্লব অভ্যুত্থানেও তাঁর সক্রিয়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। লেলিন, ট্রটস্কী ও স্ট্যালিনের মত বিশ্বখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার দুর্লভ সম্মান তিনি পেয়েছেন। তার মত ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ জীবন সে সময় জাতীয় স্তরে অন্য কোন নেতা বা কর্মীর ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া সকলেরই কর্মক্ষেত্র ছিল ভারত। নেহেরু ছাড়া অন্য কারো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ছিল না। বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনে রায়ের যে অভিজ্ঞতা ছিল এমনকি নেহেরুরও তা ছিল না।

www.pathagar.com

জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

যে ব্যক্তির জীবন এমন ঘটনাবহুল তাঁর আসল নাম মানবেন্দ্র নাথ রায় বা এম এন রায় নয়। তার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কলকাতার কাছে চব্বিশ পরগনা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামে ১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ ওরফে নরেন ওরফে নোরেন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। তিনি মেদেনীপুর জেলার ক্ষেপুতেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তার চতুর্থ সন্তান। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন। তিনি দ্বিতীয় পত্নীর দ্বিতীয় সন্তান।

নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয় চিংড়িপোতা নামক গ্রামে। তাঁর বাবা এক পর্যায়ে চিংড়িপোতায় কিছু সম্পত্তি অর্জন করেন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯০৫ সালের মে মাস পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন। নরেন্দ্রনাথ চিংড়িপোতায় লালিত-পালিত হন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তার জঙ্গী জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ দেখা যায়। কোন স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং কত উন্নতি করেন সে সম্পর্কে অবশ্য নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। এটা জানা যায় যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে তিনি কলকাতায় "ন্যাশনাল কলেজে" ভর্তি হন। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এখানেই শেষ।

নরেন্দ্রনাথের গ্রাম চিংড়িপোতা কোদালিয়া, হরিনাভি, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামের কাছাকাছি। এই গ্রামগুলো একযোগে বর্তমান বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। সমরেন রায়ের মতে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বহু ধর্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক এই এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে রাজ নারায়ণ বসু, 'সোম প্রকাশ' পত্রিকার বিশিষ্ট সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম। এই শিবনাম শাস্ত্রী ছিলেন নরেনের মাতার মামা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ কিছুটা হলেও জীবনের প্রথমেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বয়ঃবৃদ্ধির সময় বাংলাদেশে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে এই অস্থিরতা চরম প্রকাশ পায়। কিন্তু তার পদধ্বনি বহু আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এই আন্দোলন এত বিস্তৃত ও ঘনীভূত হল যে শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগি রদ করতে হল। জাগ্রত স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করা গেল না, বরং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করল প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একের পর এক আঘাত হানতে।

নিজের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো তথা প্রদেশের লড়াকু জাতীয়তাবাদে প্রভাবান্বিত যুবক নরেন্দ্রনাথ সহজেই এই সময়কার বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। সঠিকভাবে বলা কঠিন তিনি কোন সময় এ আন্দোলনে যোগ দেন। সমরেন রায় লিখিত, "দি রেস্টলেজ ব্রাহমিন" বইয়ের ভূমিকায় তার নিত্যসঙ্গী যদু গোপাল মুখার্জী বলেছেন; ১৯০৫/১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির কার্যালয়ে কর্মীদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল এবং নরেন প্রায়ই সেখানে

www.pathagar.com

থাকতেন। তিনি ও হরিকুমার চক্রবর্তী একত্রে সমিতির সদস্য হন। ১৮৯১ সালে হরিকুমার চক্রবর্তী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং তদবধি তিনিই তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও চিরসুহৃদ ছিলেন। হরিকুমার চক্রবর্তী নরেন সম্পর্কে বলেন," যুবক নরেন দুঃসাহসী কাজে উৎসাহী ছিলেন, দীর্ঘ ভ্রমনে আনন্দ পেতেন, উদ্যান হতে উদ্যানে পরিভ্রমণ, আয়ত্বের বাইরের কাজে সর্বদা নিমগ্নতা ছিল তাঁর স্বভাব। ভূত প্রেতের সন্ধানে বহু রাত্রি তিনি শ্মশানে অতিবাহিত করেন।" নরেন্দ্র তাঁর পিতার নিকট থেকে সংস্কৃত শিক্ষা, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শন, শিবনারায়ণ স্বামীর কাছে লাঠি খেলা, যোগ বিদ্যা, জাতীয়তাবাদ ও পরিশোধিত হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও তিনি বিপ্লবীদের ও তাদের কার্যাবলি সংগ্রহ করতেন।

আন্দোলনে নরেন্দ্রনাথের যোগ দেয়া সম্পর্কে সে সময়ের এক সহকর্মী বলেছেন, "অনধিক চতুর্দশবর্ষীয় বালক নরেন্দ্র ছিলেন পৌরুষদীপ্ত ও উদ্যমশীল। বিপ্লবে আস্থাবান নরেন্দ্র সবেগে আমাদের সেই ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে আমরা বাংলা ও অন্যান্য স্থানের সমস্যা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা করতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর বিদেশি শৃঙ্খল হতে ভারতের মুক্তিযজ্ঞে নিজেকে সার্বক্ষনিক কর্মী হিসেবে উৎসর্গ করেন। অসম্ভবকে সম্ভব করতে তিনি প্রস্তুত এমন শপথ গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন, বিপ্লবীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এরপর আন্দোলনে তিনি নিজেকে অপরিহার্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। জননায়কের দুর্লভ স্তরের অধিকারী ছিলেন তিনি।"

বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে নরেন গুলি ছোঁড়া ও বোমা তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। বুলেট ও বোমা বিপ্লবীদের প্রধান অস্ত্র। ব্রিটিশ অফিসারদের সন্ত্রস্ত করতে, দলত্যাগী ভারতীয় সহযোগীদের শাস্তি দিতে এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানে মদদ দিতে এসব ব্যবহার করা হত।

এই সময় নরেন যতীন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বাংলা সরকারের অর্থ সচিবের অফিসে কেরানী ছিলেন। যতীন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দয়ালু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই ভদ্র লোককে নরেন নেতৃত্বের পদে বরণ করেন এবং পরবর্তী কালে দুজনে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক কাজে অংশ নেন।

নরেন ইতিমধ্যে বারীন ঘোষের বোমা তৈরির কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু মুজফফরপুরে যে বোমা ব্যবহার করেন সেটিও এই কেন্দ্রে তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে নরেন জড়িত ছিলেন। বিপ্লবী কাজকর্মের অগ্রগতির জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে ডাকাতি করা হয়েছে অনেকবার। ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর চিংড়ি ঘাটা রেলস্টেশনে ডাকাতি, ১৯০৯ সালের ২৫ এপ্রিল চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের কাছে 'নেত্র'র ডাকাতি, ১৯১০ সালের শুরুতেই হাওড়া শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদির প্রত্যেকটিতেই নরেন জড়িত ছিলেন এবং প্রত্যেকটি মামলায় আসামী ছিলেন। তিনি এক বছরের অধিককাল এসকল মামলায় জেল খাটেন। তবে এসকল মামলার বিচার চলাকালীন জেলের মধ্যেই যতীন মুখার্জী, নরেন ও আরো অনেকে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার একটি ছক তৈরি করেন। এটা ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ।

www.pathagar.com

নরেন সমস্ত বিপ্লবী সংস্থার কাছে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কার্যক্রম পেশ করতেন এবং তা গ্রহণে তাদের প্রভাবিত করাই ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এক নেতৃত্বাধীন করা ছিল পরবর্তী কাজ। নির্দিষ্ট উভয় কাজের জন্য তাঁকে সমগ্র বাংলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। কিছুকালের জন্য তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। পুলিশের সন্দেহ এড়িয়ে সন্ন্যাসীরূপে ঘুরে বেড়ানো অনেক সহজসাধ্য ছিল। এই সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন। এতে শীঘ্রই এটা পরিষ্কার হল যে আত্মা নয়, মাতৃভূমির মুক্তিই নরেন অনুসন্ধান করছিলেন। তিনি বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছেন। এই সমস্ত ভ্রমণ ও লোক সংস্পর্শের মাধ্যমে তিনি জ্ঞান লাভ করেন।

জেল থেকে মুক্তির পর আড়াল হিসাবে নরেন ইন্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্টের চাকরি নেন। ১৯১২-১৯১৩ সালে নরেন প্রধানত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ এক বোর্ডিং হাউসে থাকতেন। কিছুকাল পরে নরেন চাকরি ছেড়ে একটি রেঁস্তোরা খোলেন। এটাই অস্ত্র সংগ্রহ ও সংবাদ আদানপ্রদানের কেন্দ্র হয়ে উঠে। নরেনের তৈরি বিশেষ আহার্যসামগ্রীর জন্য এই রেস্তোরা সৈনিক ও নাবিকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং তা সংগ্রহের ভার নরেনের উপর দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এক পুস্তকে এম এন রায় লিখেন, "আমার উপর ন্যস্ত প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ প্ল্যানমাফিক শীঘ্রই সম্পন্ন হয়েছিল।" নরেনের নেতৃত্বে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার গার্ডের নীচ অঞ্চলে বার্ড কোম্পানির টাকা নরেন দুই সহকর্মীর সাহায্যে লুট করেন। এ বিষয়ে এটাই প্রথম ডাকাতি। "গার্ডের নীচ রাজনৈতিক ডাকাতি" নামে অভিহিত এই ডাকাতি কলকাতায় সাড়া জাগায়। এটাই প্রথম বড় রকমের ডাকাতি এবং সমস্ত ঘটনা বন্দুকের মুখে কোন গুলি না ছুঁড়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়। ড. যদুগোপাল মুখার্জির মতে "পরম আত্মবিশ্বাসের নিদর্শন দুঃসাহসিক গার্ডের নীচ ডাকাতি নরেন ভট্টাচার্য ঠাণ্ডামাথায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। একটিও গুলি ছোঁড়া হয়নি।" ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য দু'এক দিনের মধ্যে নরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানি থেকে কিছু অস্ত্র চুরি হয়ে যায় এবং যতদূর জানা যায় এ অস্ত্রগুলো বাংলার নয়টি বিপ্লবী সংস্থায় ভাগ করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় একই সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। দিগন্তে যুদ্ধের কালো মেঘ জমতে থাকে এবং ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিদেশে বসবাসকারী বন্ধু-বান্ধবদের অধীনে বিপ্লবীরা ইতোমধ্যে সংবাদ পেলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হলে জার্মানি তাঁদের সাহায্যের জন্য আগ্রহী।

ভারতের বিপ্লবীরা জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথাবার্তা শুরু করে। ১৯১৩ সালের শেষভাগে কলকাতাস্থ জার্মান কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে নরেন জার্মানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও গেরিলা যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি এবং যতীন মুখার্জী ১৯১৪ সালের প্রথমদিকে কলকাতার

www.pathagar.com

জার্মান কনসাল জেনারেলের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য বিপ্লবীরা তাঁদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করে। সশস্ত্র অভিযানে সংকল্প নেয়া হয় এবং যতীন মুখার্জী দলের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। ঠিক এই সময়ে যতীন মুখার্জীর কলকাতায় আসা বিপদজ্জনক হয়ে উঠে এবং নরেন তাঁর জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবীরা খবর পান যে জার্মান অস্ত্র পাঠাতে প্রস্তুত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য বাটাভিয়ায় একজন প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তুতিও একই সঙ্গে ছিল। অস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনায় বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। প্রতিনিধি পাঠানোর নিমন্ত্রণ তারা গ্রহণ করলেন। নরেন এজন্য নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচন তার রাজনৈতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে প্রমাণিত।

১৯১৫ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে নরেন জাভায় অস্ত্র যোগাড় করতে যাত্রা করেন। যে অস্ত্রের সন্ধান তিনি করছিলেন তা তিনি পাননি তার পরিবর্তে এক আদর্শ ও পরিচিতি তিনি পান। অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রায় জাভা, চীন ও জাপান পৌছেন। এখানে নরেন শীঘ্রই এম এন রায় নামে পরিচিত হন। স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে থাকাকালীন এক ভারতীয় বন্ধু তাঁকে সমস্ত অতীত বিসর্জন দিয়ে নতুন ভবিষ্যৎ শুরু করার জন্য নাম পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শমত নরেন নাম পরিবর্তন করে মানবেন্দ্রনাথ রায় রাখেন। মানবেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ প্রায় এক হলেও রায় ও ভট্টাচার্যে তফাৎ অনেক। যদিও এই সাধারণ বাঙালি পদবী রায় কেন পছন্দ করেছিলেন তা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

তিনি এম এন রায় হিসেবে আবির্ভূত হন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। তিনি একে "আমার পুনর্জন্ম" আখ্যা দেন। তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন যে, এই নাম তাঁকে ব্যর্থ অতীত থেকে রোমান্টিক ও কৃতিত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তার বর্ণনায়, "এটা ছিল নতুন পৃথিবীতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) উদ্দীপনাময় ভ্রমণের প্রারম্ভ।"

১৯১৭ সালে তিনি মেক্সিকোতে যান এবং এখানেই তিনি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় তথা মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত হন। রায় অর্থহীন ও বন্ধুহীন অবস্থায় মেক্সিকোতে পৌছান। তার সাথে শুধু যুকাতান প্রদেশের রাজ্যপাল জেনারেল আলভাডোরের জন্য একটি পরিচয়পত্র ছিল। ঐ চিঠিটার সাহায্যে মেক্সিকোর উচ্চতর শাসকবর্গের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে এবং জাভায় অবস্থিত জার্মান সামরিক প্রশাসনের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে প্রচুর অর্থও পেয়ে যান। জার্মান অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রায়কে দুভাবে সাহায্য করেছে। তিনি রাষ্ট্রপতিসহ মেক্সিকোর শাসকবর্গের কাছে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। তিনি এই অর্থের বেশীরভাগ মেক্সিকোতে সমাজতান্ত্রিক দলের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেক্সিকো শহরে এক চিত্তাকর্ষক সম্মেলনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রায় দলের মুখ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। দল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এত সুবিদিত ছিল যে তিনি একজন বিদেশী সেটা কেউ গ্রাহ্য করলেন না।

www.pathagar.com

রায় ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে মেক্সিকো ত্যাগ করেন। তার জন্য কূটনৈতিক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইউরোপীয় দেশে মেক্সিকোর প্রতিনিধিদের রায়কে প্রয়োজনীয় সাহায্যের নির্দেশ দেয়া হয়।

রায়ের কাছে মস্কো যাত্রা ছিল তীর্থযাত্রার মত। এই সময়ে তিনি একজন দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষে পরিণত হয়েছেন এবং যে বিশ্ববিপ্লবের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, মস্কোকে তারই নির্দেশক কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সে সময় রাশিয়া যাওয়া এমনকি বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের ভিতর যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। ১৯২০ সালের এপ্রিলের শেষার্ধে রায় মস্কো পৌছান। তার খ্যাতি আগেই সেখানে পৌছায়। কয়েকদিনের মধ্যেই রায় লেলিন, জিনোভেভ এবং ট্রটস্কিসহ কমিনটার্নের প্রখ্যাত নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। লেলিন রায়কে দেখে প্রথমেই বলেন, আপনি এত অল্পবয়স্ক, আমি তো প্রাচ্য দেশ থেকে শুভ্রশশ্রুমণ্ডিত এক পণ্ডিতকে আশা করছিলাম। ১৯২০ সালে ২৩ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত মস্কোর কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। রায় ও স্ত্রী ইভলিন রায় মেক্সিকোর কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে এই কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন এবং প্রাচ্যে বিশেষত ভারতবর্ষে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে চুক্তিবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েক সপ্তাহ পরেই রায় পূর্বাঞ্চলে বিপ্লব প্রসারের জন্য তাসখন্দে যান। তিনি ১৯২০ সালে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন বলে জনশ্রুতি আছে। ১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে রায়কে চীনে পাঠান হয়। কিন্তু চীনে রায়ের মিশন ব্যর্থ হয় এবং ১৯২৮ সালে তাঁকে কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

রায় ভারতবর্ষে ফিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্রতী হন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি একদল তরুণ ভারতীয়দের যোগাড় করেন যারা তাঁর সঙ্গে একমত ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত। আগে ভারত ও ইউরোপে যেসব কম্যুনিস্টকে তিনি শিক্ষা দেন তারা কমিউটার্নের সঙ্গে থাকাই অধিকতর পছন্দ করেন। এরা রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার নিন্দা ও গালিগালাজ করার জন্য কমিউটার্নে যোগ দেন।

ভারতে ফিরে আসার কিছু দিন পরেই তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে জওহর লাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, বিআর আম্বেদকর নেতাজী সুভাস বসু প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কারাবন্দি অবস্থায় রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বাংলাদেশে আসেন। ২০ বছর পর জন্মভূমিতে সেই তাঁর প্রথম পদার্পন। কংগ্রেসে কাজ আরম্ভ করার আগেই রায় তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার বিবৃতি দেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন, আমার রাজনৈতিক কাজের উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা এই বিবৃতিতে খুশী হন নি। আশ্চর্যের বিষয় সংগঠিত বামপন্থী দল থেকেও তিনি এ বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভাসচন্দ্র বোস দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হন। ফলে কংগ্রেসে অভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে বোস পদত্যাগ

www.pathagar.com

করেন এবং গান্ধীবাদ নেতৃত্বই কংগ্রেসে ক্ষমতা দখল করে। ফলে রায় ও কংগ্রেসে তাঁর অনুসারীরা League of Radical Congressmen নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরি করেন। ১৯৪০ সালের কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশ্য এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রতীকী প্রতিবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ফ্যাসিবাদের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ব্যক্ত করেন। রায়ের মতে যুদ্ধকালে যুদ্ধের প্রতি মনোভাবই হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রগতিশীল চরিত্রের কষ্টিপাথর। যে তাকে সমর্থন করে বা তার সাফল্যের জন্য কাজ করে সেই প্রগতিশীল, যে তার বিরোধিতা করে সে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতির শত্রু। সেই বিচারে গান্ধীজী, নেহেরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। সেই সময়ে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করলে রায় এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেসকে একটি ফ্যাসিবাদী সংগঠন বলে অভিহিত করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

জীবনের শেষ পর্বে রায় কম্যুনিস্ট মতবাদ থেকে সরে এসে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রবক্তা রূপে পরিচিত হন। কমিউনিজমের ভুলত্রুটি বুঝতে পেরে সবকিছু গ্রহণ করার নতুন দর্শন মানবতাবাদকে তিনি বিকশিত করেন।

মৌলিক মানবতাবাদ রায়কে গান্ধীজী ও তাঁর চিন্তাধারার নিকটবর্তী করে। ফলে দুজনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সমস্ত সামাজিক চিন্তাকর্মের কেন্দ্রবিন্দুই ব্যক্তি - এই সত্য উভয়েই গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দুই বছরে গান্ধীজী সম্পর্কে রায়ের চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষমতা থেকে সরে আসা এবং সম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশে তাঁর একক দৌত্য গান্ধীজীর অবিচলিত সমালোচক রায়কে মুগ্ধ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন গান্ধীজী এক বিরাট নৈতিক শক্তি। গান্ধী হত্যা সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

তাঁর রচনাবলী
His Books

এম এন রায় বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল :

(i) India in Transition (1922)
(ii) The Future of Indian Politics (1926)
(iii) Our Differences (1938)
(iv) Scientific Politics (1942)
(v) New Humanism (1947)
(vi) Radical Humanism (1952)
(vii) Reason, Romanticism as Revolution (1953)

www.pathagar.com

এছাড়া The Historical Role of Islam (1936) বইটি ১৯৪৭ সালে বাংলায় অনূদিত হয়। তিরিশের দশকে জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক গভীর আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন এবং এ বিখ্যাত বইটি লিখেন। গণতন্ত্র দিবস আরম্ভের কিছু আগে, ১৯৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারি রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এম.এন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তা
Political Thought of M N Roy

এম এন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকে নিম্নে তুলে ধরা হল :

মার্ক্সবাদী বিপ্লবী হিসাবে রায়

১৯২০ সালে মস্কোয় কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এম এন রায় ও লেলিনের মধ্যে উপনিবেশ সম্পর্কে কমিউনিস্ট নীতি কি হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। লেলিন মনে করেন, এখন কমিউনিস্টদের উচিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণভাবে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু রায় উপনিবেশগুলোতে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি অবিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁর মতে, ঐসব দেশে বুর্জোয়ারা জাতীয় বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করবে। তিনি যাকে মনে করেন, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোতে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী নেতাদের সর্বহারা বিরোধী মনোভাব উদঘাটন করে অবশ্যই আপসহীন মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাবেন।

রায় আরো মত পোষণ করেন যে, উপনিবেশিক শাসন উৎখাত করা উপনিবেশগুলোতে বিপ্লব সাধনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। রায় সর্বহারা বিপ্লবে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী ছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, উপনিবেশগুলোতে যে বিপ্লব হবে, তা কমিউনিস্ট বিপ্লব হবে না। কিন্তু তাঁর মতে, কমিউনিস্টরা সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব তাদের হাতে রাখতে পারলে তা অনতিবিলম্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবে পরিণত হবে।

রায় একপর্যায়ে তাঁর কট্টর মনোভাব থেকে সরে আসেন এবং কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এক Suplementary Thesis প্রণয়ন করেন। তাঁর এ বক্তব্য লেলিনের মনে রেখাপাত করে এবং লেলিনের থিসিসের সঙ্গে রায়ের থিসিস একসঙ্গে গৃহীত হয়।

গান্ধীর ভূমিকা প্রসঙ্গে রায়ের সাথে লেলিনের বিরোধিতা

গান্ধীর ভূমিকার মূল্যায়ন সম্পর্কে লেলিনের সঙ্গে রায়ের মতদ্বৈততা ছিল। লেলিন ভারতের বিরাজমান পরিস্থিতিতে গান্ধীর ভূমিকাকে প্রগতিশীল বলেই দেখতে পান। কিন্তু রায় গান্ধীকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

এম.এন রায় Indian Problem & Its Solution রচনায় কংগ্রেসের নীতি এবং গান্ধীর ধ্যানধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি গান্ধীর রক্ষণশীলতা ও মধ্যযুগীয় চিন্তাচেতনার সমালোচনা করেন। রায়ের মতে গান্ধী ধর্মতত্ত্ব প্রচার করে কার্যত জনগণের মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রতি আবেদন করছেন এবং এভাবে কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জনগণকে নিরুৎসাহিত করছেন। গান্ধী সমর্থিত এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত অসহযোগ আন্দোলনের কোন বিপ্লবী কর্মসূচি নেই বলেও রায় মনে করেন। তিনি শ্রেণীসংগ্রাম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জনগণের বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত করার জন্য ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মত জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

১৯২৩ সালে রায় তার One Year of Non-Co-Operation রচনায় গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জনজাগরণে গান্ধীর প্রচেষ্টার গুরুত্ব স্বীকার করলেও সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। রায়ের মতে, গান্ধীর কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেই এবং তাঁর 'চরকা' অর্থনীতি প্রতিক্রিয়াশীল। গান্ধী ভাইসরয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিপ্লববাদ নয় বরং দুর্বল সংস্কারবাদের ধারাই অনুসরণ করছেন বলে রায় মনে করেন।

রায় গান্ধীবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক মতবাদ হিসাবে নিন্দাবাদ জানান। তাঁর মতে, দেশে পুঁজিবাদী শোষণের বাস্তবতাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই গান্ধী অহিংস মতবাদের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। এ মতবাদ দেশে জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে দমন করে রেখেছে বলেও তিনি দাবি করেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে মার্ক্সবাদের প্রভাব

মস্কোতে রায় সেই সময় India in Transition নামে গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেন। মৌলিকতার জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ। এই বইতেই প্রথম ভারতীয় বিপ্লবকে মার্ক্সসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই বই প্রচুর বিক্রিও হয়। ভারতে এর বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও গোপনে বই আসে এবং বুদ্ধিজীবীরা আগ্রহ সহকারে বইটি পড়েন। ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ার পক্ষে বইটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেলিনের সঙ্গে বিতর্কে তিনি যে ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানিক তথ্য দেন বইটিতে তারও উল্লেখ ছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয় ও পতন সম্পর্কে লিখতে চেয়েছিলেন, সেজন্য বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সেসব বার্লিনে এক প্রকাশকের কাছে নিরাপদে রাখেন। কিন্তু সেগুলো হিটলারের লুটতরাজের শিকার হয়।

রায়ের দৃষ্টিতে ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রেণী সংগ্রামও অব্যাহত রয়েছে। রায়ের মতে, ব্রিটিশ এবং ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্যে এমন কোন বিরোধ নেই যা নিয়ে আপস করা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন যে, বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার পর সর্বহারাগণই ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবেন।

www.pathagar.com

পিপলস্ পার্টি গঠন

মানবেন্দ্র নাথ রায় একটি ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিকদল গঠন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে "পিপলস্ পার্টি" গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর 'The Future of Indian Politics' (১৯২৬) রচনায় মত ব্যক্ত করেন যে, বড় বড় বুর্জোয়া জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হতে কার্যত বিদায় নিয়েছেন; ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পাতি। বুদ্ধিজীবী, কারিগর ও কৃষকশ্রেণী সাময়িকভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করবে। ঠিক এই সময়ে তিনি আরো দাবি করেন, ভারতে পাতিবুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণভাবেই সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। তাঁর পিপলস্ পার্টি সর্বহারাদের পরিপূরক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে তিনি সর্বহারাকেই জাতীয় মুক্তির জন্য আন্দোলনকামী শক্তিগুলোর অগ্রসৈনিক বলে মনে করেন।

উপনিবেশ বিলোপ তত্ত্ব

এম এন রায়ের মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচয় পাওয়া যায় উপনিবেশ বিলোপ তত্ত্বে। সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে সংকট এবং পুঁজিবাদের অবক্ষয় থেকে উপনিবেশ বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উপনিবেশ শোষণের পুরাতন সেকেলে ধারা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নতুন ধারা ও পদ্ধতি অবলম্বনে বাধ্য করেছে। পুঁজি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশগুলোকে শিল্পের দিক দিয়ে পশ্চাদপদ করে রাখার নীতি পরিত্যাগে বাধ্য হয়। এর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। যথা-

(১) একটি পশ্চাদপদ কৃষিপ্রধান উপনিবেশ হতে ভারত ক্রমশ একটি আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত হচ্ছে। এবং

(২) স্বদেশী বুর্জেয়ো এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধের ভিত্তি সংকুচিত হয়ে পড়ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে এর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে এমন এক নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়, যা ভারতীয় বুর্জোয়াদের কতগুলো সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় না।

রায় উপনিবেশগুলোর শিল্পায়নের উপর জোর দেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, উপনিবেশগুলোর শিল্পায়ন উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার সূচনা করবে। সেখানে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন।

১৯২৮ সালে মস্কোতে কমিনটার্নের ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে রায়ের 'উপনিবেশ বিলোপ তত্ত্ব' প্রত্যাখান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে জাতীয় বুর্জোয়াদেরকে "প্রতি বিপ্লবী শক্তি" হিসেবে বর্ণনা করা হয়। রায় ১৯২০ সাল থেকেই তার এই নীতির প্রবক্তা ছিলেন এবং এ প্রশ্নেই লেনিনের সঙ্গে রায়ের মতানৈক্য ঘটেছিল। কিন্তু রায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে ইত্যবসরে এ নীতি পরিত্যাগ করেন। রায় কমিনটার্ন হতে বহিষ্কৃত হওয়ার কিছুদিন পরেই এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে রায়ের পূর্ববর্তী বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়।

www.pathagar.com

মার্ক্সবাদ ও রায়

১৯২৯ সালে রায়কে কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর থেকে রায় ধীরে ধীরে গোঁড়া মার্ক্সবাদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ হারাতে থাকেন এবং মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি মার্ক্সবাদের সমালোচনা করেন। তাবে সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি মার্ক্সকে "মূলত একজন মানবতাবাদী ও স্বাধীনতাপ্রেমিক" বলে বর্ণনা করেন।

মার্ক্সবাদের সমালোচনা

১. রায় মার্ক্সের বস্তুবাদকে 'অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন' বলে গণ্য করেন। মার্ক্সবাদের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

২ রায় মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন। তার মতে সামাজিক বিকাশধারায় এ ব্যাখ্যায় মানবিক ক্রিয়াকর্মের ভূমিকাকে ক্ষীণ করে দেখান হয়েছে।

৩. রায় শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার সমালোচনা করেন। তার যুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ।

প্রথমত, পুঁজিবাদীরা শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে শ্রমিকদের শোষণ করে এবং সমাজতন্ত্রে এ ধরনের শোষণ আর থাকবে না, এ মার্ক্সবাদী যুক্তি ভুল।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী সমাজে শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে মার্ক্সের ভবিষদ্বাণী সত্যে পরিণত হয় নি। রায়ের মতে, মার্ক্সসীয় মতবাদে বিপ্লব সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণীকেই প্রধান ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে; ফলে বিপ্লবের অগ্রসৈনিক হিসেবে অন্যান্য অসর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। রায়ের মতে, শ্রমিক শ্রেণীই একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী নয়, অ-শ্রমিক শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করছে। রায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণাকে 'জরাজীর্ণ বিশ্বাস' বলে গণ্য করেন।

তৃতীয়ত, রায়ের মতে, সামাজিক সহযোগিতা শ্রেণী সংগ্রামের তুলনায় অধিকতর মৌলিক। তিনি আরো বলেন, প্রগতি ও সংস্কারের লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে শ্রেণীসংগ্রাম অপেক্ষা অধিকতর উত্তম না হলেও শ্রেণীসংগ্রামের মতই উত্তম।

চতুর্থত, রায়ের মতে, সকল ইতিহাস যদি শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস হয়ে থাকে, তা হলে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরই অবসান ঘটাবে।

পঞ্চমত, রায় মনে করেন, শ্রেণীসংগ্রামের ধারণায় ব্যক্তিগত চেতনাকে শ্রেণীচেতনার নিচে স্থান দেয়া হয়েছে।

(৪) রায়ের মতে, মার্ক্সবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁর মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদারনৈতিক ও উপযোগবাদী ধারণাকে "বুর্জোয়া মানসিকতা" বলে প্রত্যাখ্যান করে মার্ক্স তাঁর পূর্বতন মানবতাবাদেরই বিরোধিতা করেছেন।

www.pathagar.com

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম
Radical Humanism

জীবনের শেষপর্বে রায় কম্যুনিস্ট মতবাদ থেকে সরে এসে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রবক্তা রূপে পরিচিত হন। কমিউনিজমের ভুল ত্রুটি বুঝতে পেরে সবকিছু গ্রহণ করার নতুন দর্শন মানবতাবাদকে তিনি বিকশিত করেন।

রায় সাম্যবাদকে মুক্তির দর্শন রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি লক্ষ্য করেন, যে রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে অত্যাচার ও দাসত্বের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। যখন তিনি দেখেন যে স্ট্যালিন প্রগতির শক্তিসমূহের নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে ইউরোপে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছেন, তখন তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত হন। সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ থেকে রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্ট্যালিনের কিছু কিছু কৌশল ও নীতি যা তিনি যুদ্ধের সময় সমর্থন করেন একই রকমের আপত্তিকর হীন ও সুবিধাবাদী এবং এর ফলে রাশিয়া একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত ভুল ত্রুটির বোঝা কোন একজন ব্যক্তির উপর চাপানোর পরিবর্তে যে দর্শনের দ্বারা স্ট্যালিন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পরিচালিত হন রায় তার গভীরে গিয়ে কারণ অনুসন্ধানে রত হন।

মানুষের প্রতি কমিউনিজমের অসম্মান ও অপমানের মধ্যেই তিনি সেই সমস্ত কারণ খুঁজে পান। অনূ অর্থনীতিবাদের কাছে মানুষ দাবার ঘুঁটি রূপেই পরিগণিত এবং শ্রেণীর ব্যাপকঅর্থে গুরুত্বহীন অংশমাত্র। তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হয়। ধনতন্ত্রেও একইরূপ ঘটে এবং রায়ের মতে এটাই বর্তমান পৃথিবীর সংঘর্ষের প্রধান কারণ। ধনতন্ত্র বা সাম্যবাদ কেউই এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখতে পারেনি।

রায় মনে করেন কমিউনিজমের বাইরে গিয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের কথা ভাবা উচিত যারা মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে, তার স্বাধীনতা ও উন্নতির কথা ভাবে, জাতীয় বা শ্রেণীর একটি সদস্য হিসেবে গণ্য করে না। যে সংকট পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে, যুদ্ধের এবং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে মুক্তি পেতে রায় সংগঠিত গণতন্ত্র ও সমবায় অর্থনীতির কথা বলেন। এই সংগঠিত গণতন্ত্র ও সরকার অর্থনীতিকে একটি দর্শনের ভিত্তিমূলে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। তাঁর নবলব্ধ "র‍্যাড়িক্যাল হিউম্যানিজ"-এর মাধ্যমে তিনি সে কাজ সম্পন্ন করেন।

স্বাধীনতা হল র‍্যাড়িক্যাল হিউম্যানিজমের মূলমন্ত্র। এটাই হল সর্বপ্রধান মূল্যবোধ যেখান থেকে অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধগুলো এসেছে। রায় স্বাধীনতা সম্পর্কে তার ভাবনা নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। "জীবনের লক্ষ্যই হল বেঁচে থাকা। অস্তিত্ব বজায় রাখাই হল মূল কথা। জীববিজ্ঞানের দীর্ঘ পরিক্রমায় এমনটাই চলে আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের স্বাধীনতার জন্য আর্তি উঠে। মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শুরু জীবনে বেঁচে থাকা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মানুষ যা কিছু করে, তার প্রত্যেকটি কাজই তার সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি, শৈল্পিক সৃষ্টি - এই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়। মানুষ সীমাবদ্ধ কিন্তু বিশ্ব অসীম। সর্বশেষ বিশ্লেষণে অনন্ত বিশ্বই মানুষের পরিবেশ। ফলত স্বাধীনতার জন্য তার

www.pathagar.com

সংগ্রাম চিরন্তন। সে কখনো বিশ্বকে জয় করতে পারে না। অতএব স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা দেয়। জ্ঞানের মাধ্যমেই সে পরিবেশকে জয় করে।"

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম সেই দর্শন যা মানুষকে অসম্পূর্ণ চিন্তা থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করে। এই মতবাদ তৃতীয় দর্শনে বিশ্বাস করে না। এই দর্শনের মতে মানুষ প্রাথমিক জীব এবং পার্থিব পরিমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পরিমণ্ডল একটি আইন শাসিত ব্যবস্থা। অতএব মানুষের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি তার আবেগ, তার ইচ্ছা, তার চিন্তা সবই পূর্বনির্ধারিত। অতএব মানুষ প্রাথমিকভাবে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন। মানুষের বিচারবুদ্ধি পৃথিবীর সংহতির প্রকাশমাত্র। মানুষের বিচার বুদ্ধি আছে তাই তার বিবেক আছে। বিচারবুদ্ধি বাড়লে নৈতিক দৃঢ়তা বাড়ে। মানুষের আদিম স্তর থেকে সভ্য নাগরিকে পরিণত হওয়ার কারণ খুঁজতে কোন বাইরের শক্তি বা তৃতীয় দর্শনের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হয় না। তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে। রায়ের মতে, মানুষের উন্নতির জন্য যে সামাজিক সংগ্রাম তা মানুষের বিবর্তনের পরিপূর্ণ ইতিহাস, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের একটি উচ্চতর রূপমাত্র; যা আবেগ, অনুভূতি বা প্রাকৃতিক পছন্দ অপছন্দের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তা বুদ্ধি, বিচার এবং যুক্তিনির্ভর হয়।

রায়ের মতে, ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রবণতা বর্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম। যেহেতু নবজাগরণের প্রবক্তা ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানবিকতাবাদী দার্শনিকদের দ্বারা এই দর্শন অনুপ্রাণিত সেজন্য রায় একে নতুন চিন্তা বলে মনে করেন না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নির্ধারিত করা সে সময় তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান এই আসুবিধা দূর করেছে। মানবিকতাবাদ বর্তমানে সমস্যার মূলে পৌছাতে পারে। সেজন্যই রায় তাঁর মতবাদকে মৌলিক মানবতাবাদ বলেছেন।

মৌলিক মানবতাবাদ রায়কে গান্ধীজী ও তাঁর চিন্তাধারার নিকটবর্তী করেছে। বর্তমানে দুজনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সমস্ত সামাজিক চিন্তা-কর্মের কেন্দ্রবিন্দুই ব্যক্তি - এই সত্য উভয়েই গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজনীতি শুদ্ধিকরণের জন্য দলহীন গণতন্ত্রে উভয়েই বিশ্বাস করতেন। রায় ছিলেন জড়বাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন আধ্যাত্মবাদী যিনি তাঁর আত্মিক সংযোগের উপর অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই বৈপরীত্য কতিপয় বস্তুনিষ্ঠ পরিণতির জন্য একযোগে কাজ করার অন্তরায় হয়নি। মৌলিক মানবতাবাদী ও গান্ধীজীর মর্যাদায় অনুগামীরা পরবর্তীকালে এই ধরনের সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

এম এন রায়ের অবদান মূল্যায়ন

এম এন রায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শেষপর্যন্ত মানবতাবাদ তথা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রবক্তা হয়ে উঠেন।

www.pathagar.com

মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে : ১৯২০ সালে রায় কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপনিবেশ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তখন রায় এ ব্যাপারে যে খসড়া উপস্থাপন করেন, তা ছিল ভারতের রাজনীতি ও কাঠামোর প্রশ্নে একজন ভারতীয় মার্ক্সবাদী প্রণীত প্রথম তাত্ত্বিক দলিল।

রায় উপনিবেশগুলোতে জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে ছেড়ে দেয়ার ধারণার বিরোধিতা করেন। অথচ, বুর্জোয়ারাই জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন বলে লেলিন সাধারণভাবে ধারণা করেন। রায়ের India in Transition (1922) রচনায় ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মার্ক্সবাদী ধারায় সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। ১৯২০ সাল থেকে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের পূর্বাবধি তারাই ছিলেন ভারতীয় মার্ক্সবাদের প্রধান তাত্ত্বিক। ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত দলিলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয় বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয় এবং ভারতীয় শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলনই ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতি সত্যিকারের হুমকি সৃষ্টি করেছে বলে উল্লেখ কর হয়।

শেষত, উপনিবেশ বিলোপ তত্ত্ব মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় সুচিন্তিতভাবেই রায়ের মৌলিক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টত সত্য প্রমাণিত হয়।

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসাবে : রায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি এ স্বাধীনতা অর্জনের যেসব উপায় নির্দেশ করেন তা বহুলাংশে অবাস্তব ও উদ্ভট বলেই মনে হয়। তবুও বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে রায় যেভাবে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রায়ের অবদানের যে মূল্যায়ন করেন তা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

১. রায় ভারতীয় বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেন। তিনি যখন দীর্ঘকালের নির্বাসন শেষে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন, সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উপযুক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাব ছিল।

২. রায় ছিলেন আধুনিক ভারতে রেনেসাঁর সর্বাপেক্ষা সচেতন পথিকৃৎ । তিনি রেনেসাঁর মানবতাবাদী দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন।

৩. রায় ভারতের ইতিহাস পূর্ণ লিখনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আধুনিক জ্ঞানের আলোকে চিরাচরিত মূল্যবোধের পূনর্মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪. রায় একজন সংশোধিত বস্তুবাদী ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারা এবং জীবন সম্পর্কিত তার ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার মধ্যে যুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। এবং

৫. রায় এক নূতন রাজনৈতিক দলের প্রবক্তা। তিনি পুরাতন মানবতাবাদকে বিজ্ঞানের সাহায্যে এক নতুন পরিস্থিতির উপনিবেশ করে তোলেন।

www.pathagar.com

সামাজিক ক্ষেত্রে : অম্লান দত্তের দৃষ্টিতে রায় প্রতিকূলতার মধ্যেও সমাজ বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে যুক্তির প্রতি তাঁর আস্থা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। দত্তের মতে, "আমাদের সময়ে যারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের বিশ্বাসের আতিশয্যহেতু অন্ধ-মতবাদের উপনিবেশে পরিণত হন।"

পরিশেষে বলা যায়, মহান বিপ্লবী এম এন রায়ের জীবন বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত মানবতার মুক্তির দিশারীরূপে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে নিবেদিত রাখেন। অক্লান্ত বিপ্লবী এম এন রায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে বহুগুণে।

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. অতীশ দীপংকরের চিন্তাধারা বর্ণনা কর।
[Discribe the thought of Atish Dipankar.]

২. রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে কৌটিল্যের মতামত আলোচনা কর।
[Discuss Kautilya's views regarding the elements of the state.]

৩. 'কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" প্রাচীন ভারতের শাসন কৌশলের উপর রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম।' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
['Khaulitya's "Arthashastra" is one of the most important works on the art of adminitration in ancient India.' Explain the statement.]

৪. কূটনীতি সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা আলোচনা কর এবং আধুনিক কূটনীতির সাথে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।
[Discuss kautilya's concept of diplomacy and point out its similarities and dissimilarities with modern dipolomacy.]

৫. কৌটিল্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Kautiliya.]

৬. আবুল ফজলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of Abul Fazal.]

৭. দ্বীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে আবুল ফজলের মতামত পর্যালোচনা কর।
[Review the opinion of Abul Fazal about the Deen-E-Elhi.]

৮. আল্লামা আবুল ফজলের রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর।
[Asessment the political philosophy of Allama Abul Fazal.]

৯. আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।
[Discuss the political philosophy of Allama Iqbal.]

www.pathagar.com

১০. ড. ইকবালের রাষ্ট্রদর্শন পর্যালোচনা কর।
[Review the political philosophy of Dr. Allama Iqbal.]

১১. অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীর মতামত আলোচনা কর।
[Discuss Gandhis about the non-co-operation and non violence movement]

১২. ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা পর্যালোচনা কর।
[Review Gandhis concept of religion and politics.]

১৩. মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক অবদান মূল্যায়ন কর।
[Assessment the political contribution of Mohatma Gandhi.]

১৪. এম এন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
[Discuss the political thought of MN Roy.]

১৫. রাষ্ট্রদর্শনে এম এন রায়ের অবদান মূল্যায়ন কর।
[Assessment the contribution of political philosophy of MN Roy.]

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

চীনা রাষ্ট্রচিন্তা
China Political Thought

❑ প্রাক-কথা, কনফুসিয়াস, কনফুসিয়াসের জন্ম, পারিপার্শ্বিকতা, কর্মজীবন, কনফুসিয়ানিজম, কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা/কনফুসীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য, তাওইজম, তাওবাদের বৈশিষ্ট্য, তাও ধর্মের নীতি

প্রাক-কথা
Introduction

রাষ্ট্রচিন্তার অ-ইউরোপীয় ধারায় প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার চারণক্ষেত্র হিসেবে চীনা রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব ও কোন অংশে কম নয়। যদিও পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ চীনা রাষ্ট্রচিন্তাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। কিন্তু প্রাচীন চীনের রাষ্ট্রচিন্তায় দেশাত্মবোধ, আনুগত্য, নৈতিক দায়িত্বস্বরূপ Political Morality প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীনা দেশীয় রাষ্ট্রচিন্তায় যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন কনফুসিয়াস, মেনসিয়াস, লাউ যু, চুয়াং যু, মেঙ যু, তাও প্রমুখ। তবে কনফুসিয়াসবাদ ও তাওবাদ প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে থাকে।

কনফুসিয়াস
Confucius (551-479 B.C.)

প্রাচীন চীনের রাষ্ট্রচিন্তায় যে সকল মনীষীদের চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন কনফুসিয়াস (Confucius)। মূলত কনফুসিয়াস হলেন প্রাচীন চীনের রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ - যিনি বিজ্ঞমহলে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে দর্শনের বিকাশ ঘটে তা কনফুসিয়ানিজম (Confucianism) বা কনফুসিয়াসবাদ নামে পরিচিত।

তাঁর জন্ম, পারিপার্শ্বিকতা ও কর্মজীবন

প্রাচীন চীনের সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণের অগ্রপথিক মহান কনফুসিয়াস খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে চীনের 'লু' প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় চীনে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বিদ্যমান ছিল। জন্মের কিছু দিন পর পিতৃ-বিয়োগের ফলে তিনি আর্থিক দৈন্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর শিক্ষা জীবন বিভিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রথম দিকে তিনি স্টোরকিপারের চাকরি নেন। পরে উদ্যান তত্ত্বাবধায়ক, চীনের-চুংতু নগরীর প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট এবং অপরাধ দমন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২২ বছর বয়সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে সদাচার ও সরকারের নীতির উপর শিক্ষা দেয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর সরকারের নীতি ও মানুষের মহৎ গুণাবলি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে গবেষণা করেন। ১৪ বছর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তিনি প্রাচীন অনেক গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনা করেন। কর্মজীবনে তিনি চীনের প্রশাসনিক কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি প্রচার করেন একমাত্র শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন সরল, ভদ্র, সাধু, মাতৃভক্ত কঠোর নিয়ন্ত্রক ও ছাত্র-সুহৃদ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ অব্দে এই মহান মনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

কনফুসিয়ানিজম
Confucianism

প্রাচীন চীনের রাষ্ট্রচিন্তায় যে সকল মনীষীদের চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন চীনা দর্শনের প্রবক্তা, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াস (Confucius)। মূলত কনফুসিয়াস হলেন প্রাচীন চীনের রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ ,যিনি সুধীমহলে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শিক্ষক হিসেবে সমধিক খ্যাত। সমাজ, রাষ্ট্র, শাসননীতি ইত্যকার বিষয় সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে দর্শনের বিকাশ ঘটেছে তা কনফুসিয়ানিজম (Confucianism) বা কনফুসিয়াসবাদ নামে পরিচিত।

কনফুসিয়ানিজমের উৎপত্তি
Origin of Confucianism

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও তৃতীয় অব্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরাম গৃহযুদ্ধ চলার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় শাসক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন পুরাতন সামান্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভাঙন ধরায় এবং দ্রুত রাজনৈতিক পারিবর্তনে চীনা সমাজে অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি লজ্ঘনের প্রবণতা দেখা দেয়। এহেন এক ক্রান্তিকালে কনফুসিয়াসবাদের উদ্ভদ ঘটে। কনফুসিয়াস আশংকা করেন যে, সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের প্রতি এ হুমকি সভ্যতারই ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই তিনি এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যা সরকারের স্থিতিশীলতা ও জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। তিনি বিশ্বাস করেন

www.pathagar.com

চীনের এই ধ্বংস প্রাপ্ত সমাজের জন্য একজন গুণবান ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক প্রয়োজন, যে শাসক তাঁর শাসনকার্য পরিচালনায় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করবেন এবং জনগণকে নৈতিকতা শিক্ষা দিবেন। তাঁর মতে, একমাত্র শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। সরকার সম্পর্কে তাঁর ধারণা, সরকার কোন দৈবগুণসম্পন্ন কোন সম্রাটের নিকট হতে উৎসারিত নয় বরং তা মানুষের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ও নির্ভুল সদগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে কিরূপ জীবনযাপন করবে এবং স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ হবে সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে প্রতিটি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করা। কনফুসিয়াসের উপদেশাবলি মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত ছিল। Analects of Confucius গ্রন্থে তাঁর অনুসারীরা তাঁর বহুল প্রচলিত উক্তি ও কর্মধারা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়, কনফুসিয়াস একজন ইতিহাসমনস্ক ও সতর্ক চিন্তাবিদ এবং নিজেকে প্রবর্তকের পরিবর্তে বার্তাবাহক বলে ঘোষণা করেন। কনফুসিয়াসের শিষ্যের সংখ্যা কয়েক হাজার। সমসাময়িক বিভিন্ন মনীষী তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে মেনসিয়াস, চুংজু, চুয়াংজু, সিনেটর টমাস মেংজু, স্যুনজু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কনফুসিয়াসের দর্শন মূলত সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথমিকভাবে বিকশিত হলেও কালক্রমে প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে ধর্মে পরিণত হয়।

কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা/কনফুসিয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Confucian Philosophy

কনফুসিয়াসের দর্শন সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের উপর পরিব্যাপ্ত। সামাজিক শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সৎ ও যোগ্য শাসক এবং সঙ্গী ও নৈতিকতাপূর্ণ জনগণের জন্য তাঁর উপদেশাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল।

ধর্মীয় আদর্শ

কনফুসিয়ানিজমকে সাধারণত ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। মূলত এটি ছিল এক নৈতিক ব্যবস্থা বা সদাচরণের ধারাবিশেষ। তার মতবাদকে নৈতিক আচরণের বা সুশাসনের এক পথ-নির্দেশিকা বলে বর্ণনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মতবাদে কোন ঈশ্বর বা দেবতার বিষয়ে বা মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেয়া হয়নি। কনফুসিয়াস মানুষকে পার্থিব জীবনেই উত্তম হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি মানুষকে সৎ, বিশ্বস্ত এবং শাসকদের প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেন। কিন্তু তিনি চীনের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতেও মানুষকে উপদেশ দিয়ে বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, শিক্ষার প্রসার

www.pathagar.com

ঘটাতে হবে, সৎ হতে হবে, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সুহৃদ হতে হবে, নিজের জন্য যা ক্ষতিকর অন্যের জন্য তা না করা।

মানবতা সম্পর্কে

কনফুসিয়ান নীতিশাস্ত্রের মূল কথা মানবতা বা মানবপ্রেম। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি বিশ্বাস হওয়াই মানবতার বহিঃপ্রকাশ বলে তিনি মনে করতেন। কনফুসিয়াস তার একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "তুমি নিজের জন্য যাহা কামনা কর না অন্যদের প্রতি তুমি তা করনা।" তিনি আরো বলেন, সকল মানুষ সব ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক থেকে সমান নয় এবং তাদের দায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন। মন্ত্রী রাজা বা শাসককে উপদেশ ও সেবা দিবে। পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে, ছোট ভাই বড় ভাইকে সম্মান দেখাবে, পারিবারিক তথা সামাজিক ব্যাপার বিতর্কের মাধ্যমে নয় বরং সবার আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। শাসনকার্য নানা রকম উৎশৃঙ্খলার মধ্যে চলতে পারে না বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

কনফুসিয়াস সকল মানুষকেই আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ বলে গণ্য করেন। মানুষ একে অপরের প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করুক এটাই তিনি কামনা করেন। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতির বলেই ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করে, কিন্তু ব্যক্তির নিজের মধ্যে এ মানবতার বিকাশ ঘটান উচিৎ এবং তার মধ্যে মানবতার কতখানি বিকাশ ঘটেছে তাই তার মহত্বের মানদণ্ড। মানবপ্রেম মানুষের জন্য এতই অপরিহার্য যে, কোন ব্যক্তির মানবতাবোধকে রক্ষা করা তার জীবন রক্ষা অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। কনফুসিয়াসের মতে, মানবতা ও শিষ্টাচারের উপযুক্ত বিকাশ ও সমন্বয় সাধন ব্যক্তির পূর্ণতা অর্জন এবং সমাজে অরাজকতা দূর করা ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার পক্ষে অপরিহার্য।

শাসন-নীতি সম্পর্কে

কনফুসিয়াস কেবল নিকৃষ্ট সরকারেরই বিরোধিতা করেননি বরং শাসনকার্যের নীতি প্রণয়নের ও চেষ্টা করেন। তিনি রাষ্ট্রকে একটি বিরাট পরিবার হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন - আইন ছাড়াই একটি পরিবার পরিচালিত হতে পারে, সেভাবে একটি রাষ্ট্রও পরিচালিত হওয়া উচিৎ। তিনি লিখিত আইন বিশ্বাস করতেন না। কারণ মানুষ যদি গুণসম্পন্ন হয় তাহলে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করবে। তবে সমাজে যারা উপলব্ধি করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাদের জন্য শাস্তিমূলক বিচার প্রয়োজন। এরূপ লোকের সংশোধন হবে না বলে আশা করা যায়। তাই তাদেরকে শাস্তির ভয়ের মধ্যে রাখা উচিৎ। একমাত্র যারা নিয়ম কানুন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ করবে তারা ভাল হবে, খারাপ ভাল হবে না। সুপরিচালিত পরিবারের পুত্র যেমন পিতার আনুগত্য করে ভয়বশত নয় শ্রদ্ধাবশত, তেমনি কনফুসিয়াসের মতে, জনগনের উচিত তাদের ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য করা।

www.pathagar.com

পরিবার গ্রাম সমাজ ও রাষ্ট্র

পরিবারের প্রধান পিতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন। তাঁর মতে গ্রামই সকল উন্নয়নের মূল। তাই গ্রামীণ উন্নয়নে সকলকে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সমাজ মানুষের সৃষ্টি; রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, বড়ভাই-ছোটভাই এবং বন্ধু-বান্ধব। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রও মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান যা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

উৎকৃষ্ট মানব অনুসন্ধান

সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষার জন্য কনফুসিয়াস উৎকৃষ্ট মানুষের শাসন প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি উৎকৃষ্ট মানুষের সংজ্ঞায় বলেন, কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করলেই উৎকৃষ্ট মানুষ বলে গণ্য হতে পারে না, বরং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট মানুষ। তিনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং তার মধ্যে মানবতা ও শিষ্টাচারের সমন্বয় ঘটনোর কথা বলেন। তিনি নিজেই চিন্তা-ভাবনা করে সুনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন বলে প্রত্যাশা করেন। তাঁর মতে, শিক্ষিত ও গুণবান মানুষের হাতেই শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ কেবল উত্তম মানুষই উত্তম আইন প্রণয়ন করতে পারেন। তিনি আরো মত প্রকাশ করেন, উৎকৃষ্ট মানুষের মনে দৃঢ় আস্থাবোধ ও প্রশান্তভাব বিদ্যমান থাকায় তিনি বর্তমান সময়ে বিরাজমান অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যেহেতু মানুষ জন্মগতভাবে বা শিক্ষার দিক দিয়ে কার্যত সমান নয় সেহেতু যখন উত্তম মানুষ নেতৃত্ব দেন এবং অন্যরা তা অনুসরণ করেন, তখনই সুশাসন বজায় থাকবে।

রাজতন্ত্র সর্বোত্তম (পিতৃতুল্য) সরকার

কনফুসিয়াসের মতে, রাজতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা। তবে এ শাসন ব্যবস্থা রাজার পরোপকারব্রত ও সৎগুণের উপর নির্ভরশীল। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলেন, রাজকীয় সরকার অন্য যে কোন ধরনের সরকারের তুলনায় উৎকৃষ্টতর এবং সরকার যখন রাজতান্ত্রিক হতে অভিজাততান্ত্রিক এবং এর পর গোষ্ঠীতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে, তখন সরকার ক্রমশ স্থিতিশীলতা ও উৎকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। রাজতান্ত্রিক শাসন চলাকালে জনগণ ও শাসকগণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং যখন এই সরকার সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে কর্ম সম্পাদন করে, তখন জনগণ খুশী থাকে এবং তারা সরকার সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত করেন না।

কনফুসিয়াস রাজনৈতিক দিক দিয়ে 'পিতৃতুল্য' সরকারের ধারণা সমর্থন করেন। পরিবারে পিতা যেমন সকল ক্ষমতার অধিকারী তেমনি সরকার পিতার মতই সদাশয় ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। রাষ্ট্র একটি সম্প্রসারিত পরিবার এবং রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সুষ্ঠু সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, মানুষ মান্য করবে

www.pathagar.com

ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের বিধানকে। মহৎ মানুষ ঈশ্বরের বিধানেই মহৎ আর রাজা বা সম্রাট ঈশ্বরের বিধানেই রাজা বা সম্রাট। এরূপ রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁর উচিত পিতার ন্যায় পরম দয়ালু ও প্রজাসাধারণের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া।

রাজত্ব স্বর্গের নির্দেশস্বরূপ

রাজার আদর্শ হবে উত্তম রাজা হবার এবং প্রজার আদর্শ হবে উত্তম প্রজারূপে দায়িত্ব পালন করা। তাঁর মতে, সার্বভৌম রাজার উচিত কেবল স্বর্গের নির্দেশ অনুযায়ী রাজত্ব করা। রাজা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তার উচিত একজন সৎ গুণবান ব্যক্তির কাছে সিংহাসনের ভার অর্পণ করা। রাজা জনগণের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েও সিংহাসন ছাড়তে না চাইলে প্রয়োজনে বিদ্রোহের মাধ্যমে উৎখাতের পরামর্শ দেন।

কনফুসিয়াস রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করেন এবং এর অস্তিত্ব ও কল্যাণের স্বার্থে নিম্নোক্ত নীতি নির্দেশ করেন।

প্রথমত, রাষ্ট্র অবশ্যই জনগণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাবে, রাষ্ট্রে অবশ্যই যথেষ্ট খাদ্য থাকবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র অবশ্যই এর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট সামরিক শক্তির যোগান রাখবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র অবশ্যই এর সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা অক্ষুণ্ন রাখবে। তিনি জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়নতা

কনফুসিয়ান মতবাদে নৈতিকতার অত্যন্ত উচ্চমূল্যায়ন করা হয়, কারণ এতে মানুষকে স্বভাবতই উত্তম বলে ধারণা করা হয়। দয়া, ন্যায়বিচার, আন্তরিকতা ও সহিষ্ণুতাই কনফুসিয়াসের নৈতিকতার মূল বিষয়। তার মতে, রাষ্ট্রে অবশ্যই আইন থাকবে, কিন্তু কঠোর আইন ব্যবস্থা কাম্য নয়। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক সংস্কার অবশ্যই সমাজের সর্বোচ্চ স্তরেই শুরু হবে কারণ শাসক অবশ্যই সর্বাগ্রে নিজের গুণের বিকাশ সাধন করে নৈতিক দিক দিয়া নিখুঁত হবেন। যাতে তিনি সমগ্র জনগণের জন্য শান্তি ও সুখ বিধান করতে পারেন।

অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা

কনফুসিয়াস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মানুষকে অর্থনৈতিক সুবিধাদান করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এ লক্ষ্যে কর আরোপ করাকে যথোচিত বলে সমর্থন করেন। 'কর সমান ও সর্বজনীন হবে'। কনফুসিয়াস আয়কর অনুমোদন করেন, কিন্তু শুল্ক আরোপের বিরোধিতা করেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ সম্পর্কে

অনেকেই মনে করেন কনফুসিয়াস শান্তিকামী ছিলেন না। পরিস্থিতির শিকার হয়ে যদি নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়, তাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে রাজা জনগণকে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কনফুসিয়াস রাষ্ট্রদর্শনের মূল্যায়ন/প্রভাব

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বিজ্ঞতার সাথে বলা যায় যে, মহান দার্শনিক কনফুসিয়াস একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বিরল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মূলত তৎকালীন চীনের বিশৃঙ্খল ও অরাজকতাপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিশেষত নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি সৎ গুণাবলি ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের কথা বলেন। ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি বলেন, কোন বৃহৎ আকার সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায় না। তাঁর মতে, সরকারের লক্ষ্য হবে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তবে তিনি শাসকের উন্নত নৈতিক গুণাবলির উপর জোর দেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকের দিকে চুশি নতুন কনফুসিয়াসবাদের প্রবর্তন করেন। এই দর্শন মোতাবেক সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি বস্তুর উল্লেখ করা হয়। যথা - লি (সচেতন সৃষ্টিধর্মী) এবং চি (অচেতন বস্তু)। এ দুটি মানুষের মধ্যে গুণ ও পাপের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে ওয়াং ইয়াং মিং এ মতবাদকে আরো বিকশিত করেন। ১৯৬০ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে কনফুসিয়াসবাদের সংঘাত দেখা দেয়ায় এর চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯৭৭ সালে সরকারিভাবে কনফুসিয়াসবাদের চর্চার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

তাওইজম
Taoism

তাওধর্ম চীনের একটি দেশীয় ধর্ম। চীনা জনগণের তিনটি ধর্মের মধ্যে তাওধর্ম বা তাওবাদ একটি। তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা লাও যু (Lao Tzu)। তাওবাদ গত ২০০০ বছর ধরে চীনের জনগণের চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল।

চীন ছাড়াও তাইওয়ান, জাপান, কোরীয় উপদ্বীপ এবং ভিয়েতনামে এ ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। ১৯৪৯ সালের পর তাইওয়ানে তাওধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ সাল থেকে তাইওয়ানে তাওধর্মের রেঁনেসা চলছে।

www.pathagar.com

তাওবাদের বৈশিষ্ট্য
Features of Taoism

প্রথমত, তাওবাদ একটি সর্বেশ্বর বা বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মে প্রত্যেক বস্তুর জন্য একজন দেবতা বিদ্যমান। তাওধর্মের স্বর্গের সংখ্যা ৮১টি।

দ্বিতীয়ত, তাওবাদে উপাসনার লক্ষ্য হচ্ছে আশিস ও দীর্ঘজীবন লাভ করা। আশিস ও দীর্ঘজীবনের সৌভাগ্য লাভের আশায় তাওবাদীরা পারদ হতে স্বর্ণ তৈরি, ঔষধ, মন্ত্র, যাদু, অদৃশ্য হওয়া, রূপ পরিবর্তন এসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আলকেমী অনুসরণ করে।

তৃতীয়ত, তাওবাদে স্বর্গ-নরক আছে। তাছাড়া অসংখ্য অলৌকিক প্রাণীতে বিশ্বাস, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, যাদু বিদ্যা, মৃতদের যোগাযোগ এমন আরো অনেক অধিবিদ্যা চালু আছে।

চতুর্থত, তাওবাদে পুরোহিতদের তাওশীহ বলা হয়। তাওশীহ দুই প্রকার। যথা :

(ক) গৃহবাসী তাওশীহ এবং

(খ) নিয়মিত তাওশীহ।

তাওবাদে কোন মেয়ে পুরোহিতের স্থান নেই। তাও মন্দিরকে কুয়ান বলা হয়। কুয়ান অর্থ দেখা। তাও ধর্মগ্রন্থের নাম তাও তাং (Tao Tang) এতে কনফুসীয় ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক শিক্ষা সন্নিবেশিত বিধায় এ ধর্ম অনেকটা উদার।

তাও ধর্মের নীতি
Principles of Taoism

বিভিন্ন নীতিমালার জন্য তাওধর্ম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ :

পঞ্চশিলা-যা বর্জনীয়

১. চুরি নয়—চুরি নিষিদ্ধ

২. হত্যা নয়—জীব হত্যা নিষিদ্ধ

৩. মদ নয়—মদ্যপান নিষিদ্ধ

৪. মিথ্যা নয়—মিথ্যা নিষিদ্ধ

৫. ব্যভিচার নয়—ব্যভিচার নিষিদ্ধ

দশগুণ-যা বাঞ্ছনীয়

১. জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা;

২. সর্বজীবে দয়া;

৩. ধৈর্য ধারণ করা ও ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা;

৪. রাজা ও শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য;

৫. সামাজিক মঙ্গল সাধন;

৬. আত্মত্যাগ করা;

www.pathagar.com

৭. দাসকে মুক্তি দান;
৮. অজ্ঞানে জ্ঞান দান ও কল্যাণবৃদ্ধি
৯. পবিত্র গ্রন্থ পাঠ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান;
১০. কূপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ।

তাওবাদীরা সততা, সরলতা, তুষ্টি ও সমন্বয় এসব গুণগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকে। তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা লাও যু বলেন, আমার কাছে ত্রিবিধ জিনিস আছে যাকে আমি অনেক শক্ত করে আঁকড়ে রেখেছি এবং যাকে আমি অনেক মূল্য দিয়ে থাকি। সেগুলো হল ভদ্রতা, মিতব্যয়িতা এবং বিনয়, যা আমাকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানো থেকে বিরত রাখে। তিনি উপদেশ দেন, তোমরা ভদ্র হও তাহলে সাহসী হতে পারবে, মিতব্যয়ী হও উদার হতে পারবে আর অন্যদের কাছে নিজেকে বড় করা থেকে বিরত থাক তাহলে নেতা হতে পারবে। তোমরা প্রতিবেশির লাভ-ক্ষতিকে নিজের লাভ-ক্ষতির ন্যায় মনে কর। পুণ্যের পথ থেকে দূরে সরে যেও না। স্বার্থপরতাকে সংযত কর, কামনা বাসনার পরিমাণ হ্রাস কর।তাওবাদীরা কেন্দ্রীকতার বিরোধী ও স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় শাসনের পক্ষপাতী।

তাওধর্ম গ্রন্থ
Holly books of Tao

তাও ধর্মগ্রন্থের নাম তাও তাং। তাও তাং কখন এবং কিভাবে রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত জানা যায় না। বিভিন্ন সময়ে তাও ধর্মগ্রন্থের সংস্কার সাধিত হয়। বর্তমান সংস্করণ ১৪৪৬ সালে তৈরি এবং ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছিল। এর অংশ সংখ্যা ৫২০০। তাওদের আরো দুটি বিখ্যাত ধর্ম গ্রন্থ হল -
১. তাই সেং ক্যান ইং জিয়েন এবং
২. ইন চিহ্ ওয়েন।

তাও সম্প্রদায়
Communities

সুং রাজ বংশের সময়ে তাওদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। উয়ান বংশের শাসনামলে চারটি সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে। যথা-
১. চেনতা তাও চিয়াও
২. তাই আই চিয়াও
৩. চেং আই চিয়াও
৪. চুয়ানচেন চিয়াও

বর্তমানে প্রথম দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই।

পরিশেষে বলা যায় তাওবাদ চীনের অন্যতম ধর্ম হিসেবে নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ধর্মীয় উদারবাণী সমাজের সকল পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রশ্নাবলি
Selected Questions

১. কনফুসিয়ানিজম কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
[What is Confucianism? Discuss its features.]

২. কনফুসিয়ানিজম বলতে কি বুঝ? রাষ্ট্রচিন্তায় এর প্রভাব আলোচনা কর।
[What do you mean by Confucianism? Discuss its influence to political philosophy.]

৩. কনফুসিয়ানিজম কি? কনফুসীয় চিন্তাধারার মূল কেন্দ্র কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
[What is Confusianism? What is the central Idea of confucias? Explain shortly.]

৪. তাওবাদ কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
[What is Taoism? Discuss its features.]

৫. তাওবাদ বলতে কি বুঝায়? রাষ্ট্রদর্শনে এর প্রভাব আলোচনা কর।
[What do you mean by Taoism? Discuss its influence to political Philosopy.]

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নসমূহ

অষ্টম পত্র (খ) — ১৯৯৯
(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। প্রাচ্য রাষ্ট্রদর্শন কি? ইহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। উম্মাহ্ বলতে কি বুঝায়? ইসলামী উম্মাহ্র বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৩। ইসলামে সরকার ও রাজনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৪। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর। এ সম্পর্কিত আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তা কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

৫। তুমি কি আল্-ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শনে গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব লক্ষ্য কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬। রাষ্ট্রীয় দর্শনে ইবনে সিনার অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্-গাজ্জালীর ধারণা পর্যালোচনা কর।

৮। সমাজের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে ইবনে খালদুনের মতামত পরীক্ষা কর।

৯। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মূল্যায়ন কর।

১০। কনফুসিয়াসের দর্শনের বিবরণ দাও।

অষ্টম পত্র (খ) – ২০০০
(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। "ইসলাম নিছক একটি ধর্মই নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"—আলোচনা কর।

২। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি? এর সঙ্গে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

৩। ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে? এর সঙ্গে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

www.pathagar.com

৪। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা আলোচনা কর।

৫। ইবনে রুশদ-এর রাজনৈতিক দর্শন পর্যালোচনা কর।

৬। আল-গাজ্জালীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের কি কি গুণ থাকা উচিত? বর্তমানের ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলীর প্রেক্ষিতে আলোচনা কর।

৭। রাষ্ট্রের ভিত্তি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মতবাদ আলোচনা কর।

৮। প্রাচীন চীনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বিবরণ দাও।

৯। কূটনীতি সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণার মূল্যায়ন কর।

১০। নিম্নের প্রত্যয়গুলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করঃ—

(ক) ন্যায়বিচার;

(খ) শান্তি;

(গ) ভ্রাতৃত্ব;

(ঘ) যুদ্ধ।

অষ্টম পত্র (খ) – ২০০১
(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। এগুলো সমকালীন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা থেকে কিভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?

২। রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৩। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝ? এর ভিত্তি ও নীতিগুলি কি? ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহিত হইতে পারে? আলোচনা কর।

৪। আল-ফারাবীর রাজনৈতিক দর্শনে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের প্রভাব আলোচনা কর।

৫। ইবনে সিনার রাজনৈতিক দর্শন মূল্যায়ন কর।

৬। ইতিহাস, আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং গ্রামীণ জীবন ও শহুরে জীবন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের ধারণা বিশ্লেষণ কর।

৭। 'কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" প্রাচীন ভারতের শাসন কৌশলের ওপর রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম।' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৮। একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে আবুল ফজলকে মূল্যায়ন কর। সম্রাট আকবর তাঁর দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন?

৯। কনফুসিয়াসের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

১০। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার আদায় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে প্রদত্ত নারী অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর।

www.pathagar.com

পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী অনার্স পার্ট-৩ এর অষ্টম পত্র (খ) এর প্রশ্নপত্র

অষ্টম পত্র (খ) – ২০০২

(প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা)

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। কেন মধ্যযুগকে প্রাচ্যের গৌরবময় যুগ বলা হয়?

২। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৩। ব্যাখ্যাসহকারে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উত্তম মডেলের বর্ণনা দাও।

৪। আল-ফারাবীর মতে রাষ্ট্রনায়কের কোন্ কোন্ গুণাবলী থাকা উচিত? আলোচনা কর।

৫। 'ইসলাম ধর্মে আল-গাজ্জালীর অবদান খ্রীস্টান ধর্মে সেন্ট অগাস্টিনের অবদানের মতই গুরুত্বপূর্ণ।'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৬। রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন সম্পর্কে ইব্‌নে খালদুনের ধারণা পর্যালোচনা কর।

৭। কূটনীতি সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা আলোচনা কর এবং আধুনিক কূটনীতির সাথে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।

৮। ইবনে রুশদ-এর রাজনৈতিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো মূল্যায়ন কর।

৯। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি? এর সঙ্গে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

১০। নিম্নের যে কোন দু'টির উপর টীকা লিখ।
(ক) ইবনে সিনা;
(খ) ন্যায় বিচার;
(গ) মুসলিম উম্মাহ;
(ঘ) ভ্রাতৃত্ব।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স পার্ট–২ পরীক্ষা – ২০০৩ (অনুষ্ঠিত-২০০৪)

প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তা

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। "ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, এটা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।" – আলোচনা কর।

২। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝ? ইসলামী রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা কর।

৩। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কি? ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

www.pathagar.com

৪। স্বাধীনতা কি? ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৫। ধর্মনিরপেক্ষবাদ কি? ধর্ম নিরপেক্ষবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। ইমাম আল-গাজ্জালীর রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর।

৭। আল-ফারাবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।

৮। রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণা আলোচনা কর।

৯। ইবনে খালদুনের আবহাওয়া ও জলবায়ু তত্ত্ব আলোচনা কর।

১০। কনফুসিয়ানিজম কি? কনফুসীয় চিন্তাধারার মূল কেন্দ্র কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স পার্ট–২ পরীক্ষা – ২০০৪

Oriental Political Thought

সময়-৪ ঘন্টা পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রচিন্তার সংজ্ঞা দাও। প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।

২। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝ? ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। ইসলামী আইন ও তরিকা কি? ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

৪। ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো কি? ইহা কি বর্তমান বিশ্বে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে? আলোচনা কর।

৫। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইসলামে প্রদত্ত নারী অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশ্লেষণ কর।

৬। নেতৃত্ব সম্পর্কে আল ফারাবীর ধারণা কি? তাঁর মতে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের কি কি গুণাবলি থাকতে হবে - আলোচনা কর।

৭। আল-গাজ্জালীকে "হুজ্জাতুল ইসলাম" বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৮। ইবনে খালদুনের "আসাবিয়া" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্ক কি?

৯। রাষ্ট্রচিন্তায় কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

১০। ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আলোচনা কর।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী
Bibliography

Sherwani, H.K.	Muslim Political Thought and Administration
Rosenthal, Erwin	Political Thought in Mediaeval Islam
Watt, W.M	Islamic Survey
Hammead Abdel latif	Islam in Focus
Ibn Khaldun	Mukaddamah
Abdur Rashid Moten	Political Science An Islamic perspective
Dr. Shaikh Shaukat Hussain	Human Rights in Islam.
মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন	ইসলামে মানবাধিকার
মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন	রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি
খুরশিদ আহ্মদ	ইসলামের আহবান
ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ	ইসলাম পরিচয়
মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান	ইসলাম ২০০০
আলীয়া মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	ইসলাম ও মানবাধিকার
ড. এম উমর চাপড়া	ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ড. এম উমর চাপড়া	ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ
ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী	ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ
মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার
Kohn, Hans	The Idea of Nationalism, A study in its Origin and Background.
Bryce, Lord	Modern Democracies.
Corry, G.A.	Elements of Democratic Government.
Sabine, G.H.	A History of Political Theory
Sir Muhammad Iqbal	The Reconstruction of Religious Thought in Islam
Journal of Islamic Administration	Volume-4-5, Winter-98-99, University of Chittagong
Sayed Amir Ali	The Spirit of Islam

www.pathagar.com

www.pathagar.com